সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সাঁওতালী অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডারী শাখার এক প্রাচীনতম ভাষা। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার পরেই দ্বিতীয় কথ্যভাষা রূপে এই ভাষার ব্যবহার। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির চা-বাগানে কর্মরত পূর্বভারতের অতি পরিচিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজে-কর্মে এই ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। এ ছাড়াও, মুণ্ডা, হো, মাহালি, ভূমিজ, বিরহড়, কোড়া প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সমাজের জনগণও সাঁওতালীতেই মনোভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বহু সাঁওতাল বাস করেন, তাঁরাও তাঁদের মাতৃভাষাতেই স্বভাবত কথা বলে থাকেন।

এ সব কারণেই, বিশেষভাবে সাঁওতালী ভাষার গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে, আজকের সাঁওতালী ভাষা ব্যবহারের যে রূপ, তা কিন্তু চিরকালের নয়। অবশ্য কোন ভাষাই চিরকাল অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। কালক্রমে সব ভাষারই অল্পবিস্তর রূপান্তর ঘটে থাকে। প্রথমে বদলটা শুরু হয় বাহ্যতে বাইরে। উচ্চারণ ক্রমে বদলে যায়, অর্থও তেমনিই বদলে যায়। আবার অপর সব ভাষা থেকে আসা স্বভাবতই নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করার ফলে ধীরে ধীরে ভিতরটাও ক্রমে বদলে যেতে থাকে। ভিতর বলতে ব্যাকরণের আইন-কানুনের কথাই বলা হচ্ছে।

সব ভাষাই কতকগুলো বিশিষ্ট প্রথা পদ্ধতি মেনে চলে। শব্দগুলি কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে। সেই নিয়মগুলিই সে ভাষার ব্যাকরণ। সকলের মনের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ নিয়মগুলি সক্রিয় থাকে, সেই ভাষার লিখিত ব্যাকরণ থাকুক আর নাই থাকুক। সাঁওতালী ভাষার ক্ষেত্রেও যে এটা কোনদিন ঘটেনি, তা অস্বীকার করা চলে না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এক অশিক্ষিত সাঁওতাল ছেলে ব্যাকরণ বই না পড়েও কেমন নির্ভুল সাঁওতালীতে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারছে।

যাই হোক-সাঁওতালী ভাষা বহুদিন ধরে লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে এবং এ ভাষারও ভিতর ও বাইরে ক্রমেই পরিবর্তন ঘটেছে। তবে লোকের মুখে মুখে এ ভাষা চালু থাকার জন্য মৌখিক ভাষার কোন প্রাচীন নিদর্শন ধরে রাখা আদৌ সম্ভব হয়নি।

এ সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, 'ভাষা বহ্‌তা নদীর ন্যায়'। ভাষা যেন নদীর মত ক্রমাগত সামনে সুসম গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। তার গতি কখনও পশ্চাৎমুখী হতে পারে না। আবার অস্বীকার করা যায় না যে, অনেক নদীই হারিয়ে যায় মরুভূমির বালুকারাশির নীচে কিংবা শুষ্কখাতে, কিংবা অন্য কোনও বৃহৎ জলাধারার মধ্যে। এইভাবে অনেক ভাষাই ক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে নানা কারণে। আমাদের পরম সৌভাগ্য, সাঁওতালী ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু আদৌ তা ঘটেনি। এটাই হল আজকের বাস্তব চিত্র।

সাঁওতালী ভাষা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার পূর্বে আর একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। পূর্ব ভারতের ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির বিকাশের জন্য হোর্ণলে, বীমস্, গ্রিয়ারসন্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন বহু গবেষণামূলক কাজ করেছেন, কিন্তু মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলির জন্য সে রকম কাজ আজও হয়নি।

এখানে বলে রাখা ভাল, অস্ট্রিকবর্গের কোন ভাষাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের পূর্ব পর্যন্ত লিপিবদ্ধরূপ পাওয়া যায়নি। সব ভাষাই ছিল মৌখিক। এ ক্ষেত্রে এসব ভাষার বিকাশের প্রশ্নই ওঠে নি। আর এ কাজ করতে হলে ভাষার প্রয়োগের ইতিহাস সংগ্রহ করা প্রথমেই প্রয়োজন। স্ক্রেফ্‌স্‌রুড, ক্যাম্পবেল, বোডিং, হফম্যান, ডিনি প্রভৃতি এবং কিছু কিছু মিশনারী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন, শরৎচন্দ্র রায়ের কতকগুলি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীংকালে রামদয়াল মুণ্ডাও এই ভাষাগুলির সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ভাষাগুলির ব্যাকরণগত কাঠামো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করা আজও সম্ভব হয়নি। মোট কথা, মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার ব্যাকরণের কাজ এখনও অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সাঁওতালী ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডারী শাখার অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতেরা সকলেই এই মুণ্ডা বা কোলগোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে ভারতে প্রচলিত সকল ভাষার মধ্যে প্রচীনতম বলে স্বীকার করেছেন। ইতিহাসে

পাওয়া যায়, আর্য-পূর্ব যুগে এই বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রাক্-দ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা প্রটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Australoid) গোষ্ঠীর ব্যাপক বসতি ছিল। তারা যে ভাষায় কথা বলত, তা হল অস্ট্রিক ভাষা। জানা যায়, এই অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। এই অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীই আজকের বাঙ্গালীরও পূর্ব-পুরুষ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সারা ভারতব্যাপী এই অস্ট্রিক সভ্যতাই ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন গ্রাম, জনপদের নাম বিশ্লেষণ করলে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন–

> "বাঙ্গলার প্রাচীন জনপদ বিভাগের মধ্যে পুণ্ড্র-পৌণ্ড্র তামলিত্তি-তাম্রলিপ্তি-দামলিপ্তি এবং বোধহয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ এই দুটি নামও এই একই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর অন্তত এই দুটি নদীর নামও কোল কব-দাক্ এবং দাম-দাক্ হইতে গৃহীত। কোল দা বা দাক্ জল এবং দা বা দাক্ হইতেই সংস্কৃত উদক। অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষার কথা দিয়াই দেশের পাহাড়, পর্বত, নদনদী, গ্রাম জনপদ ইত্যাদির নামকরণ করিয়াছিল এ অনুমানই তো যুক্তি ও ইতিহাস সম্মত।"*

ভাষাতত্ত্ববিদদের বিচারে অস্ট্রিক শব্দভাণ্ডার থেকে প্রচুর পরিমাণে শব্দরাশি আর্যভাষাগুলি নিশ্চিত গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলা ভাষার শতকরা ৪৫টি এবং সংস্কৃত ভাষার শতকরা ৪০টি শব্দই বোধহয় অস্ট্রিক ভাষা থেকেই গৃহীত। বিহারের আর্য ভাষাগুলি সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলতে হয়। বি. আর. সাক্সেনা বলেছেন– "ভোজপুরী, মগহী, আউর মৈথিলী ইন বিহারী বোলিয়ো মে ক্রিয়া কি জটিলতা মুণ্ডাকে হি প্রভাব কা পরিণাম জান পড়তি হ্যায়।"**

বহুভাষা থেকে এ ভাবে অবিরাম শব্দাবলী আহরণ করেই বাংলা ভাষা এমন সক্রিয় শক্তিশালী হতে পেরেছে।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, বাংলা দেশে আর্যভাষা আগমনের পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করত। গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বাংলাদেশে,

* নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ-৬০

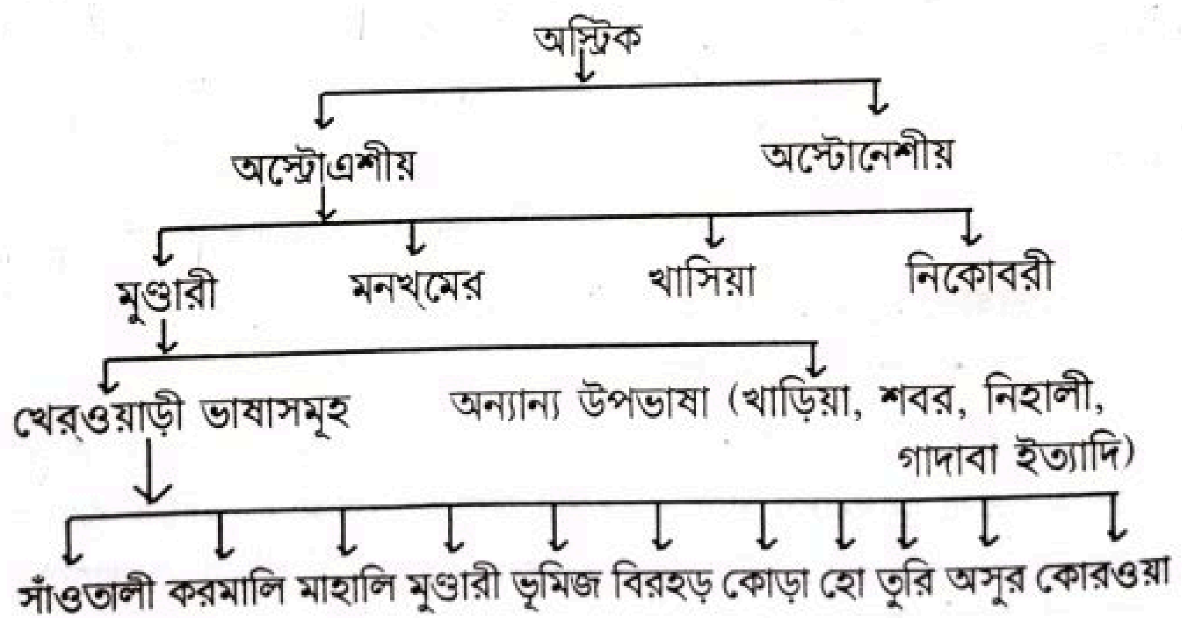
** বি. আর. সাক্সেনা ঃ সামান্য ভাষা বিজ্ঞান পৃ-৩০৫

উড়িষ্যায় এবং মধ্য ভারতের অনেক অংশে অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েডদের বসবাসই ছিল সমধিক। অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েডদের সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বাংলা লৌকিক মানস প্রকৃতিতে অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েড অনার্য প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। এ কথা অনস্বীকার্য যে, অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি।

অস্ট্রিক ভাষাবর্গের দুটি মূল শাখা-অস্ট্রোএশীয় এবং অস্ট্রোনেশীয়। এ প্রসঙ্গে Sir Edward Gate বলেছেন–

> "The Language of Mundas with their kindred dialects spoken by the Santals, Hos, and the other allied tribes inhabiting the Chhotanagar plateau, has been shown by Peter Schmidt to form a sub-family of the family called by him Austro-Asiatic, which includes Monkhmer, Wa, Nicoborese, Khasi and the aborginal languages of Mallacca. There is another family which he call Austronesian including Indonesian, Melanesian and Polynesian. These two families are grouped into one great family which he calls the Austric."*

নীচের ছকে তুলনামূলক ভাষাবিচারে অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডারী শাখার বিভিন্ন গোষ্ঠীর একটা চিত্র তুলে ধরা হল :



* S. C. Roy : The Mundas and their Country (Introduction)

এই সঙ্গে মুণ্ডারী শাখার খের্‌ওয়াড়ী ভাষাগুলির নমুনাও দেওয়া হল :

সাঁওতালী : মিৎ হড়রেন বার্‌য়া কড়া হপনকিন তাঁহেকানতায়া। আর উনকিন মদরে হুডিঞ্চ্‌ দ আপাতে মেতাদেয়া, এ বাবা,ইঞরে পাড়াওঃ মেনাঃআঃ রেয়াঃ বাখরা দেন এমকাতিঞ মে। আদ, আঁইদারিতেৎ এ হাঁটিঞাৎকিনা।

করমালি : মিৎ হড়রেন বার্‌য়া কড়া হপন তাঁহিকানাকিন। আদ হুডিঞ্চ্‌ বাবুততেৎ মেতাকেদেয়ে, এ বুবা, ধনদৌলত যাগি হাটিঞ হোয়োঃতিঞা দান বাখরাকাতে, এমাকাতিঞ মি। আদ বাবুততেৎ আচ্‌আঃ ধন হাটিঞাৎকিনে।

মাহালি : মিৎ হড়রেন বার্‌য়া কোড়া গিদরা মেনেনতেয়াকিন। আর উনকিন মুদরে হুডিনিচ আপাততেৎ মেতাদেয়ে, বাবা, ওকা ইঞাঃ ধন বাখ্‌রা হাঃটিঞাসে দে এমকেতিঞ মে। আদ আপাত আচ্‌আঃ ধন হাটিঞাদাকিনে।

মুণ্ডারী : মিৎ হোড়োআঃ কোড়া হনকিং বার্‌ হোড়োগেকিং তাঁইকেনা। এনতে হুড়িংনিচ কুরজিকোআঃ আঞআগাঃ হাটিং, আবা, অমাইংমে মেন্তে আপুতি কাজিআচ্‌আ। ওড়ঃ দান কুরজিএ হাটিংআৎকিআ।

ভূমিজ : ময়াৎ হোড়োআঃ বারিয়া হন কোড়াকিন তাঁইকেনা। ইনকিনাঃ মাধরে হুড়িং হন কোড়া আপুতেকে কাজিআদইয়াই, এ বাবা আমাগঃ দৌলতরে ওকাওয়াঃ ভাগিং নামেয়াইং এনা আমাআইংমে। ইনাতে ইনিচ আচআগাঃ দৌলত হাটিঞকিয়াতে ইনকিনকে অমাৎকিনায়।

বিরহড় : মিয়া(ৎ) হোড়োআঃ বার্‌য়া কোড়া হোপনকিন তাঁহিকিনাকিন। এনকিনাতে হুড়িংইচ্‌ আপুকে কাহিকিয়ায়, এ আবা, ইংগাক্‌ হিসা হুডু অমাইংমে। এনতে হিনি এনকিনকে আচ্‌আঃ হুডু হিসাদকিনায়।

কোড়া : মিয়াৎ হড়রেন বারিয়া হেরেল হন তাঁহেনকেনাকিন। আর ইনকিন মতরে হুডিংইচ্‌টাঃ আপুতেৎকে গামাচএ, হেঁ বাবা ইঞআঃ অংশ যা নামেঞ হাটিঞকেতে এমআঞ মে তিঞাঃ দ। খানগে বিষয় হাটিঞাৎ কিনায়।

হো ঃ অকন হড়েন বারিয়া কোয়া হনকিং তাইকেনা। ইনকিংতে হুড়িংইচ্ দ আপুতেতারে কাজিকেদায়, আমাঃ আপং বিতিতে ওকোনাঃ আঞআঃ হিতাদ হবাওআ এনা আইং এম আইংমে। এনতে ইনি আচআঃ বিতি হাটিং আদকিংআয়।

তুরি ঃ মিয়াৎ নোড়কে বারিয়া ছাওয়া তাহিকিনাকিন। ইনিআতে হুড়িংইচ্ আপুতে কাথাদ্ইয়াই, এ আবা, ইংকে খুরজিকে হাটিং আইং মে। ওড়ো আচ্আঃ খুরজি হাটিং আদ কিনায়।

অসুরী ঃ মিয়াৎ হোড়রেনি বারিয়া হপনকিং দহলেনা। আকিংএতে হুড়িং হুনিয়াঁ আপুন দুকুমা লা, অয় বাবা, অংআ হাটিং ইদানা হুনি অভ আইং মে। নিহো হিনি বানার হাটিং অভাৎ কিনা।

কোরওয়া ঃ মিৎ হড়রিকিনাঃ বার হড়কিন দহতা। হুডিং আই বেঁটাত আপাত সঁগে কাতাতেরা, এ বাবা, দেই ইতা দ হাটিং ওয়াইং মে। লাইচ্ কু হাটিং আদো আপাতো।

অস্ট্রিক ভাষাসমূহের মধ্যে সাঁওতালী ভাষার স্থান সর্বাগ্রে এবং এই ভাষাই সবচেয়ে উন্নত। এ সম্পর্কে গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁর Linguistic Survey of India গ্রন্থে বলেছেন– 'মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।' প্রতিবেশী আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার প্রভাব সাঁওতালী ভাষার উপর অনেকখানি নিশ্চিত পড়েছে, তবে তা পড়লেও সাঁওতালী ভাষার গঠন ও চরিত্র যেন অপরিবর্তিতই আছে। একটু গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সাঁওতালী ভাষাতে কিছু কিছু বাংলা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে বলতে হয়, সম্ভবত এক মূল উৎস থেকেই উভয় ভাষা এসেছে, অথবা পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এরূপ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, অন্যান্য আদিবাসীদের মত সাঁওতালরাও প্রধানতঃ দ্বি-ভাষী (Bi-Lingual)। তাঁরা তাঁদের পারিবারিক জীবনে নিজস্ব গোষ্ঠীর ভাষা যেমন ব্যবহার করেন, আবার আধুনিক বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনে সমানে বাংলা, হিন্দি ভাষাও বলে থাকেন। তবে, তাঁরা নিজেদের মৌলিক উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত ছাড়তে পারেন নি। তাঁরা আর্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গীর দ্বারাই তা সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ করে থাকেন।

প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণের একটা নিজস্ব রীতি আছে। প্রত্যেকেই তার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে। এটা যেন একটা বংশানুক্রমিক গুণ। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু আর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের কথাবার্তায় বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাঁওতালী ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তরাঞ্চলের সাঁওতালী দক্ষিণাঞ্চলের সাঁওতালী থেকে বেশ কিছু আলাদা। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কলকাতা ও নদীয়ার প্রচলিত কথ্য ভাষার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলা দেশ) বিভিন্ন জেলার কথ্য ভাষার উচ্চারণের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত। সাধারণ অর্থে যাদের 'বাঙাল' বলা হয় তাদের মৌখিক ভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চলিত মৌখিক ভাষার বাঙলার তুলনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ক্যাম্পবেল সাহেবের Santali-English Dictionary তে পাওয়া যায়—

> "Northern Santali, or that spoken in Bhagalpur, Monghyr, the Santal Parganas, Birbhum, Bankura, Hazaribagh and Manbhum, is the language of an over whelming majority of the tribe and is more polished than Southern Santali. The former is, therefore, regarded as the Standard and the Southern Santali or that spoken in the remaining districts as a dialect, or, possibly, a group of dialects of it."*

ভাষাবিদ্ গ্রিয়ারসন সাহেবও সাঁওতাল পরগণা ও মানভূমে ব্যবহৃত সাঁওতালী ভাষাই অধিক বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন এবং অন্য জায়গার ভাষার আর্যপ্রভাব বেশ পড়েছে বলে মন্তব্য করে গেছেন। "The purest santali is spoken in the north, especially in the Santal Parganas and Manbhum. The dialect spoken in the Midnapore, Balasore, Singbhum and the Orissa tributary states is more mixed and shows of gradually yielding to Aryan influence"** তাঁর মন্তব্য অস্বীকার করা যায় না। স্বভাবতই জীবিকার অন্বেষণে সাঁওতালরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল, ফলে, ভাষার সঙ্গতি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যাই হোক, আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন

---

* Preface to the Campbell's Santali-English Dictionary.

** G. A. Grieson : Linguistic Survey of India, Vol-IV Page-32.

শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণগত বহু রকমের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে যে রকম প্রধানত নবদ্বীপ, শান্তিপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত ও উচ্চারিত বাংলা শব্দই প্রাধান্য পেয়েছে ; সাঁওতালী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব সাঁওতালী বই, পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ ও উচ্চারণ মোটেই এক ধরণের নয়। এর ফলে, সাঁওতালী সাহিত্যের ভাষাগত কোন সংহতিই থাকে না। এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ভাষার কোন সাদৃশ্য থাকবে না– তা তো হতে পারে না! আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণগত পার্থক্য তবে সব ভাষাতেই আছে এবং তা থাকবেও।

ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেন যে, সাধারণভাবে প্রতি দেড়'শ মাইলের ব্যবধানের মধ্যে একই ভাষার একই শব্দের উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, দুই বা ততোধিক ভাষাগোষ্ঠীর লোক যদি দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করে, তবে এক ভাষার শব্দ ও উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবেই অন্য ভাষার মধ্যে নিশ্চিত চলে আসবে। এই একই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত সাঁওতালী ভাষার মধ্যেও বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণের পার্থক্য রয়েছে। সাঁওতাল সাহিত্যিকরা তাই আজ লিখিত সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার সংহতি ও গুণমান নিয়ে কম বেশি চিন্তিত।

সাঁওতালী ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। অস্ট্রিক ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাঁওতালী ভাষারই সর্বাধিক প্রাধান্য। এই সাঁওতালী ভাষা কত প্রাচীন তা নীচের তুলনামুলক তত্ত্বগত আলোচনা থেকেই প্রকাশিত। 'দি অ্যানালস্ অফ রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে হান্টার সাহেব যা লিখেছেন তার বাংলা দাঁড়ায়–

> 'পুরাকালে ভারতের আর্য বহিরাগতরা সাঁওতালদের বা সমগোত্রীয় কোন অনার্য জাতির সংস্পর্শে আসে। ফলে, সংস্কৃত ভাষার এক অতি প্রাচীন রূপ প্রাকৃত ভাষার মধ্যেও বিশুদ্ধ সাঁওতালী শব্দাবলী সাদরে গৃহীত হয় বর্ণমালা চর্চাকালে আমরা এই অনুমানের যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পেয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ আর্য শব্দ 'স্তম্ভ' ব্যবহার করার বদলে সংস্কৃতভাষীরা কিন্তু একটি অনার্য শব্দ 'খুঁট-আ' ব্যবহার করে। এই

> 'খুঁট-আ' অবিমিশ্র সাঁওতালী শব্দ, একমাত্র অন্ত্য স্বরবর্ণটির কেবল পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন প্রাচীন প্রাকৃতে, 'খুঁট-আ' আধুনিক সাঁওতালীতে 'খুঁট-ই' 'খুঁটি', 'স্তম্ভ'। এই সাদৃশ্য প্রামাণিক সত্য-এমন কি ব্যবহৃত তালব্য বর্ণ দুইটি 'ট' এবং অনুনাসিক 'ট' এবং অনুনাসিক বর্ণটি উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন।'*

একই কথা আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেছেন। তিনি তাঁর 'শব্দ ও উচ্চারণ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> "আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া 'ট' বর্গের কোন বর্ণ অর্থাৎ মূর্ধণ্য বর্ণ উচ্চারণ করিতেন না; পরবর্তীকালে ভারতীয় অনার্য ভাষার সংমিশ্রণে আসিয়া তাঁহারা সর্বপ্রথমে এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য বেদ ও উপনিষদের ভাষার মূর্ধণ্য বর্ণের উচ্চারণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পাণিনি যখন সংস্কৃতে ব্যাকরণ গঠন করেন তখন এই বর্ণগুলির ব্যবহার এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি ইহাদিগকে সংস্কৃত বর্ণমালায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ দ্বারা সংস্কৃতের বিকৃত পথ রুদ্ধ হইল সত্য, কিন্তু ভাষার নিজস্ব গতি-প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রহিয়া গেল। তাহারই ফলে প্রাকৃত ভাষার অসংস্কৃত যে কতকগুলি বর্ণের উদ্ভব হইল মূর্ধণ্য বর্ণের শ্রেণীভুক্ত 'ড়' তাহাদের অন্যতম।"**

কথাটি অতি সত্য। আর্যদের ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ ইত্যাদি মূর্ধণ্য বর্ণ ছিল না। এগুলি তারা যতদূর সম্ভব অস্ট্রিক তথা খেরওয়ালী ভাষা থেকে গ্রহণ করেছে। বাঙলা অভিধান ঘাঁটলেও আমরা দেখতে পাই, এই 'ট' বর্গের শব্দ অন্যান্য বর্গের অর্থাৎ 'ক'-বর্গ, 'চ'-বর্গ, 'ত'-বর্গ এবং 'প'-বর্গের শব্দ থেকে অনেক কম। এখানে এই 'ট' বর্গের দ্বিতীয় বর্ণটিই ধরা যাক। 'ঠাকুর' শব্দটি খুবই পরিচিত এবং বাঙ্গালী সমাজেও ব্যবহৃত হয়, তেমনি আদিবাসী সমাজেও ব্যবহৃত হয়। অনেকেই জানে না, এমনকি অভিধানেও পাওয়া যায় না যে, 'ঠাকুর' শব্দটি মোটেই সংস্কৃত শব্দ নয়। শব্দটি অস্ট্রিক গোষ্ঠীজাত বলেই মনে হয়। সাঁওতালদের বহু প্রাচীন এক গানে পাওয়া যায় ঃ

* ডব্লু. ডব্লু. হান্টার ঃ দি অ্যানালস্ অফ রুরাল বেঙ্গল, পৃ-১২২-১২৩

** আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ শব্দ ও উচ্চারণ, পৃ-২৫

'ঠাকুরীহি সিরিজালা
বোমা পিরথিমা হো
ঠাকুরীহি সিরিজালা
গীইয়া জো য়ো রো
ঠাকুরীহি সিরিজালা
গীইয়া জো.......।'

গানটি সাঁওতালদের 'সহরায়' উৎসবের গান। কিন্তু গানের কথার সঙ্গে বর্তমানের প্রচলিত সাঁওতালী কথা খাপ খায় না। যাই হোক–তবু এ গানের 'ঠাকুর' শব্দটি নিয়েই সামান্য আলোচনা করছি। সাঁওতালী পুরাণ 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কলেয়ান গুরু বলেছেন–

'বের রাকাপ্ স্যেচ্ দ মান্ওয়া রেয়াঃ জানাম। পাঁহিল দ একেন দাঃ তাঁহেকানা আর দাঃ লাতাররে হাসা তাঁহেকানা। খানগে ঠাকুর জীউ দাঃরেন জান্ওয়ারকো কাটকম, মাঙ্গাড়, তায়ান, রাঘব বোয়াড় হাকো, সলে ইচীক্, ল্যাণ্ডেৎ, হর–অ এমানতেন কোয় বেনাওকেৎকোওয়া।'*

অর্থাৎ–

'সূর্য যে দিকে ওঠে সে দিকে মানুষের জন্ম। আদিতে সমস্ত জলময় ছিল এবং জলের নীচে মাটি ছিল। তারপর ঠাকুর জীউ জলচর প্রাণী কাঁকড়া, হাঙ্গর, কুমীর, রাঘববোয়াল মাছ, চিংড়ি মাছ, কেঁচো, কচ্ছপ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন।'

আবার নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেন খেরওয়াল হপনাঃ ধরম পুথি 'জম সিম বিন্তী' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন–

"যুগ দ মঞ্চপুরিরে চেলে হঁ বাংক তাঁহেকানা। ঠাকুর ঠাকরাণ এড়ং দেবালোক সেরমারে ক তাঁহেকানা। দেবালোক তালারে অকয় ক চেৎ ক কামিয়ানা অনা দ আবনাঃ বাড়ায় বানুঃআনা, মেনখান আবনিচ্ গুরু লিটা দ ঠাকুরাঃ গোড়েত কামিয় কামিকান তাঁহেকানা।"**

* হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, পৃ-১
** মঙ্গলচন্দ্র সরেন ঃ জম সিম্ বিনতী, পৃ-১

অর্থাৎ–

> 'আদিতে পৃথিবীতে কেউ ছিল না। ঠাকুর–ঠাকরাণ দেবতাগণ স্বর্গে থাকতেন। দেবতাদের মধ্যে কে কি করতেন তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমাদের গুরু লিটা ঠাকুরের বার্তাবাহকের কাজ করতেন।'

এ 'ঠাকুর' কথাটি সাঁওতালদের অতি পুরানো কথা, সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, উপাখ্যান, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদিতে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং দেখা যায় 'ঠাকুর' বলতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কিংবা দেবতা বিশেষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। শব্দটি অর্থ খর্ব করে তারা কখনও শব্দটি প্রয়োগ করে না। বাংলা ভাষায় কিন্তু তা দেখা যায় না। বাংলায় 'ঠাকুর' কথাটি নানা অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যেমন-

১। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা ! (এখানে 'ঠাকুর' অর্থে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।)

২। চল, ঠাকুর দেখে আসি। (এখানে 'ঠাকুর' অর্থে প্রতিমা।)

৩। আজ ঠাকুর আসেনি। (এখানে 'ঠাকুর' অর্থে রাঁধুনে বামুন।)

৪। লক্ষ্মীপূজোর দিনে এ গ্রামে ঠাকুর পাওয়া যায় না। (এখানে 'ঠাকুর' অর্থে ব্রাহ্মণ পুরোহিত।)

৫। পদবীতে প্রচলিত ঠাকুর (যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এছাড়াও ব্যাপক অর্থে 'ঠাকুর' শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়–ঠাকুরদাদা, ঠাকুর-পো, ঠাকুর-ঝি, ঠাকুর-জামাই, বটঠাকুর বা বড়ঠাকুর ইত্যাদি। সাঁওতালরা কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ঠাকুর শব্দের অর্থ খর্ব করে শব্দটি প্রয়োগ করে না। তাই 'ঠাকুর' শব্দটি সাঁওতালী শব্দ বলেই নিশ্চিত ধরা যায়।

বাংলায় এ ধরণের বহু সাঁওতালী বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন–

> 'বাঙ্গলা–খাঁ খাঁ (করে ওঠা), খাঁখার (দেওয়া), বাঁখারি (বাখারি বা চেড়া বাঁশ), বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা), জাং (জঙ্ঘা), ঠেঙ্গ (গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোক্সা, কালি (চুন), ছোট, পেট, খোস (পুরাতন বাঙলায় কচ্ছু), ঝোড় বা ঝাড়, ঝোপ, পুরাতন বাঙলার চিখিল (কাদা), ডোম (প্রাচীন বাঙলায় ডোম্ব-ডোম্বী), চোঙ চোঙ্গা, মেড়া (=ভেড়া), বোয়াল (মাছ), করাত, দা বা দাও, বাইগণ (বেগুণ =

সংস্কৃত বাতিঙ্গন, বাতিগণ) পগার (জলময় গর্ত বা প্রণালী), গড় বরজ (পানের) লাউ, লেবু-লেম্বু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই মূলত অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাঙ্গলার প্রাচীন জনপদ বিভাগের মধ্যে পুণ্ড-পৌণ্ড্র তামলিত্তি-তাম্রলিপ্তি দামলিপ্তি এবং বোধহয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ—এ দুটি নামও এই একই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর, অন্তত এই দুটি নদীর নামও কোল কব-দাক্ এবং দাম-দাক্ হইতে গৃহীত। কোল দা বা দাক্ = জল এবং দা বা দাক্ হইতেই সংস্কৃত উদক।'*

নীহাররঞ্জন রায়ের এ বক্তব্য অস্বীকার করা যায় না; তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। তবে গঙ্গা নদী ও বঙ্গ নাম সম্পর্কে বক্তব্য জোরালে ভাবে বলতে তিনি কিছু দ্বিধাবোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুমান সত্য। তা উল্লেখ করে আমি একটা বহু প্রাচীন সাঁওতালী গান তুলে ধরছি—

'গাঙ নাঁই দ পেরেচ্ এনা
সুড়া নাঁই দ চড়াঙএনা
দো জা মিরু রুওয়াঁড় মে
চেলে এ্রেলতেএ্র রুওয়াঁড়া ?
গাতেএ্র রেগে জিউয়িএ্রা
সাঙ্গাএ্র রেগে সাতাহেদেএ্রা।'**

অর্থাৎ—

গঙ্গা নদী পরিপূর্ণ,
সুড়া নদী উতলা।
যাও ফিরে যাও প্রিয়তম।
কারে দেখে ফিরব ?
বন্ধুই আমার প্রাণ,
বন্ধুই আমার শ্বাস॥

---

* ড. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ-৫৯-৬০

** হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, পৃ-১৪

বহু প্রাচীনকাল থেকেই তারা 'গঙ্গা' নদীকে 'গাঙ' নাঁই বলে তাদের বিভিন্ন গানে উল্লেখ করে এসেছে। এ নাম তাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়, গাঙ অর্থে নদী আজও বর্ধমানের গ্রামেও প্রচলিত। গঙ্গা নদীর আশেপাশে তারা বহুবার বসতি গড়ে তুলেছে, আবার জমিদার মহাজনদের চক্রান্তে সে সব বসতি হারিয়েছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখতে চেয়েও তারা ধরে রাখতে পারেনি। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় লক্ষীন্দ্র হেমব্রম-এর 'গাঙ নাঁই ধারেরেন খের্ওয়াল হপনকো' নামক প্রবন্ধে।*

'বঙ্গ' শব্দটিও সাঁওতালী 'বোঙ্গা' কথা থেকে এসেছে বলে ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক মনে করেন। 'বোঙ্গা' শব্দের অর্থ অশরীরী শক্তি এবং তা দেবতা ও অপদেবতা দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালরা মনে করে, এ পৃথিবীতে বোঙ্গাহীন স্থান নেই। 'বোঙ্গা' সর্বত্র বিরাজিত। এ দেশকে তাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় 'বোঙ্গা দিশম' (বঙ্গা দিশম = বঙ্গা দেশম = বঙ্গদেশ) নামে অভিহিত করেছিল। সুতরাং দেশবাচক 'বঙ্গ' শব্দটির ব্যাখ্যায় প্রকৃতিনির্ভর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক আত্মিক সম্পর্ক কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আর 'কপোতাক্ষ' এবং 'দামোদর' নাম দুটির মত আরও কিছু সাঁওতালী নদীবাচক শব্দ আমরা বাংলায় পাই, যেমন—অজয়, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, কংসাবতী, কোপবতী, গন্ধেশ্বরী ও শীলাবতী। এগুলির আদি নাম ছিল—ও-জই, মোর, দাঁড়কা, কাঁসাই, কোপাই, গোঁদাই ও শিলাই। 'সুবর্ণরেখা' নামটিকে এখনও সাঁওতালরা 'সবরনাখা' বলে থাকে।

আর একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক। গ্রামবাংলায় বিশেষ করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বেশ কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালী। ঐ অঞ্চলের বাংলা ও সাঁওতালী—দুটি ভাষাতেই এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়। এগুলির উৎস তেমনভাবে খোঁজা হয়নি, তবে বাংলাভাষীরা অনবরতই বলে থাকেন। যেমন— কচা, কুলি, খালা, ভুলুক, হিড়, বাখোল, বাইদ, ডাহি, ডুংরি, টাঁড়, ডাঙ্গুয়া, বাখর, আওলা, উদ্মা, হেমাল, পটম, অঁজরা, জাহের, গরমথান, কুইলী, ডিংলা, চেং গড়ুই, লাটা, ঘুঁগু, বাসিয়াম, ঝান্টি, গাজাড়, কাড়া ইত্যাদি। যতদূর মনে হয় এগুলি সম্পূর্ণ সাঁওতালী না হলেও 'খেরওয়ালী ভাষা' থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। বাঙলার প্রাচীনতম 'চর্যাপদে' এরকম বহু সাঁওতালী বা খের্ওয়াল গোষ্ঠীর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

* পছিম বাংলা, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯

'খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি।'

পদটির 'খুন্টি' ও 'পুচ্ছি' শব্দ দুটির ব্যবহার লক্ষণীয়।

আবার—

'তান্তি বিকণতা ডোম্বি আবরণা চাংগেড়া।
তোহর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া॥'

এখানে 'তান্তি' ও 'চাংগেড়া' শব্দ দুটির ব্যবহার লক্ষণীয়। দুটি শব্দই কোল ভাষা গোষ্ঠীর।

সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কেন, তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর 'অধিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"চর্যাপদে দেখি, সাঁওতাল তথা সমগ্র আদিবাসী জীবনের বিস্তৃত ছবি। সে চিত্র এখনও জীবন্তরূপে দেখতে পাই ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে- -যার সীমানা রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, ধানবাদ থেকে বাঁকুড়া–পুরুলিয়া; মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে এসে ঠেকেছে।

বনজঙ্গল ঘিরে হরিণ শিকার, অযোধ্যা পাহাড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমায় সাঁওতালদের শিকার উৎসব বা সেঁদ্রা পরবকে স্মরণ করিয়ে দেয় (চর্যা-৬), মত্ত হস্তীকে পোষ মানানো (চর্যা-৯), নগর প্রান্তে ডোম টুলিয়ায় ডোমনীর সহিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সমাজের উঁচুমানের লোকের মিলন কাহিনী (চর্যা-১০), পাগলা হাতির গর্জন আর পাহাড়ের কোলে মেঘের ডাক কি রকম একাকার হয়ে যায় (চর্যা-১৬), মেয়েদের দলবদ্ধ গান আর পুরুষদের বাদ্যযন্ত্রসহ নাচ (চর্যা-১৭), আদিবাসী পাড়ায় আখড়ার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়, মাদল বাজিয়ে ডোম্বী বিবাহে কাহ্নপাদের যাত্রা (চর্যা-১৯), ভুসকু শিকারীর হরিণ মারার কাহিনী আর মায়া হরিণকে মারার জন্য মায়া জালের ব্যবহার (চর্যা-২৩), উঁচু উঁচু পাহাড়ে সজ্জিতা শবর বালিকার ঘুরে বেড়ানো আর সেখানে শবরশবরীর প্রণয়লীলা (চর্যা-২৮), উঁচু পাহাড়ি টিলাতে প্রতিবেশী বিহীন মানুষের কুঁড়ে ঘরে বাস (চর্যা-৩৩), ডোম্বিনীর কুঁড়েতে আগুন লেগেছে, জল ঢেলে আগুন

নিভিয়ে দেখা গেল তার দেবতা বিগ্রহও ছাই হয়ে গেছে (চর্যা-৪৭)। আজ থেকে হাজার বছর আগের সাহিত্যে যে সমাজজীবনের ছবি আমরা দেখি তাতে আদিবাসী জীবনযাত্রা তথা সাঁওতাল সমাজ ও বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ পাশাপাশি মিলিয়ে গেছে।"*

ড. সুকুমার সেনের চোখের সামনে এই চিত্র ফুটে উঠেছিল বলেই পূর্ব ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে (২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩) তিনি বলেছিলেন—

"হাজার বছর আগে পূর্বভারতে অর্থাৎ বারাণসী থেকে আসাম-বর্মার পার্বত্য অঞ্চল ও সমুদ্রতীরে পর্যন্ত দেশখণ্ডে একটি বিশেষ আর্যভাষা প্রচলিত ছিল, তবে সে ভাষায় সর্বত্র উচ্চারণরীতি ও ব্যাকরণ পদ্ধতি, সর্বাংশে সমান ছিল না। এই ভাষায় যে যৎকিঞ্চিৎ রচনা অর্থাৎ 'সাহিত্য' গড়ে উঠেছিল তার থেকে তখনকার দিনের আঞ্চলিক উপভাষার অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাই। আপনারা প্রাচীন বাংলায় লেখা চর্যাগীতির কথা অবশ্যই জানেন। যে ভাষায় চর্যাগীতিগুলি বিরচিত হয়েছিল তা পণ্ডিতেরা মোটামুটি সাব্যস্ত করেছেন যে তাতে বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরানো রূপ প্রতিফলিত আছে।"**

চর্যাপদের মত বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে কিংবা সমসাময়িক অন্যান্য লেখাতে সাঁওতালী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন 'মনসামঙ্গল' কাব্যে আছে—

'সোনেকার বচনে বেহুলা কোপে জ্বলে।
যোড় হাত করিয়া শাশুড়ীর আগে বলে॥
পাপকর্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী।
বিয়ার রাত্রে মৈ স্বামী, হৈলাম কাঁচা রাণ্ডী॥'

আবার চণ্ডীমঙ্গলেও আমরা দেখতে পাই—

আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলুঁ কুমুদ-প্রসূনে।

---

* ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক : আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা, পৃ-১৪

** ড. সুকুমার সেন : পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ও সেগুলির আন্তঃ-সম্পর্ক (প্রবন্ধ) [পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা' গ্রন্থ]

ক্ষুধা–ভয়-পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

* * *

শুন গো শুন গো খুড়ি, কার্য কিছু আছে ডেড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।
আমার জোহার খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি
যাই অন্য বণিকের বাড়ী॥

[মুকুন্দরাম]

চণ্ডীমঙ্গলের আর এক কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। ভাড়ুদত্তের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন–

নগরের লোক যত নানা দুঃক পায়।
বিষাদ করিয়া বীরে জানাইতে যায়॥
বুলন মণ্ডল সঙ্গে বাইশ হাজার।
কান্দিতে কান্দিতে বীরে করিল জোহার॥
চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন॥

শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহলরাজ-দুহিতা সুশীলার বিবাহের পর পতিগৃহে যাত্রার চিত্র বর্ণনা করে অকিঞ্চন চক্রবর্তী লিখেছেন–

মা বাপে দেখিতে আছে বাসনা সভার।
আমার মাথার কিরা আস্য একবার॥

[কিরিয়া > কিরয়া–কিরা]

চণ্ডীমঙ্গলের আর এক কবি মানিক দত্তের কাব্যাংশ এখানে উল্লেখ করছি-

আমারে বোল ডানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হই এ মুখ দোষী।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দ ঘর পড়শী॥
ডান বোলিঞা মোরে বোল বার বার।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই বুঢ়া পোদ্দার॥

উত্তর দেশে গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল।
দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল॥
ডাইন বোলিয়া মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার॥

মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় অন্যতম। 'অন্নদামঙ্গলে' তাঁর লেখা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' কথাটি আজও বাঙ্গালী স্মরণ না করে পারে না। তিনি 'কালিকামঙ্গলে' হীরার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন-

গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছেলে॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, সাঁওতালদের হেমব্রম গোত্রের 'টোটেম' বা ধর্মীয় প্রতীক হল 'গুয়া'। গুয়া হেমব্রমরা সুপারী পান খায় না। গুয়ার অর্থ সুপারী।

সূর্যোপসনা প্রাচীন বাঙলার এক বিশিষ্ট ব্রত। এই ব্রত পালন করার সময়ে সূর্যদেবতা বিষয়ক নানা প্রকার লৌকিক ছড়া একদা আবৃত্তি করা হত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে 'সূর্যমঙ্গলের' পাঁচালী গীতের এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। সেগুলির মধ্যে খেরওয়ালী কথা কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখা যাক–

ওগো সূর্যাইর মা,
তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না॥

কিংবা–

ওপার দুইটি বাউনের কন্যা মল খাড়ুয়া পায়।
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়॥

এখানে দেখা যায় যে, 'ডাঙ্গর' 'মল' ও 'খাড়ুয়া' শব্দ তিনটিই খেরওয়ালী শব্দ। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে এরকম অস্ট্রিক গোষ্ঠীজাত শব্দের ক্রমান্বয়ে ব্যবহার আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের চিত্র অর্থাৎ বাঙ্গালীসমাজ গড়ে ওঠার আদিপর্বকেই যেন তুলে ধরেছে। আমি এখানে কিছু সাঁওতালী শব্দ তুলে ধরছি, সেগুলির সঙ্গে

বাংলা শব্দের অবিকল মিল আছে। অর্থও এক, বড়জোর উচ্চারণে কিছু পার্থক্য হয়তো পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত শব্দ সংস্কৃত থেকে উদ্ভব যে হয়নি সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত। বাংলা ভাষায় এগুলিকে 'দেশজ শব্দ' বা 'দেশী শব্দ' বলা হয়ে থাকে।

সাঁওতালী শব্দ	বাংলা (দেশী শব্দ)	সাঁওতালী শব্দ	বাংলা (দেশী শব্দ)
আড্ডা	আড্ডা	কিরিয়া	কিরা
আকুলান	অকুলান	কুল্‌হি	কুলি
আলাঝালা	আলাজালা	কুলাউ	কুলানো
আথেলা	অথেল	কুড়হিয়ী	কুঁড়ে
উজাড়	উজাড়	কুটা	কুটা
উল্টাউ	উল্টানো	খালাঃ	খালা
উস্কাউ	উস্কানো	খামচাও	খামচানো
উটকাউ	উটকানো	খাঞ্চা	খাঁচা
এড়ান	এড়ানো	খাঁজ	খাঁজ
কোন্দল	কোন্দল	খাঁড়ি	খড়ি
কোন্দলিয়ী	কুঁদলে	খাটো	খাটো
কাঙ্গলা	কাঙ্গাল	খুদাও	খেদানো
কাঁত	কাঁত	খিয়া	খি
কিলাউ	কিল	খাটালি	খাটুনি
খুন্টি	খুঁটি	ঝিল	ঝিল
গাঁ	গাঁ	টাটাও	টাটানো
গাবাও	গাবানো	টেকাও	ঠেকনাও
গাদা	গাদা	টুকরী	টুকরা
গজাল	গজাল	টলা	টোলা
গুনড়া	গুঁড়া	টাপড়	টোপড়
গুরলাউ	গুলানো	টাটি	টাটি
ঘেরাও	ঘেরা	ঠেলাঠিলি	ঠেলাঠেলি
ঘান্টা	ঘাঁটা	ঠেসাঠেস	ঠেসাঠেসি

সাঁওতালী শব্দ	বাংলা (দেশী শব্দ)	সাঁওতালী শব্দ	বাংলা (দেশী শব্দ)
চাবলাউ	চাবলানো	ঠাটা	ঠাট্টা
চাম্পট	চম্পট	ঠন্টা	ঠোঁট
চালা	চালা	টাঙ্গাও	টাঙ্গানো
চারা	চারা	টিলহা	টিলা
ছেঁচড়	ছেঁচড়	ঠোকাও	ঠোকা
জট	জোট	ঠিকাদার	ঠিকাদর
জাঁকজমক	জাঁকজমক	ডর	ডর
জালাই	জলুই	ডাকাও	ডাকা
জঞ্জাল	জঞ্জাল	ডগ্	ডগ্
জুরী	জুরী	ডামাডোল	ডামাডোল
ঝক্মারিয়া	ঝকমারি	ডি	ডি
ঝাঁজরা	ঝাঁজর	ঢঁড় (বিঞ)	ঢোঁড়া(সাপ)
ঝাপড়ি	ঝুপড়ি	ঢিপি	ঢিপি
ঝাড়	ঝাড়	ঢিংকি	ঢেঁকি
ঝাপসো	ঝাপ্সা	তাগড়া	তাগড়া
ঝুঁকাউ	ঝুঁক, ঝোঁক	তলহাঁট	তল্লাট
ঝাঁপ	ঝাঁপ	দাদা	দাদা
ঝাড়া	ঝাড়া	দাবাও	দাবানো
ঝাড়ন	ঝাড়ন	দামা	ধামা
দাপাদাপি	দাপাদাপি	বুহ্নি	বউনি
দিদি	দিদি	ভারোসা	ভরসা
দঙ্গল	দঙ্গল	ভিটা	ভিটা
দল	দল	ভীড়	ভীড়
দুঙ্গি	ডুঙ্গি	মচকাও	মচকানো
ধাপ	ধাপ	মাকড়ি	মাকড়ি
ধারমুস	ধুরমুস	মাঁকু	মাকু

সাঁওতালী শব্দ	বাংলা (দেশী শব্দ)	সাঁওতালী শব্দ	বাংলা (দেশী শব্দ)
ধমকাও	ধমকানো	মিলমিলিয়া	মিলমিলা
নিরেট	নিরেট	মোটা	মোটা
নিঙড়াও	নিঙড়ানো	মোটাসোটা	মোটাসোটা
পাগল	পাগল	রগড়াও	রগড়ানো
পাণ্ডা	পাণ্ডা	রাঁণ্ডি	রাণ্ডি
পাঁরিবাজ	ফড়িবাজ	রড়া	রড়া
পিড়ি	পিঁড়ি	রুকা	উখা
পগার	পগার	রসরসে	রোসেরোসে
ফাঁক	ফাঁক	লাদে	লাদা
ফারচা	ফারচা<ফর্সা	হাঁক	হাঁক
ফাটক	ফটক	হুড়কা	হুড়কা
ফের	ফের	হুড়াও	হুড়া
বাছাও	বাছা	সাবাড়	সাবাড়
বাজড়া	বাজরা	সুলি	সুলি
বাতা	বাতা	সাঙ্গা	সাঙ্গা
বেলনা	বেলুন	সাঁচ	ছাঁচ*
বিগড়াও	বিগড়ানো		
বিটি	বেটি		

এ ছাড়া আর একটি বিষয় উল্লেখ করি। বাঙলায়, বিশেষ করে সীমান্ত-বাঙলায় বহু গ্রামের নাম অস্ট্রিক শব্দযোগে তৈরি হয়েছে। এখানে ডি, ডিহা, ডাংরা, ডুংরি, গড়, গেড়িয়া, শোল, শুলি, তোড় তোড়া, চুয়া ইত্যাদি সাঁওতালী শব্দান্তিক গ্রামের নামই তুলে ধরছি। যেমন—

ডি—সাঁওতালডি, নূতনডি, জগন্নাথডি, শ্যামাডি, বামনডি, লায়াডি।

ডিহা—সারডিহা, বাঁশডিহা, ভেলাইডিহা, মাজ্‌ডিহা, রামডিহা।

ডাংরা—তালডাংরা, নিমডাংরা।

* Byomkes Chakraborty : A comparative study of Santali and Bangali.

ডুংরি–ফুলডুংরি লালডুংরি, খড়িডুংরি।

গড়–লালগড়, রামগড়, নারায়ণগড়, কর্ণগড়, হুমগড়, বলাগড়।

গেড়িয়া–তাঁতিগেড়িয়া, লালাগেড়িয়া, গড়গেড়িয়া।

শোল–আসানশোল, খয়রাশোল, ছাতিনাশোল, আমড়াশোল, চাঁপাশোল।

গুলি–লোধাগুলি, কুসমাগুলি, বেলাগুলি।

তোড়–গোয়ালতোড়, চাকলতোড়, বেলতোড়।

তোড়া–শালতোড়া, জামতোড়া।

চুয়া–ওদলচুয়া, নাটাচুয়া, তারাচুয়া, বালিচুয়া।

ডাঙা–আমডাঙ্গা, ঘুঘুডাঙ্গা, তেতুলডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, কাশীডাঙ্গা, বাবুইডাঙ্গা।

দা–শিয়ালদা, বেলদা, শীতলদা, কামারদা, জামদা, চাকদা, বামদা।

দহ–খড়দহ, আড়িয়াদহ।

ড়া–বাঁকুড়া, চিচ্‌ড়া, কাঁকড়া, দেয়াড়া, খাতড়া, আনাড়া, বগুড়া।

আড়া–বামুনআড়া, ঝাটিয়াড়া।

গ্রামের নামের উৎস সন্ধানে করতে গিয়ে সেই সব বাংলা নামের সঙ্গে সাঁওতালী শব্দ কিভাবে যুক্ত হয়েছে তা এখানে তুলে ধরলাম। মুণ্ডারী, ওরাওঁ কিংবা অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর শব্দ নিয়ে আর আলোচনা করলাম না। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরাই নিজেদের ভাষার কথা দিয়ে পাহাড়-পর্বত নদ–নদী গ্রাম ইত্যাদির নামকরণ করে গিয়েছে। হয়তো সেই সব জাতি-প্রজাতির অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে কিংবা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা বাধ্য হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। কিন্তু তাদের দেওয়া নাম তো আর অস্বীকার করা যাবে না। মূল শব্দ যাই হোক, পদান্ত থেকেই তা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ড়া, আড়া, ডি, ডিহা, অন্তক গ্রাম-নামগুলি নিশ্চয় আর্যভাষীদের দেওয়া নয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ভাষাবিদদের মতে বাংলা ভাষায় দেশজ শব্দের উৎস অনুন্ধান করতে হলে বাঙলার স্থান-নাম গ্রাম-নাম গবেষণা করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু দেশজ শব্দ বলে যে সব শব্দ চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলির উৎস নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি, ফলে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস অনেকখানি অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। বাংলা উচ্চারণ বা বাগরীতির সঙ্গে যে সব আদিবাসী ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সে সব ভাষা না জানাই এর একমাত্র কারণ।

বাংলা ভাষায় এইসব দেশী শব্দের ব্যবহার সাঁওতাল ও বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তুলনামূলক আলোচনা করলে দুটি

সমাজের ভাষাগত সাম্যের এক অসাধারণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। জানা যায় সংকর বাঙালী জাতির হারিয়ে যাওয়া এক ইতিহাস। তাই ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক লিখেছেন—

"খেরওয়াল জাতি অধ্যুষিত বাঙলার ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্লাবনের সময়ে খেরোয়াল (সাঁওতাল) লোকেরাই কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ এবং কিছু সাঁওতল, মুণ্ডা বা আপনার মাতৃভাষার শব্দকে ঘসে মেজে সংস্কৃতের মানানসই করে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অক্ষম অনুসরণ করে বা আদৌ না করে খেরোয়াল তথা সাঁওতালি ব্যাকরণ অনুসারেই শব্দ প্রয়োগ করে বাঙলা ভাষা তথা তাদের ভাষা সৃষ্টি করেছিল মনের ভাব প্রকাশের জন্য। বাবু সম্প্রদায়ের মতই নিজদিককে আপনার সম্প্রদায় খেরোয়াল লোকেদের থেকে পৃথক করে নিয়েছিল। এইভাবেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ নিজেদের ব্যাহ্মণ্যশাসিত হিন্দু সমাজের মানুষ হিসাবে গৌরবের সঙ্গে চিহ্নিত করেছিল।"*

সংস্কৃত বাংলার চেয়েও নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভাষা। ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—

'আনুমানিক ৮০০-১১০০-র মধ্যে এবং তাহার পরেও বাঙলাভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাঙলাদেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। শিল্পে ও সাহহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনেও বিচারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা সকলেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন; সকলেরই চেষ্টা ছিল প্রাকৃতজনের কথ্যভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া, ব্যাকরণসম্মত করিয়া নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করিবার। এই শুদ্ধ, 'সংস্কৃত' ব্যাকরণ সম্মত ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। প্রাকৃতের চর্চা বাঙলাদেশে বড় একটা হইত না; অন্তত বাঙলাদেশে প্রাকৃতে সাহিত্য রচনার কোন ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; তাহার পরিচয়ও নাই। এ দেশের মহাযানী বজ্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধরাও যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাও হয় শুদ্ধ সংস্কৃত, না হয় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র সংস্কৃত, যাহাকে বলা হয় 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'।"**

---

* ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক : আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা, পৃ-১০-১১

** ড. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ-৭৩১-৭৩২

জানা যায় যে, ঐ সময়ে এ দেশে ২৩ প্রকারের প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং সেগুলির মধ্যে আদিবাসীদের ভাষাও নিশ্চিত ছিল।* বিভিন্ন আদিবাসী ভাষার মধ্যে সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা ; এ ভাষার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা ছিল মন্-খমের ভাষা পরিবারের সঙ্গে, আর কিছুটা কোল-মুণ্ডা পরিবারের সঙ্গে। বাঙলা দেশে পাল বংশ ও পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সংস্কৃত জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়ে যায়। শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের লেখক জৈনাচার্য রাজশেখর তাই লিখেছেন–"গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেশ্যাঃ"। অর্থাৎ, গৌড় ও প্রতিবেশী জনপদগুলিতে সংস্কৃতের চর্চাই বেশি, প্রাকৃতের তেমন ছিল না। সে সময়ে ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, চিকিৎসা–বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যখন পুঁথিপত্র লিখতেন তখন তাঁরা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না।

এ সম্পর্কে পূর্বেই ড. নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লিখে গিয়েছেন যে, প্রাচীন বাঙলার শিক্ষিত লোকেরা প্রাকৃত জনের কথ্য ভাষাকে শুদ্ধ, সংস্কৃত ও ব্যাকরণসম্মত করে ব্যবহার করত, ফলে প্রাকৃত ভাষার বহু সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। মুণ্ডা গোষ্ঠীর সাঁওতালী ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দেখা যায়, যে সব সাঁওতালী শব্দের শেষে 'ম' আছে এমন বেশ কিছু শব্দ সামান্য পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত শব্দরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরকম কিছু শব্দের তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ-

সাঁওতালী	সংস্কৃত	সাঁওতালী	সংস্কৃত
এরাডোম	এরণ্ডম্	পটম	পটম্
কাটকম	কর্কটম্	মাতকম	মধুকম্
গতম	ঘৃতম্	সাকোম	শংখম্
চাতম	ছত্রম্	সাদম	সৈঁধতম্
তুলীম	তুলম্	সামানম	সর্ণম্
দাতরম	দাত্রম্	সুঊম	সূত্রম্
ডাণ্ডম	দণ্ডম্	কাসকম	কর্পাসম

* ড. রিচার্ড পিনাল ঃ প্রাকৃত ভাষায়ো কা ব্যাকরণ, পৃ-৩

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এ সমস্ত সাঁওতালী শব্দ উচ্চারণের সময় 'ম' এ 'অ' স্বর উচ্চারিত হয় না। আবার দেখা যায়, সংস্কৃতের বহু 'ধাতু তথা ক্রিয়ামূল-এর সঙ্গে সাঁওতালী 'ক্রিয়া'-র বেশ মিল আছে। এরকম আর একটি শব্দ তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

সাঁওতালী	সংস্কৃত	সাঁওতালী	সংস্কৃত
আস	অস	জম	জম
ওচোঃ	অচ	জোল	জ্বল
অজঃ	অজ	তেঞ্,তুঞ্	তন
অৎ/আৎ	অৎ	রাঃ	রুদ
অল	অল	রহয়	রুহ্
কিরিঞ্	ক্রি	সানা	সন
গুপি	গুপ	হাসুর	হ্রাস/হ্রস

এরকম বহু সাঁওতালী শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের মিল দেখা যায়। জানা যায়, ১৫০০ বৎসর আগে থেকে ৬০০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে সংস্কৃত ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। এই হিসাবে সংস্কৃত ভাষার শব্দের সঙ্গে সাঁওতালী শব্দের মিল থাকা স্বতঃই স্বাভাবিক। আর্যরা এ দেশে আসার পর থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আর্য-অনার্য সমন্বয়ে যে নীরব রূপান্তর ঘটে গেছে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। এই সমন্বয় না ঘটলে তো ভাষায় এরকম আদান-প্রদান হত না। তবে কোন ভাষার কোন শব্দ কোন ভাষা থেকে এসেছে, তা এখন বলা কঠিন। সাঁওতালী ভাষার পুরানো রূপ কেমন ছিল, তা লিখিত আকারে তো নেই আর সংস্কৃত ভাষার লিখিত রূপ আছে বলে কখনই একথা নিঃসঙ্কোচে মেনে নিতে পারা যায় না, এ সব শব্দ সংস্কৃত থেকে সাঁওতালীতে এসেছে। ১০০০ বৎসর পরে এ দেশে হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা প্রাকৃত ভাষার রূপান্তর সৃষ্টি হয়। এসব ভাষায় এরকম বেশ কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলির উৎস সংস্কৃত ভাষায় আদৌ পাওয়া যায় না। তাই ভাষাবিদরা অনুমান করেন যে, এ সব শব্দ 'প্রাকৃত অপভ্রংশ'র সময়কাল থেকেই অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে। তবে সঠিকভাবে বিচার করতে না পারলে মূল উৎস খুঁজে পাওয়া সুকঠিন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই—সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করে সঠিক সিদ্ধান্ত কখনই নেওয়া যায় না।

অবশ্য এ ব্যাপারে ভাষাবিদদের ভাষাতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি আমাদের যথার্থ পথ কতকটা বলে দেয় এবং সে সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিক ভাষাবর্গের সঙ্গে মিলটুকু তুলে ধরতে সাহায্য করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের ছেলেরা বাংলা ভাষার সঙ্গে সাঁওতালী ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার কথা ভাবতেই পারে না। অথচ, তুলনামূলকভাবে অনুসন্ধান আর বিচার করলে বহু তথ্যই হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে। আজকের দিনে নিজেদের ইতিহাস খুঁজে বের করতে এ কাজটা করা একান্ত প্রয়োজন। সাধে কি আর বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছেন যে, 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। বর্তমানে বহু লৌকিক শব্দের মূল সাঁওতালী অভিধান ও ব্যাকরণে পাওয়া যায়। ড. ক্ষুদিরাম দাশ এ কথা স্বীকার করে লিখেছেন ঃ

> ''বাঙলা বাক্যের বিশিষ্ট পদবিন্যাস, সহায়ক শব্দযোগ কারক নির্দেশ ও ক্রিয়ারূপ গঠন, শব্দানু এবং অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শ্বাসাঘাত-প্রবণতা ও শব্দদ্বৈত প্রভৃতি যে যে বিষয়ে (বাঙ্লা ও হিন্দী প্রভৃতি) সংস্কৃত-প্রাকৃত থেকে ভিন্ন পথ নিয়েছে তার অধিকাংশেরই হদীশ সাঁওতালী ব্যাকরণ-অভিধান, ছড়া ও গীতিরীতি দিতে পারছে। ....এর মধ্যে যে ব্যাপারটি আমাদের অপ্রত্যাশিতভাবে বিস্মিত করেছে তা হল সাঁওতালী অর্থাৎ কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা থেকে বাঙ্লার প্রচুর ঋণ। লক্ষণীয় এই যে, সাঁওতালী অভিধান ও ব্যাকরণ সামনে না থাকায় খ্যাতনামা বাঙ্লা অভিধান-নির্মাতারা, এমন কি ভাষাতাত্ত্বিকেরাও বহু সাঁওতালী শব্দ বা প্রত্যয়কে জোর করে সংস্কৃত-মূলে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস করেছেন।''*

ড. দাশের বক্তব্য অস্বীকার করা যায় না। এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, সাঁওতালীতে 'আ' প্রত্যয় যোগে যে কোন শব্দকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা যায়। রেভাঃ আর. এম. ম্যাকফাইল বলেছেন–'In Santali any word may be used as a verb simply by adding at the end of it the letter 'a' which is the verbal sign' যেমন–সেবেল + আ = সেবেলা। উল দ সেবেলা (আমটি মিষ্টি)। অসার + আ = অসারা। নওয়া হর দ আঁড়ি অসারা (এই রাস্তাটা খুব চওড়া)। ড. দাশের কথানুযায়ী বাঙলায় মূল ধাতুগুলি সংস্কৃতের সাদৃশ্যে অধিকাংশই হলন্ত। যেমন, চল্, কর্, পড়্, দেখ্,

* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৯, পৃ-১৯

শুন্, কাট্। এগুলিকে ক্রিয়াপদে ফেলতে গেলে আমাদের বলতে হয় চলা, করা, পড়া, দেখা, শুনা, শোনা, কাটা ইত্যাদি। এমন কি সংস্কৃতমূলে যে ধাতুগুলি আ-কারান্ত এ-কারান্ত ছিল, তার উপরেও বাঙলা 'আ' যোগ করে যেমন পা–পাওয়া, যা–যাওয়া, দে–দেওয়া ইত্যাদি।

বাক্যগঠনের ক্ষেত্রেও সাঁওতলী ও বাঙলার মধ্যে মিল দেখা যায়। সাঁওতলীতে ক্রিয়াপদ সব শেষে বসে। বাক্যগঠনের সাধারণ নিয়ম হল–কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। বাঙলাতেও তাই। যেমন ঃ

১। সাঁওতালী ঃ ইঞ দ দাকাঞ জমা।
বাঙলা ঃ আমি ভাত খাই।
২। সাঁওতালী ঃ ইঞ দাদা দ হানা অড়াঃরে হেনায়া।
বাঙলা ঃ আমার দাদা ঐ ঘরে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আধুনিক শিক্ষার আলো যখন সাঁওতালী সমাজে প্রবেশ করছে, সে সময়ে কিছু কিছু সাঁওতাল ছেলেমেয়ে নিজেদের মাতৃভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষার দিকেই আকৃষ্ট হয় বেশি। সে সমস্ত জায়গায় খৃষ্টান মিশনারীরা মিশন স্থাপন করেন, সে সমস্ত জায়গাতেই এরকম ঘটতে দেখা গিয়েছে। পাঠ্যপুস্তক পড়ার আগ্রহেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক তারা বাংলা ভাষাই বেশি পছন্দ করতে থাকে। কথাটি বিশেষকরে বাঙ্গালার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিহারের বেনাগাড়িয়ার ক্ষেত্রে নয়। বাঙ্গালায় ঐ সময়ে মেদিনীপুর জেলার ভীমপুরে এবং বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গাতে মিশনারীরা কাজ শুরু করেন। সে সময়ে এ দুটি জায়গা ছিল সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা। আজ সারেঙ্গা অনেকখানি পাল্টে গেছে, কিন্তু ভীমপুর আগের মতোই আছে, আজও সাঁওতাল অধ্যুষিত একটি আদিবাসী গ্রাম। সেদিনের সে হাওয়া আজও সেখানে পরিলক্ষিত হয়, গ্রামে সাঁওতালী ভাষার থেকে বাংলা ভাষাই যেন বেশি ব্যবহৃত হয়। সাঁওতাল বাড়ীর ছেলেরা অনেকেই সাঁওতালী বলতেই পারে না, অবশ্য কথা বুঝতে পারে। অথচ, ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুল থেকে সাঁওতাল ছেলেরা সাঁওতালী ভাষা নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারবে বলেই পড়তে আসত। তিরিশ দশকে যে সমস্ত সাঁওতাল শিক্ষক এই স্কুলে শিক্ষকতা করেন সাঁওতাল ছেলেদের সযত্নে শিক্ষার আলো দেখান, তাঁরা হলেন–প্রিয়নাথ বাস্কে, রামচাঁদ মাণ্ডি, বিদ্যাভূষণ সরেন, পরানচন্দ্র টুডু, ধনারাম হেমব্রম এবং পদ্মলোচন মাণ্ডি। ভীমপুরের এই বিশেষ অবস্থাটি বাঙ্গলার নবজাগৃতির কথাই কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুক্ত মন নিয়ে আদিবাসী সমাজে শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টাই ছিল তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনা।

যাই হোক, সে সময়ে সাঁওতালী ভাষা সম্পর্কে সাঁওতালদের যে একটা বিরূপ ধারণা দেখা দিয়েছিল তা সাধু রামচাঁদ মুর্মুর লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ড. সুহৃদকুমার ভৌমিকের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, সাধু রামচাঁদ মুর্মু সম্পর্কে তাঁর 'সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

> "তিনি কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়ে দেখলেন, সাঁওতালগণ আদিবাসী হিসাবে ঘৃণিত ও অবহেলিত। সাঁওতালগণও আপন ভাষাকে যথেষ্ট পরিমাণ অবহেলা করে। এমন কি, পথে ঘাটে দুইজন্য সাঁওতাল আপন ভাষায় কথা বলতে সংকোচ বোধ করে। সেইজন্য প্রথমত তিনি চাইলেন সাঁওতালদের মধ্যে স্বাজাত্যের অভিমান ও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে। আবার সমস্ত আদিবাসীকে একত্র করে একটি অখণ্ড পরিমণ্ডল তৈয়ারিতে মন দিলেন।"*

এটা অবশ্য একটি বিশেষ কমপ্লেক্স থেকে সৃষ্ট। দুজন শিক্ষিত বঙ্গভাষী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বহুল ইংলেজি বাক্য ও শব্দ অনর্গল ব্যবহার করে থাকে নিজেদের শিক্ষিত বলে জাহির করতে।

সাঁওতাল সমাজে এরকম একটা পরিস্থিতি যে সৃষ্টি হয়েছিল তা আচার্য সুনীতিকুমারও উল্লেখ করে গিয়েছেন। ১৯২৩ সালে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন- —"কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ সাধন আর তার জায়গায় বাংলা, হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আর্যভাষার প্রতিষ্ঠা হতে বড়জোর ১০০ বছর বা ১৫০ বছর লাগবে। অবশ্য কোলভাষীরা এখন যে অনুপাতে আর্যভাষা গ্রহণ করছে সেটা যদি বজায় থাকে।"

তাঁর অনুমান অমূলক নয়, মুণ্ডারী, ভূমিজ, কোড়া, মাহালী প্রভৃতি ভাষার ক্ষেত্রে সত্যিই তাই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন সাঁওতাল কবিগুরু সাধু রামচাঁদ মুর্মু সাঁওতাল সমাজকে সচেতন করার জন্য দৃঢ়পদে এগিয়ে আসেন। তাঁর শক্তিশালী কলমই সাঁওতালী ভাষা ও সাঁওতাল সমাজকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। একের পর এক গান, কবিতা, নাটক প্রবন্ধ লিখে তিনি সমাজকে সচেতন করে তোলেন, সমাজের দোষ-গুণ নগ্নভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরে সাঁওতাল সমাজকে তিনি নিশ্চিত অবক্ষয় থেকে সেদিন বাঁচান। তিনি বলেন—

---

* সুহৃদকুমার ভৌমিক ঃ সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন, পৃ-৭

'হড় কংকা আবনগে দ চুহড় চুহড় এনেচ্‌রে দ
সিঞ্‌ ঞিন্দীবন তাহেন কাডাম কাডাম।
ঞু কেদাব পাঁউরা হাঁণ্ডি সেনেন এঁদে পাতা টাঁণ্ডি
সানাম কাঁমি সাঁওতে ইদি তামাম।'

* * *

'রিতপিত আর বানুঃ আঁকিল এনেচ্‌ আবন গুজুঃ দাখিল
যাঁদে তাঁদে বুল তলসাংকাতে
কারধানিতে উপায়াবান বার্‌ পাইলা হোড়ো তাবন
পরব চালাঃ পুইসা চুপুৎ কাতে।'

অর্থাৎ—

'আমরা যত বোবা লোক মত্ত হয়ে নাচের ঝোঁকে
দিবারাত্রি থাকি অন্ধকারে।
হাঁড়িয়া মদ পান করে পৌঁছই ইঁদ পরব টাঁড়ে
সমস্ত কাজ থাকছে পিছে পড়ে।'

* * *

'রীতিনীতির জ্ঞান নেই মরণ পণ নেচে যাই
যেথায় সেথায় নেশায় পড়ি শুয়ে।
লাঙ্গল টেনে উপায় করি দু'সের ধান পাই মজুরী
পরব ছুটি পয়সা মুঠায় নিয়ে।'

তাঁর এ ধরণের গান ও কবিতা সাঁওতাল সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি সমাজকে বাঁচানোর জন্য লেখেন—

'ওরোমাব আবন রেয়াঃ ভাকা ধরম সমাজ
তবে রেত লেগ্‌ভাগরে আঁগুয়াবন স্বরাজ।'

অর্থাৎ—

'চিনতে যদি পারো নিজের ভাষা ধর্ম সমাজ,
তবেই আমরা আনতে পারি আকাঙ্খিত স্বরাজ।'

তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেন যে, সাহিত্যের বিকাশই জাতির বিকাশ। তাই মন–প্রাণ দিয়ে সাহিত্য সাধনায় নামেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর সাধনা সেদিন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর লেখা গান 'দেবোন তেঙ্গোন আদিবাসী বীর....' (এস দাঁড়াই আদিবাসী বীর....) আজ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সাঁওতালদের মুখে মুখে শোনা যায়। বলা বাহুল্য, গানটি আজ সাঁওতালদের জাতীয় সঙ্গীতরূপেই গণ্য।

এ সময়ে গুরু গমকে রঘুনাথ মুর্মুর লেখাও প্রকাশিত হয়। তিনি উড়িষ্যাবাসী হলেও বাংলা হরফের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাংলা হরফে তাঁর গানের বই 'হড় সেরেঞ' ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। তারপরই ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় সাঁওতালী নাটক 'বিদু–চান্দান'। নাটকটি পুনরায় বাংলা হরফে মুদ্রিত হয় ১৯৪৭ সালে। নাটকটি দর্শকদের মন বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তাঁর আরো দুটি নাটক 'দাড়েগে ধন' ও 'খেরওয়াল বীর' অতি অল্পদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। ফলে, মাতৃভাষার প্রতি সাঁওতালদের যে তৎকালীন ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছিল তা আস্তে আস্তে কেটে যায়। আজ অস্বীকার করা যায় না যে, সাধু রামচাঁদ মুর্মু ও পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর সাহিত্যচর্চাই সেদিন সাঁওতালী ভাষায় নব প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাঁওতালী সাহিত্যের ধারাবাহিকতাকে চারটি পৃথক পর্বে বা স্তরে বিন্যাস করা যায়—

(১) মৌখিক সাহিত্য।

(২) মিশনারীদের অবদান ও তাঁদের সংগৃহীত সাহিত্য।

(৩) সাঁওতালদের নিজেদের প্রচেষ্টায় লিখিত সাহিত্যের প্রাথমিক পর্ব।

(৪) লিখিত সাহিত্যের আদি পর্ব ও সাহিত্যচর্চার নিরবচ্ছিন্ন ধারা।

সাঁওতালী সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করার জন্য আমরা এ সব বিষয় নিয়ে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব।

মৌখিক সাহিত্য

মৌখিকভাবে প্রচলিত চিরাচরিত সাঁওতালী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটা বহু প্রচলিত সাঁওতালী কথাই মনে পড়ছে। কথাটা হ'ল–'অল খন দ থুতিগে সরসা।' অর্থাৎ–'লেখার থেকে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ।' কথাটা অবশ্য সত্য। লেখার থেকে কথন বিষয়ে সরস বলার ভঙ্গী, ধরণ-ধারণের স্বাভাবিকতার জন্য শ্রোতা আকৃষ্ট হয় বেশি। তবে কি এজন্যই আদিবাসীরা লিপি তৈরীর কথা ভাবেনি, আদৌ চেষ্টাই করেনি ? সাঁওতালী সাহিত্য রচিত হয়েছে মুখে মুখে এবং তা স্থান পেয়ে এসেছে যুগযুগান্ত থেকে তাদের স্মৃতিতে। জমসিম বিন্‌তী, কারাম বিন্‌তী অজস্র ছড়া, লোককথা, প্রবাদ, হেঁয়ালি বা ধাঁধা ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ, আমরা দেখি, তারা বাড়ীর দেওয়ালে নানারকম ফুল-পাতা, জীবজন্তু, ইত্যাদির 'ফ্রেসকো' আঁকে, গরু-মহিষের গায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে, বাদনা উৎসবের সময়ে গুরু-মহিষের গায়ে নানারকম ছাপও লাগিয়ে দেয়, আবার পূজোর সময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে দেবস্থানে যথোচিত নক্সাও আঁকে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে–সাঁওতালরা তাহলে কেন লিপি তৈরীর কথা ভাবেনি বা চেষ্টা করেনি ? জ্ঞানভাণ্ডারকে ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষিত করার কথা কি তারা একবারও চিন্তা করেনি ?

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা বহু প্রাচীন সাঁওতালী লোকসঙ্গীতের কথা স্মরণে আসে–

'মুরমু ঠাকুরকো দ বাবা
পুথি বাবাকো পাড়হাওআ
বাদোলী কঁয়ডা গাড়তে লিখন চালাঃকান।'

অর্থাৎ–

মুরমু ঠাকুররা পুঁথি পড়ে,
বাদোলী কঁয়ডা গাড়ে* লেখন যায়।

এই প্রাচীন গান থেকে নিশ্চিত অনুমান করতে পারা যায় যে, অতীতে এক সময়ে লিপির ব্যবহার তাদের মধ্যেও ছিল ; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, তারা সেই লিপি কালক্রমে হারিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি লিপি হারিয়েছে ? না, তা যত্নাভাবে মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। অব্যবহারে তার প্রয়োজনই হয় নি। কিভাবে তারা লিপি হারিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমি ধ্বনির জন্ম ও ভাষার প্রাথমিক প্রয়োগ সম্পর্কে একটা সুপ্রাচীন সাঁওতালী উপকথা তুলে ধরছি। ভাষাবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বর্মা সাঁওতাল পরগণার সাহেবগঞ্জ অঞ্চল থেকে তা সংগ্রহ করেন। উপকথাটি এরূপ ঃ-

"সাঁওতালদের আদি পিতামাতা ছিলেন পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়হি। তাঁদের কাছে এই পৃথিবী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও রহস্যময়ী বলে মনে হত। ধ্বনির জন্ম তখনও হয়নি। প্রকৃতিই তাঁদের অনুভূতির আদান–প্রদানের ব্যবস্থা করত। একদিন মারাং বুরু (লিটা) তাঁদের একটি সরোবরের ধারে নিয়ে গেলেন এবং মাটি থেকে এক টুকরো পাথর হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'এই পাথরটি কোথায় আছে ?"

"তোমার হাতে।"

মারাং বুরু তখন পাথরটি সরোবরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– "এখন পাথরটি কোথায় ? ফেলে দেওয়ার সময়ে ওটি কোন শব্দ বহন করেছে কি ?"

"হ্যাঁ, ওটা তো জলে ডুবে গেছে।ফেলে দেওয়ার সময় 'বোঁ' ধ্বনি হল।"

মারাং বুরু তখন পরিষ্কার ভাষায় জানালেন যে, ধ্বনির ওপারে দেবশক্তির আবাস। এপারে লৌকিক জগৎ। মানুষ ধ্বনির মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করতে

* গাড়–দুর্গ

পারে। এইভাবে মারাং বুরু তাঁদের প্রথম প্রার্থনা শেখালেন আর ভাষায় সেই প্রথম প্রয়োগ হল।

এরপর লিপির আবশ্যকতা তারা স্বভাবতই অনুভব করতে থাকে। মানুষের অনুভুতিকে সংকলন করার চেষ্টা চলে। ফলে ধ্বনি চিহ্ন অঙ্কিত করে তার অভিব্যাক্তিকে রূপ দেওয়া হয়।

এই লিপি আবিষ্কার সম্পর্কেও এক সাঁওতালী লোককথা পাওয়া যায়। নির্মলকুমার বর্মা এই লোককথাটিও সাহেবগঞ্জ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন। লোককথাটি এরূপ ঃ-

সিন্ধু প্রদেশে বসবাসকালে মুর্মু গোত্রের উপর লিপি তৈরীর ভার পড়ে। সাত জন বিজ্ঞ মুর্মু মিলিতভাবে কাজ শুরু করলেন। কিভাবে এ কাজ তাঁরা করবেন তা নিয়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলল। শেষে সাতটি পাতা বন্টন করে একটা প্রলেপ তৈরী করা হল। সেটি ক্ষুদ্র ঢাক জাতীয় নাকারার চামড়ার উপর তাঁরা লাগালেন। একজন হাত দিয়ে আঘাত করলেন, আর বাকি ছয়জন দেখতে থাকলেন। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে একটি ধ্বনি উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে তা বিলীন হয়ে গেল। হাতের ছাপ কিন্তু নাকারার ওপর থেকেই গেল। এই সাত বিজ্ঞ পূর্বপুরুষ তখন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ধ্বনির ঐ চিহ্নকে যদি ভিত্তি করা যায় তো তার দ্বারা ভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।

কিন্তু প্রশ্ন হল—ধ্বনি তো অনেক। তাহলে ভাব প্রকাশের সংকেত চিহ্ন কি ভাবে ? কোথা থেকে সে রকম কিছু তাঁরা জানতে পারবেন ? প্রকৃতিই তাঁদের সাহায্য করলেন। তাঁরা একদিন দেখলেন, একটি বাঁধে ফাটল হওয়ায় বাঁধের জল আস্তে আস্তে নীচের দিকে বইতে শুরু করেছে এবং ক্রমেই মাটির উপর একটা বিশেষ আকৃতি নিচ্ছে। জল যদি নিজেই চিহ্ন খুঁজে নিতে পারে, তাহলে ধ্বনিই বা পারবে না কেন ? তাঁরা সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে, মাটির উপর দিয়ে জীবজন্তু যখন যায় তারাও একটটা চিহ্ন রেখে যায়। তাহলে ধ্বনিই বা নিত্য ব্যবহারের জন্য কিছু চিহ্ন কেন খুঁজে পাবে না ?

এইসব চিন্তা করার পর কোন সমস্যাই আর তাঁদের কাছে বাধ্য হয়ে থাকল না। তাঁরা দেব-দেবীদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গুহা-মানব, শিকারী-মানব, পশু-পালক মানব, কৃষিজীবী মানব প্রভৃতি থেকে চিহ্ন সংগ্রহ করে ধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লিপি তৈরী করলেন।

এই লোককথাটিই আমাদের কাছে স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে, এক সময়ে সাঁওতাল সমাজেও লিপির ব্যবহার ছিল। কিন্তু সে লিপি তবে গেল কোথায় ? কেনই বা তাঁরা সে লিপি অক্ষত রাখেননি ?

বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখার মত বিষয়। কিন্তু অনুসন্ধান ঠিকমত হয়নি বলে আজও অনেক কিছু প্রকৃত তথ্য চাপা পড়ে আছে। সাঁওতালরা আজও তাদের আন্তর্জাতিক জাতিবিজ্ঞানে নিজস্ব আসন সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আজও তাদের অনেকের মধ্যে হীনতা-ভাব দেখায় যায়। অথচ, বিদেশীরা একের পর এক তাদের সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে ক্রমান্বয়ে গবেষণা করে গেছে এবং আজও করে চলেছে। বলতে বাধা নেই, এ পর্যন্ত সাঁওতালদের সম্পর্কে যে পরিমাণে কাজ হয়েছে সেই পরিমাণে কাজ আর কোন আদিবাসী গোষ্ঠী সম্পর্কে হয়নি।

জে. ট্রয়জি তাঁর 'The Santals' গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে ৪৮৭টি মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ করে গেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বিদেশী গবেষকরা একমাত্র তাদের সম্পর্কেই-বা অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন কোন ? কারণ কি ? আমার স্পষ্টই মনে হয় যে, আদিবাসী সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে বিদেশী গবেষকদের মনে নিশ্চিত এই প্রশ্নটা জাগতে পারে যে, যাদের মাজের কাঠামোটা এত মজবুত, সংস্কৃতি এত উদার, তারা পিছিয়ে আছে কেন ? এরই উত্তর তাঁরা খুঁজছেন, কিন্তু পান নি। সমাজ কাঠামোটা শক্ত ও মজবুত রাখার জন্য পারগানা, মাঁঝি, জগ-মাঁছি, পারানিক, গডেত প্রভৃতি পদাধিকারী ব্যক্তি আছেন। বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পারগানা বাইসি, মাঁঝি বাইসি আর ল-মহল বাইসি আছেন। সমাজের বিবাহপ্রথাও বিবিধ–ধনী সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য 'কিরিঞ্ বীহু বাপ্লা' বা 'দুয়ীর সিন্দুর বাপ্লা' আর গরীব বা বিত্তহীন ব্যক্তিদের জন্য 'টুংকি দিপিল বাপ্লা'। আবার কিশোর-কিশোরীর ভাব-ভালবাসা হয়ে থাকলে আর ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকরা সহজে বিবাহে রাজী না হলে 'অর আদের বাপ্লা' এবং 'ঞির বল বাপ্লা' প্রথা চলিত। নমস্কার জানানোর ধরণও বহু রকমের—গুরুজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বেহাই-বেয়ান, ছেলেমেয়ে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নমস্কার বা প্রণাম করার ধরণ আলাদা আলাদা। প্রণাম করার ধরণও যেমন আলাদা আলাদা, তেমনি প্রণাম করার প্রথাও পৃথক। আবার দেখা যায়, জঙ্গলের গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অসাধারণ। কোন্ গাছের শিকড় বা পাতার রস কোন রোগ-অসুখে লাগে সাঁওতালী-২তা তারা অনায়াসে বলে দিতে পারে। আয়ুর্বেদ

বিজ্ঞানে তাদের এই স্বাভাবিক জ্ঞান সত্যিই দ্রষ্টব্য ! ১৮৫৫-৫৬ সালের অবিস্মরণীয় সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এক ইংরাজ সেনানায়ক স্পষ্টই এ কথা স্বীকার করে বলেছিলেন—

> "এই যুদ্ধে আদিবাসীরা একটা দারুণ বীরোচিত আচরণ দেখিয়েছিল তা স্মরণ রাখার যোগ্য। জাতিগতভাবে সমস্ত গাছ-গাছড়ার বিষ সম্বন্ধে তাদের আশ্চর্যরকম একটা সহজাত জ্ঞান আছে। সে সব গাছ-গাছড়াও তাদের জঙ্গলে প্রচুর এবং তারা শিকার ও হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের তীরের ফলা সেই সব প্রস্তুত বিষের রসে ভিজিয়ে নেয় এবং সে বিষ এতই ভয়ানক যে, একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘের গা যদি সেই বিষ লাগানো তীর লেগে সামান্য ছড়েও যায়, তবে আধ ঘন্টার মধ্যে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবু এসব সত্ত্বেও তারা আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে এমন একটা সুযোগ নেওয়া অবজ্ঞাভরে পরিহার করেছিল, বস্তুত বিষাক্ত তীর আহত হওয়ার একটি দৃষ্টান্তও আমার চোখে পড়েনি।"*

যুদ্ধের সময়ে শত্রুদের পরাস্ত করার জন্যে, তাদের পর্যুদস্ত করার জন্য, সকলপ্রকার অস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত। আধুনিক সুসভ্য জাতির সৈন্যরা নির্বিচারে বোমায় নিরীহ জনগণের প্রাণনাশ করতে পরাঙমুখ নয়। বিষবাষ্পও নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়। আর সেই মধ্যযুগে এমন পরাক্রমী বিষের অধিকারী হয়েও তারা কদাপি শত্রুর উপর তা ব্যবহার করেন নি এমন উদারতা সত্যই সুদুর্লভ।

এরকম উন্নত চরিত্র ও সংস্কৃতিসম্পন্ন একটা জাতি আজ কি কারণে পিছিয়ে আছে সেটা জানার আগ্রহ সবারই হয়। বিদেশী গবেষকরাও হয়তো তাই বরাবর সাঁওতালদের সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। যাই হোক, এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হলে তাদের অতীত ইতিহাস তুলে ধরতে হয়। সাঁওতাল তথা সমস্ত খের্‌ওয়াল জনগোষ্ঠী এক সময়ে সিন্ধু-উপত্যকায় বসবাস করত। কঁয়ডা, বাদোলী, চায়, চাম্পা, খায়রি, কুটামপুরি, হারবালোয়ং, বানসারিয়া প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর গড় তারা সেখানে তৈরী করেছিল। নির্মলকুমার বর্মা এই সময়টিকেই খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করে তার 'চায়-চাম্পা' দাগ গোড়োন (সিন্ধুলিপি), গ্রন্থে উল্লেখ করছেন। এই সিন্ধু-উপত্যকার খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যদের বহু বছর লড়াই চলেছিল। বৈদিক যুগে এই যুদ্ধই 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পাওয়া যায়—

* ই. জি. ম্যান : সনথালিয়া এণ্ড সনথালস, পৃ-১২০-২১

'দেবাসুরমভূদ যুদ্ধং পূর্ণমব্দ শতং পুরা।'

অর্থাৎ–

'শতবর্ষব্যাপী দেবাসুরের সংগ্রাম পুর্ণ হয়েছিল।'

এই ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে খেরওয়াল সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিপর্যয় ঘটল। খের্ওয়াল জনগোষ্ঠী আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল বনে-জঙ্গেল, পাহাড়ে-পর্বতে। দুর্গম জঙ্গলের ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে বহুকাল ধরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হল এবং যাযাবরের মত আস্তানা বেঁধে বনে-জঙ্গলে অনার্য জীবন যাপন করে অক্ষুণ্ণ রাখল তাদের স্বাধীনতা ও নিজস্ব সত্তা। কলেয়ান গুরু তাঁর 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থে দীর্ঘ যাযাবর জীবনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–'লুমাম লেকাগেলে ঔাতিঞ হেচআকানা' অর্থাৎ 'গুটিপোকার মতই গুটি গুটি চলে এসেছি'। এভাবে তারা বাঁচিয়ে রাখল তাদের আদি সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য জাতিগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল বহিরাগত আর্যরা। তাদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করেও বহু শতাব্দী পরেও অনার্যরা আজও ভারতের আদি বাসিন্দা বলে সগর্বে গণ্য হয়ে আসছেন। তাই সেই দীর্ঘ শতবর্ষকাল কম নয় ! এতকাল জীবনটুকু হাতে নিয়ে যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে একটা জাতি তার অনেক কিছুই হারায়। খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর বেলাতেও তাই ঘটেছে। তবে তাদের একটা বড় অংশ ছোটনাগপুরের মালভূমির দামোদর-পাঞ্চিত অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। দুর্ভেদ্য অরণ্যকীর্ণ এ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে তারা পুনরায় গড়ে তুলল জনবসতি। কিন্তু বদলে গেল তাদের জীবনধারা। শিকার, পশুপালন চাষ-বাস, মাটি কাটা, জঙ্গল কাটা প্রভৃতি দিয়ে আবার শান্ত সংসারজীবন আরম্ভ হল। পরিবর্তিত জীবনে লিপির কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এখানে একটা কথার উল্লেখ করি। চৈতন্য হেমব্রম কুমার তাঁর 'সানতাল পারগানা, সানতাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃ ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সুদুর পাঞ্জাবে সাঁওতালী ভাষাভাষী লোক আছে, কিন্তু তারা নিজেদের সাঁওতাল বলে জানে না। তিনি লিখেছেন ঃ

"পাঞ্জাবরেন আদবাসিয়া হড় সিংকো এ্ঞতুমঃকানা। বাডায়াকানা ওনকো হঁ অনা দিসমরেকো হেচ বাসাআকান তাঁহেকানা।.........মিৎটেন হড় হপন অনা দিসমতেয় দুকানা ; ওনকো তুলুচ্ লুধিয়ানা নাঙ্গরাহারেয়

ঞাপামেনরে হড় পার্‌সিতে গালমারাও কানে আঁঞ্জমকেৎকো খান সেন সোরকাতে কুলিবাড়াওয়ানা আর আঁডিয় ভাড়োএনা।"*

অর্থাৎ–

"পাঞ্জাবে আদিবাসীরা সিং বলে অভিহিত হচ্ছে। জানা যায় তারাও ও দেশে এসে বসবাস করেছিল।.....এক সাওতাল ও দেশে যায় ; তাদের সঙ্গে লুধিয়ানা শহরে দেখা হওয়ায় এবং তারা সাঁওতালীতে কথা বলছে শুনে সে তাদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলল আর খুবই আশ্চর্য হল।"

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করি। সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে কিছু পাক সেনা বন্দী হয় এবং তাদের ফোর্ট উইলিয়মে এনে রাখা হয়। তাদের দায়িত্ব আমার পরিচিত এক পুলিশ অফিসার শ্রীভবেন্দু মণ্ডলের উপর ছিল। ভীমপুর, সাঁওতাল হাইস্কুলে তিনি পড়েছিলেন এবং সাঁওতালী কথা ভাল বুঝতে পারতেন। একদিন তিনি দেখলেন যে বন্দীরা সাঁওতালীতে কথাবার্তা বলছে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন–"আপ লোগ্ কৌন্ হ্যায় ?"

তারা বলল–"হাম লোগ্ সিন্ধ হ্যায়।" অর্থাৎ আমরা সিন্ধু দেশের লোক।

আমি এ সব কথা এজন্য উল্লেখ করলাম যে, সিন্ধু উপত্যকা অর্থাৎ চায়-চাম্পাতে বসবাসকাল পর্যন্ত সাঁওতালরা 'খেরওয়াল' নামেই পরিচিত ছিল। পরবর্তী কোন একসময় থেকে তারা 'সানতাল' নামে আপনা থেকেই অভিহিত হতে থাকে। যাই হোক, লিপিপ্রসঙ্গে আসি। দেবাসুর সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে খের্‌ওয়াল তথা সাঁওতাল সমাজে লিপির নিশ্চিত ব্যবহার ছিল। আমরা তা তাদের প্রাচীন লোকসঙ্গীত থেকে জানতে পারি। বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে তারা মনের ভাব সুপ্রকাশ করত এবং আজও তা প্রকাশ করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলি, কোন খবর নির্দেশ পাঠাবার জন্য পাতার ডাল পাঠানো হয়। সাধারণত মহুয়া পাতার ডাল, আম পাতার ডাল ও শাল পাতার ডাল পাঠানো হয়ে থাকে এবং তা দেখেই সাধারণ মানুষ খবর পাঠানোর মূল অভিপ্রায় জানতে পারে। মহুয়া পাতার ডালের অর্থ বৃহৎ 'সমাজসংক্রান্ত সভা', আম পাতার ডালের অর্থ 'উৎসব', পাতা পরব ইত্যাদির সম্মেলন এবং শালপাতার ডালের অর্থ 'বিরাট জনসভা' বা দিসম দরবার। সাঁওতাল বাড়ীর দেওয়ালে যে

* চৈতন্য হেমরম কুমার : সানতাল পারগানা, সানতাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃ ইতিহাস, পৃ-৫০-৫১

সব দেওয়াল-চিত্র বা ফ্রেসকো দেখা যায় সেগুলিও রীতিমত সংকেত-সম্বলিত। যেমন, কোন সাঁওতাল বাড়ীর দেওয়ালে লতা-পাতা-ফুল-ফল আঁকা আছে, লতা-পাতার গাছটি লিক লিক করে বেড়ে চলেছে। এই দেওয়াল-চিত্রের অর্থ, একান্নবর্তী পরিবার এবং বাড়ীর লোকজন সুখে-শান্তিতে আছে, সাংকেতিকভাবে তাই যেন বলা হচ্ছে। নাচ-গানের, মাদল, নাকাড়া, বাঁশীর দেওয়াল-চিত্র তুলে ধরে সে বাড়ীর লোকজন জানায় যে, তারা সঙ্গীতরসিক। তীর-ধনুক, কুকুরের দেওয়াল চিত্র তুলে ধরে জানায় যে, বাড়ীর লোক খুবই শিকার প্রিয়। এরকম বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে তারা মনের ভাব প্রকাশ পায়। এগুলির আকৃতি ভাবাত্মক বা বিবরণাত্মক, বর্ণাত্মক নয়। বিজ্ঞ মুর্মু পূর্বপুরুষরা নিশ্চয় পুরো চিহ্ন প্রয়োগ না করে তার প্রারম্ভিক উচ্চারণ অথবা ধ্বনিকে তার আকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেই লিপি তৈরী করেছিল; কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় অবস্থা বিপর্যয়ে সাঁওতাল সমাজ এই লিপি সুরক্ষিত রাখতে পারেনি। অন্যন্ত ক্ষোভের বিষয় একটি সুপ্রাচীন রসস্নিগ্ধ প্রাকৃত জনের মনোরঞ্জক ব্যাপক ধারায় প্রবাহিত গণসাহিত্য কেবল মাত্র যুগ যুগান্তর ধরে মানসলোকেই বিরাজমান, তাকে বিশ্বজনের চোখের সামনে লিপিমাধ্যমে সযত্নে উপহার দেওয়ার কোন প্রচেষ্টাই হয়নি।

ফলে, সাঁওতালী সাহিত্যের বহু অমূল সম্পদ আজও অলিখিত অবস্থায় পড়ে আছে। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত অজস্র কথা, উপকথা, গল্প, কাহিনী, ছড়া, কবিতা গান প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদিই ঐ মৌখিক সাঁওতালী সাহিত্যের বিষয়বস্তু। এগুলির মধ্যেই জাতির মানসপ্রকৃতি, শিল্পচেতনা ও আত্মপরিচয় সংগোপনে ধরা পড়ে। সাঁওতালী সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্যময় ও বিচিত্র স্বাদে রূপায়িত করার মূলে এগুলির অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস অপরদিকে তেমনি রয়েছে মানবিক প্রেম ও প্রাণরসে উচ্ছ্বাসিত নীতিকথা ও কর্মবহুল জীবনের চরম পরাকাষ্ঠার প্রকাশ। সাঁওতাল সমাজের জীবনপ্রবাহের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে এগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতি ও মৌখিক সাহিত্য মানসকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে সেই সাহিত্যের সামান্য অবদানই কেবলমাত্র স্মরণের পরমপটেই শুধু আবদ্ধ, পরম সৌভাগ্য সাঁওতাল সমাজে বংশপরম্পরা সেই আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, যা তাকে বিস্মরণে অবলুপ্ত হতে দেয় নি।

ছড়া

প্রথমে ছেলে ভুলানো ছড়া নিয়েই আলোচনা করি। এগুলি কেবল শিশুদেরই উপভোগ্য নয়, পূর্ণবয়স্কদেরও এসব রচনা যথেষ্ট আনন্দ দেয়। কারণ, এগুলি শুনলে সেই হারানো দিনের ভুলে যাওয়া শিশু জীবনকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ফিরে পাওয়া যায়। হারানো ধনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ তো কম নয় ! যেমন-

আলে কুনু বায় রাগা,
সিম চুপিলে রাপাঃ আয়া,
রঙ্গো দাকালে খায়ৎ আয়া,
কুঊম কুঊমতেয় জম আচুরা॥

অর্থাৎ–

আমাদের কুনু কাঁদে না,
মুরগীর লেজ তারে পুড়িয়ে দিই।
পোড়া ভাত তারে বেড়ে দিই,
কাঁদাল* দিকে ঘুরে ঘুরে খায়॥

কিংবা–

ধাদরা হাটাঃ চাতম তিঞ
হাড়াম পুসি সাদম তিঞ
হর হরতিঞ লাগাকেদে
কাড়াপ্ কাড়াপ্ কাড়াপ্॥

অর্থাৎ–

ভাঙ্গা কুলো আমার ছাতা,
বুড়ো বেড়াল ঘোড়া
রাস্তায় রাস্তায় ছোটালাম,
কাড়াম্ কাড়াপ্ কাড়াপ্॥

এ সব ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে হাস্য-কৌতুক আছে, রঙ্গ-তামাসাও আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তো আছেই, কিন্তু নিছক নোংরামি নেই। গানের মত সুরু করে অনেক সময়ে ছড়া গাওয়া হয়। অবশ্য এ রীতিটি বিশ্বসমাজের সকল জননীর মধ্যেই প্রচলিত।

---

* কাঁদাল–বাড়ীর পিছন দিক

প্রথমে ঘুমপাড়ানী ছড়াই তুলে ধরি। সাঁওতালীতে ঘুমপাড়ানী ছড়া যথেষ্ট আছে। এগুলো সুর করে গাওয়া হয়। আমি এখানে দুটি ঐ ধরণের ছড়ার উল্লেখ করলাম–

(১) লীলী লীলী হীরলী লী
গিদী দয়ে জীপিদ্ তালে
গিদী দয়ে জীপিৎ কাতালে॥

আম গগ দ গিদী
গাডা পারমে সেন আকান
হেচ্‌কাতে দ গিদী,
সিলপিঞ্‌ লেকায় পিঠাওয়ামা
গুড়গু লেকায় ডম্বঃক্ আমা
কুডীম কুডীমতে জম বাড়ায়া॥

অর্থাৎ–

লো লো লো, লো লো লো
খুকু মোদের ঘুমোবে,
খুকু মোদের ঘুমোবে॥

মা গেছে নদীর ওপার,
ফিরে এসে দেবে, তোমায়
কপাট সমান পিঠা,
নোড়ার মত নাড়ু,
বাড়ীর পিছনে খেয়ে বেড়াবে॥

(২) নি দো বাবা গো,
আলম রাগা গো,
এঙ্গাম দয় কীমিকানা
আপুম দয় সিয়োঃ কানা
নি দো...... ॥

অর্থাৎ–

ঘুম ঘুম বাবা আমার,
আর মোটেই কাঁদিস না।

মা তোমার কাজ করে,
বাবা তোমার লাঙ্গল চষে
ঘুম ঘুম...... ॥

সাঁওতাল গ্রামে অনেক সময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করার মধ্যে নানারকম ছড়া কেটে পরস্পরকে তাড়া করে বেড়ায়। স্বভাবতই এ সব ছড়া ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিশ্চিত রচনা করে, পল্লী পরিবেশের সঙ্গে এগুলি সঙ্গতভাবেই খাপ খায়। যেমন—

হালায় হালায় হালায়
কাঁহ্ কাঁঃক্ কাঃক্
ঠন্টা রেতাম তেজো
তোয়ো ফেউ ফেউ।
মেন দীড় মে গুয়ুং
ঝাণ্টিরে লাংটি সেতায় পারমেন
তোয়ো ফেউ ফেউ॥

অর্থাৎ—

পালাও পালাও পালাও,
কাক তুমি পালাও,
ঠোঁটে তোমার পোকা,
শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া,
তাড়াতাড়ি পালাও,
বেড়া ভেঙ্গে নেড়ি কুকুর পালায়,
শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া॥

আবার কিছু কিছু খুব মজার ছড়াও আছে, সেগুলি বলতে যেমন ভাল লাগে শুনতেও তেমনি ভাল লাগে। তবে এ সমস্ত ছড়ায় এমন অনেক কথা থাকে যেগুলির মানে করা যায় না। এ রীতি বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত, কার্যত বিশ্বজনের সবার মধ্যেই প্রচলিত। এই অবান্তর অর্থহীন কথাগুলি ব্যতীত ছড়া পা ফসকে পড়ে যাবে-এগুলি তার চলার পথে লাঠি। ছড়ার ছন্দ ঠিক রাখার জন্য এবং ছড়াটি উপভোগ করার জন্য এ ধরণের শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ইতিঞ্ বিতিঞ্ জাঁওয়াই বিতিঞ্,
তালকুড়িরে মাঙ্গাড় বিতিঞ্,
সিঁজো সাকাম সিঁজো সাকাম,
জমকেদালে, ঞু কেদালে
লিত্‌কি লিতিঃচ্ লাঁওয়া লিতিঃচ্,
ভেঁ-ভঁ-ভেঁ-ভঁ-ভেঁ-ভঁ
গাই চারা হাবাড় হাবাড়,
মাঁটয়ীরে দামালি
সেয়া বেলে চুড়রুচ ॥

অর্থাৎ–

জামাইকে চিমটি কেটে মেজদিকে চিমটি কেটে বেলপাতায় খাওয়া-দাওয়া করলাম। ভেঁ-ভোঁ-ভেঁ-ভোঁ করে চলে এলাম। মাঠে গরু চরালাম, পচা ডিম ফেলে দিলাম।

আর একটি ছড়া ছেলেমেয়েরা খেলার সময়ে বলে থাকেন। সেটি হল–

ঝিম ঝিম ঝিমালো
ভালুক নেচে পালালো,
কোন্ পায়রা ডাক দিল ?
গুঁড়ুর গুম পায়রা।

এক কনা* ধান
পেণ্ডের মাচি মাচি
সব লোককে বিয়া দিল
টুম টুমকের রাজা।

ছোট গাইকে ছোট ঠরকা,**
বড় গাইকে ছোট ঠরকা,
কাকে ধরবি ধর
—ধর ॥

---

* কনা—ধান-চাল মাপার জন্য কাঠের পাত্র।
** ঠরকা—গরু-ছাগলের জন্য কাঠের ছোট ঘণ্টা।

এখানে কারো নাম উল্লেখ করে, সবাই তাকে ধরবার জন্য তাড়া করে। ছড়াটিতে একটি-দুটি শব্দ ছাড়া অধিকাংশই বাংলা শব্দ, তাই আর অনুবাদ করলাম না। গ্রামে সাঁওতাল, যারা সাঁওতাল নয়, সবাই একসঙ্গে বাস করে। তাদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্কও আছে। গ্রাম সম্পর্কে কেউ মামা, কেউ দাদা, কেউ দিদি। তাদের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বাড়ে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেন কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার বিষ না ছড়ায় সেজন্য দেখা যায় এ ছড়াটিতে বাংলা শব্দই বেশি। সবাই তাহলে ছড়াটি সমভাবে উপভোগ করতে পারবে।

কালীপূজোর পরের দিন সাঁওতাল গ্রামে এক মজার দৃশ্য দেখা যায়। গ্রামের যুবকরা সেদিন ছড়া আওড়াতে আওড়াতে মশা তাড়ানোর আয়োজন করে। যুবকরা সেদিন শুকনো খড় কিংবা অন্য কিছু শুকনো জিনিসে আগুন লাগিয়ে তা শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রাম থেকে খোলা মাঠের দিকে মশা তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ে এ ছড়াটিও বলে–

ধাও মেসে ধাও
তান্‌তি বুড়হিয় পান্তে আকান
ঝাণ্টি লাতার খাও।

অর্থাৎ–

ধেয়ে যাও, তাঁতি বুড়ী লাইনে আছে, মাচার নীচে খাও।

তবে সাঁওতালী সাহিত্যে ছোটদের ছড়াই বেশী, বড়দের মানানসই ছড়া সে তুলনায় কম। আর একটি কথা–বাংলা সাহিত্যে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে ছড়া আছে কিংবা অত্যাচারী ভূস্বামী আর অর্থবান প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের ব্যঙ্গোক্তি করে ছড়া রচিত হয়েছে, সাঁওতালী সাহিত্যে কিন্তু তেমন দেখায় যায় না। বাহ্যত, এর কারণ হয়তো নিরীহ সমাজের অভূতপূর্ব সহনশীলতা। এ সব ছড়া কি সত্যিই আর রচিত হন নি ? কবিকুল নীরবে তা কি সয়ে গেছেন ? অবশ্য বর্গী হাঙ্গামার বহুল প্রচারিত ছড়াটির মত সাঁওতালীতে একটি ছড়াই চোখে পড়ে। বাংলায় বহুল প্রচারিত সে ছড়াটি হল-

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ?
ধান ফুরালো, পান ফুরালো খাজনার উপায় কি ?
আর কিছুকাল সবুর কর রসুন বুনেছি॥

সাঁওতালীতে যে ছড়াটি পাওয়া যায় সেটি হল–

নতে দ জজম তুড়ুক দাঁড়াকো কান
নতে দ কঁয়ড়া রাপাজ কো ;
ম জীই দীড়জং পে
বাংখান কো সুমারাকাৎ পেয়া॥

অর্থাৎ–

এদিকে বর্গীরা ঘুরে বেড়ায়
আর এদিকে কঁয়ডা রাজারা ;
ওগো তোমরা পালাও,
নইলে তোমাদের কতল করবে॥

এ সব ছড়াও রূপকথা বলার পর যেমন শোনা যায়–

আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়োল
কেন রে নটে মুড়োলি ?
গরু কেন খায় ? ইত্যাদি

ঠিক তেমনি সাঁওতালীতেও শোনা যায়–

গাম গাম কুদুম কুদুম
তোকাতে পুসিম চালাওলেন ?
ঝুরি হালাঙিঞ চালাওলেন।
তোকোর তাম ঝুরি ?
চুলহৌ কুডীমরেঞ দহলেৎ,
মিহুগে চয় লেবেৎ রীপুৎকেৎ।
চেদাঃ মিহুম লেবেৎ রীপুৎকেৎ ?
গীইগে থ বায় তওয়ায়েৎ।
চেদাঃ গীই বাম তওয়া য়েৎ ?
ঘাঁসগে চ বাং ঘাসঃক কান।
চেদাঃ ঘাঁস বাম ঘাঁসঃক কান ?
দাঃ গে চ বায় দাগেৎ।
চেদাঃ দাঃ বাম দাগেৎ ?

হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁ

হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁ (Riddle) সাঁওতালী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুকে সহজ, সরল ও সরস কাব্যধর্মী বিচিত্র রচনায় পরিণত করেছে এই হেঁয়ালি সাহিত্য। এক সময়ে তুক-তাক অলৌকিকতার যুগে মানুষ অনেক কিছুই সরাসরি বলতে চাইত না, বা বলতে সাহস করত না। বক্তব্যকে ঘুরিয়ে কিংবা রূপকের আকারে তুলে ধরত।

এখনও দেখা যায় বহু আদিবাসী সমাজে কোন কিছু আলোচনার প্রারম্ভে বক্তব্যকে ঐভাবেই উত্থাপন করা হয় এবং পরে তা সরল করে ব্যাখ্যার ছলে আসল কথাটি বলা হয়। মনে হয়, এ ভাবেই হয়তো হেঁয়ালি সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে' এ বোধটিকে দৃঢ়ভিত্তিক করে তোলা। এগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এগুলি খুবই রসাত্মক এবং শব্দচাতুর্যে ও ভাব-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। যেমন–কোন বুড়ো মানুষের 'দাঁত পড়ে গেছে' না বলে তারা বলে 'সাদাপাথর পড়ে গেছে' কিংবা 'যাঁতার ধার ক্ষয়ে গেছে'।

আবার কারো মৃত্যু হলে 'সে মারা গেছে' না বলে তারা বলে 'সে ছেড়ে গেছে' কিংবা 'সে মাটিতে মিশে গেছে'। এ ভাবে কঠিন বাস্তব সত্যটিকে তারা কথার মনোরম ছদ্মজালে ব্যক্ত করে থাকে। এ রকম কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তাদের চিন্তা-ভাবনার পরিচয় তারা দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়–তাদের চিন্তাধারা কোন পর্যায়ের এবং কিভাবে চালিত হয়েছে তা হেঁয়ালির বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী ও গঠনভঙ্গী থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

চারটি হেঁয়ালি আমি তুলে ধরছি–

১। কুদুম কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ
চটরে গিদি তুকী লঃকান,
ফেডরে হাড়াম বুড়হিকিন রপড়কান –হকী আর কুলকা

অর্থাৎ–

চিল চিল হেঁয়ালি
উপরে শকুনের বাসা পুড়ে,
নীচে বুড়োবুড়ি গল্প করে। –হকো আর কলকে

২। কুদুম কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ
দুলীড়কাতে ক হেঁওকিদিঞা
বানার তিতেক থাপাকিদিঞা। —তুমদাক

অর্থাৎ—

চিল চিল হেঁয়ালি
ভালবেসে কোলে নিল,
দু'হাতে চাটি মারলি। —মাদল

৩। কুদুম কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ
চেতানরে মা চুন পোতাও
ইনী লাতাররে মা রিড়িম দাঃ
ইনী লাতাররে মা সনা ডোম্বোঃ —বেলে

অর্থাৎ—

চিল চিল হেঁয়ালি
উপরে চুনকাম করা
তারে নীচে পরিষ্কার জল,
তার নীচে সোনার গোলা। —ডিম

৪। কুদুম কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ
হানে চালাওএন,
নঃঅয় হেচ্‌এন
মা লৌইমে সাঙ্গাত কুড়ি
হয় স্যে বাগুো ? —মেঁৎ

অর্থাৎ—

চিল চিল হেঁয়ালি
ঐ গেল
এই এল
বল দেখি সাঙ্গাত কুড়ি
বাতাস না ঘূর্ণি ঝড় ? —চোখ

হেঁয়ালি বলার সময় সাঁওতালরা 'কুদুম কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ' বা 'কুদুমরে কুঁড়িৎ কুঁড়িৎ' কথাটি বলে হেঁয়ালি বলা শুরু করে। তাদের ধারণায়, চিল যেমন কোন

* দেবর বৌদির বোনকে সাঙ্গাত কুড়ি বলে সম্বোধন করে।

কিছুর উপর ছোঁ মারে, হেঁয়ালি সেরকম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর অকস্মাৎ আঘাত করে। বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উপর তখন প্রচণ্ড চাপ পড়ে। একটা ঝড়ের দমকা হাওয়া এসে যেন লাগে, এরকম একটা পরিস্থিতির সূচনা করে সাঁওতালী হেঁয়ালি বলা হয়।

অনেক হেঁয়ালির আড়ালে জনশ্রুতিমূলক কাহিনীও লুকিয়ে থাকে। হেঁয়ালি ব্যাখ্যা করার সময় সেটিও পরিবেশন করা হয়। কাঁকড়ার পা সম্পর্কে হেঁয়ালি ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা চমৎকার কাহিনী শোনা যায়। সেটি এখানে বলছি :

এক রাখাল ছেলে গরু চরাতে গিয়ে একটি গরু হারিয়েছিল। মনিব তা জানতে পেরে প্রচণ্ড রেগে রাখাল ছেলেটিকে গরু খুঁজতে পাঠাল। রাখাল ছেলেটি গরু খুঁজতে বের হল। হাতে লাঠি, বগলে ছাতা, সারা বন খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে সে এক খালের ধারে হাজির হল। সারাদিন কিছু খায়নি। পেটে খিদের আগুন জ্বলছে। কি আর করবে ? তাই সে কয়েকটি কাঁকড়া ধরে খালের ধারে পুড়িয়ে খেল। তারপর ছাতাটিকে খোলা অবস্থায় সেখানে পুঁতে রেখে আবার গরু খুঁজতে বের হল। এদিকে এক বাঘ দূর থেকে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। কিন্তু ছেলেটির কাছে লাঠি ও ছাতা থাকায় আক্রমন করতে সাহস করেনি। বাঘটি সেখানে এসে ছাতাটিকে জিজ্ঞাসা করল–'এই এক পা-ওয়ালা, দু' পা-ওয়ালা কোথায় গেল রে ?'

ছাতা উত্তর দিল–'দশ পা-ওয়ালাদের খেয়ে এইমাত্র সে চার পা-ওয়ালাকে খুঁজতে গেল।'

এ কথা শুনে বাঘ ভাবল, লোকটি যখন দশ পা-ওয়ালাদের খেয়ে চার পা-ওয়ালাদের খুঁজতে বেরিয়েছে, তাহলে বোধহয় আমারই খোঁজ করছে। আমারও তো চার পা-ই আছে। এখানে আর থাকা চলবে না। বাঘ তখনই সেখান থেকে পালাল।

কাহিনীটি যেমন চমৎকার, তেমনি আবার এর মধ্যে একটি ব্যাপক চিন্তাশীলতার পরিবেশ আছে। বিশেষ করে, গল্পটিতে জলচরদের সম্পর্কে বাঘের অজ্ঞতা এবং এ ধরনের অজ্ঞতার জন্য যে জীবনে ঠকতে হয় তাও তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কথার মারপ্যাঁচে প্রাণ রক্ষা হয় কিংবা পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাও তুলে ধরা হয়েছে।

হেঁয়ালি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, পল্লীজীবনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু, প্রকৃতি জগৎ ও জীবজগৎ নিয়েই নানা ধরণের হেঁয়ালি তৈরী হয়েছে।

এক কথায়, বাস্তব জগতের সঙ্গেই হেঁয়ালির সম্পর্কে, কল্পজগতের সঙ্গে নয়। হেঁয়ালির মাধ্যমে অতি পরিচিত বিষয়বস্তুকে রহস্যময় অথচ সহজ ও রসালো করে তুলে ধরা হয়। গ্রামসমাজে তাই হেঁয়ালি লোক শিক্ষার বাহন হিসাবে স্থান পেয়ে এসেছে।

বয়োবৃদ্ধরা হেঁয়ালি ভিতর দিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও লব্ধ জ্ঞান ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিতরণ করেন। সরাসরি উপদেশ না হলেও হেঁয়ালির মাধ্যমে একটা অতি পরিচিত বস্তুকে রূপকের আকারে তুলে ধরলে একদিকে যেমন বিস্ময় সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বাড়ায় বৈকি ? স্বভাবতই ছেলেমেয়েরা এই প্রসঙ্গে আরো নতুন কিছু জানতে চায়। তাদের মনের উপর এমন একটা ছাপ পড়ে যে তারা এগুলিকে অন্তরের সম্পদ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। স্কুল-কলেজের শিক্ষা অনেকেই পায় না। মেয়েরা তো বহু সময়ে পাঠশালাতেও যেতে পারে না। কিন্তু লোকশিক্ষার বা সংসারজীবনের শিক্ষার অভাব তাদের মধ্যে নেই। তারা সাংসারিক জ্ঞান লাভ করে বয়োবৃদ্ধদের এই সব তির্যক উক্তিতে। কৃষিজীবীরা কৃষির প্রথম পাঠ পায় এইসব জটিল হেঁয়ালির মাধ্যমে।

হেঁয়ালির প্রকাশভঙ্গীতে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। গদ্য কিংবা পদ্য, মিত্রাক্ষর কিংবা অমিত্রাক্ষর, যে কোন রকমেই বলা যায়। তবে অধিকাংশ সময়ই মনে রাখার সুবিধার জন্যেই একটা ছন্দোময় ধারায় ছড়ার আকারে বলা হয়। ছড়ার মত দীর্ঘ হয় না, সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। সাধারণতঃ তিন-চার পদের হেঁয়ালিই বেশী দেখা যায়। ছন্দের বাঁধন আঁটো সাঁটো, তাই যুগ যুগ ধরে মৌখিক ধারায় প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও এগুলি খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। মোট কথা–এসব হেঁয়ালি সাঁওতাল সমাজের জীবন প্রবাহের একটা নিখুঁত ছবি তুলে ধরে। এগুলির মধ্যে জাতির যথার্থ মানসপ্রকৃতি ধরা পড়ে। সাঁওতালী সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্যময় ও বিচিত্র স্বাদে রূপায়িত করার মূলে এগুলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতাল সমাজের জীবন প্রবাহের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে এগুলি সাঁওতালী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারা

বাংলা ভাষার মত সাঁওতালী ভাষাতেও অজস্র প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে। এগুলি রাতারাতি তৈরী হয় নি ; দীর্ঘদিনের সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকে এগুলি গড়ে উঠেছে। বলা যেতে পারে, এগুলি সাংসারিক মানুষের সংসার জীবনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। সত্য কথাকে সরস করতে এবং যুক্তিকে আরো জোরালো করতে এগুলি মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে। যে ভাষায় যত বেশী প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহৃত হয়, সে ভাষার সাহিত্যও তত বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন– "প্রবাদ গোষ্ঠী-জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।"

কথাটা অস্বীকার করা যায় না। এই অভিজ্ঞতা সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। আর বারবার একই অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর তারই ভিত্তিতে তা প্রবাদ-প্রবচনরূপে ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঘটনাটি হারিয়ে গেলেও প্রবাদটি অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। অবশ্য প্রবাদ-প্রবচনটির সাফল্য নির্ভর করে জনসমর্থনের ওপর স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের মাধ্যমে।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, প্রবাদ-প্রবচন যে ভাষায় যত কম, সে ভাষাও তত দুর্বল, তত রুগ্ন। কারণ, এগুলিই ভাষার প্রাণ। এগুলি সমাজমানসের স্বরূপ প্রকাশ করে। এমন কি, বক্রোক্তি, ব্যঙ্গ-কৌতুকও এসব প্রবাদ-প্রবচনে সংগুপ্ত থাকে। ফলে, অশ্লীল হোক বা গ্রাম্য হোক, যে কোন শব্দই অনায়াসে সাবলীল ঢঙে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে সাঁওতালী প্রবাদ-প্রবচনের স্বরূপ বোঝাবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ এবং সেগুলির আক্ষরিক অর্থ না দিয়ে অনুরূপ বাংলা প্রবাদটি তুলে ধরা হল ঃ

১। একেন ঠিলি দ সাড়েগেয়া।
বাংলা–ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশি।

২। কাঁড়া হাপা দ মিৎ ছটগেয় আৎআ।
বাংলা–ন্যাড়া একেবারই বেলতলায় যায়।

৩। টাকা খান বাঁহু, দাকা খান কাঁহু।
বাংলা–ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

৪। চেতান রং ছং ভিতরি ভঁদর ভং।
বাংলা–চক্ চক্ করলেই সোনা হয় না।

৫। মিৎ ধারেতে পিঠা দ বাং ইসিনঃগেয়া।
বাংলা–এক হাতে তালি বাজে না।

৬। হাটাঃতে হাতি দ অহম দাপালকেয়া।
বাংলা–শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

৭। দিনাম কোম্বড়ো মঁড়ে মাহারে দয় সাবঃগেয়া।
বাংলা–চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।

৮। ঢিংকি বুটাম সেনঃ রেসে লোবোঃ খোদেম জমা।
বাংলা–কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

৯। আপনারাঃ জমতে বির হাতি লাগা।
বাংলা–ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

১০। সাহাও খানেম লাহাঃআ।
বাংলা–যে সয় সেই রয়।

এরকম অজস্র প্রবাদ-প্রবচন সাঁওতালী ভাষায় আছে। তবে এগুলির ব্যবহার পুরুষ সমাজ থেকে নারী সমাজেই যেন বেশী হয়ে থাকে। প্রবাদ-প্রবচন রচনার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। আর এগুলি ধারণ ও বহন করার ক্ষেত্রে নারী সমাজই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রবাদ-প্রবচনের মত সাঁওতালী ভাষায় বাগ্ধারার ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোন কথাকে সরস করে বলতে এসব বাগ্ধারার তুলনা নেই। এমনিতেই যখন তারা গল্প করতে বসে তখন খুব জমিয়ে গল্প করে, আর বেয়াই-বেয়ানদের গল্প হলে তো কথাই নেই। এরকম অজস্র বাগ্ধারা সাঁওতাল সমাজে মুখে মুখে চলে এসেছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বাগ্ধারা উল্লেখ করা হল।

১। উদমী ঢিংকি–ভবঘুরে। (আক্ষরিক অর্থ–অনিয়ন্ত্রিত ঢেঁকি)

২। কারাম বিৎ–উপবাস। (আক্ষরিক অর্থ–করম গাছের ডাল পোঁতা)

৩। জেলেঞ হড়–সাপ। (আক্ষরিক অর্থ–লম্বা মানুষ)

৪। ঞিন্দী পেড়া–চোর। (আক্ষরিক অর্থ–রাতের কুটুম)

৫। চেঁড়েঁ আরসাল–ডাইনী। (আক্ষরিক অর্থ–পাখীরূপী আলো)

৬। টিপচুই চুপি–চুটি। (আক্ষরিক অর্থ–টুনটুনি পাখি)

৭। হাতি বেলে–ধামসা। (আক্ষরিক অর্থ–হাতীর ডিম)

৮। পোণ্ড পুখরি দাঃ–হাঁড়িয়া। (আক্ষরিক অর্থ–শ্বেত পুকুরের জল)

৯। ঠঙ্গা দাঃ–মদ। (আক্ষরিক অর্থ–ঠোঙ্গার জল)

১০। ছাতা দারে–স্বামী। (আক্ষরিক অর্থ–ছাতারূপ গাছ)

১১। বিঞ বহঃ–রাগ করা। (আক্ষরিক অর্থ–সাপের মাথা)

১২। লাচ্ বাবাত্–ক্ষিদে পাওয়া। (আক্ষরিক অর্থ–পেট চুলকানো)

১৩। তোয়ো দেরেং–লঙ্কা। (আক্ষরিক অর্থ–শেয়ালের শিং)

১৪। জেলেঞ চাণ্ডবল–গোমাংস।(আক্ষরিক অর্থ–লম্বা লেজ)

১৫। কাটকম ইতিল–বড়লোক হওয়া। (আক্ষরিক অর্থ–কাঁকড়ার চর্বি।

লোককথা

স্বাভাবিক ভাবেই সাঁওতালী মৌখিক সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে নানা ধরনের উপকথা বা লোককথা। এগুলি পুরুষানুক্রমে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরণেও হারিয়ে যায়নি। সাঁওতালী সমাজ এগুলি যতদূর সম্ভব আবিকৃতভাবে ধরে রেখেছে। বিদেশী মিশনারীরা সাঁওতাল জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও লৌকিক সংস্কৃত প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করেই যেন এই সব মূল্যবান লোককথা ও কাহিনী কিছু পরিমাণে সংগ্রহ করেছিলেন। এই কাজে মিশনারীদের মধ্যে রেভাঃ পি. ও. বোডিং এবং ইংরাজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে সি. এইচ্ বোমপাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, তাঁরা বিহারের সাঁওতাল পরগনা অঞ্চল থেকেই অধিকাংশ লোককথা ও কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া অঞ্চলের লোককথাগুলি আরো সরস ও সজীব। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, সেগুলি এই একবিংশ শতাব্দীর মুখে এসেও যথাযথ ভাবে আজও সংগৃহীত হয়নি। সম্প্রতি বাংলা দেশের রাজশাহী জেলা থেকে ড. মহম্মদ আবদুল জলিল কয়েকটি মূল্যবান সাঁওতালী লোককাহিনী সংগ্রহ করেছেন।

এ সমস্ত সাঁওতালী গল্পকাহিনী বা উপকথা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয় যে, তাদের সমাজে এমন কোন বস্তু নেই যে, যেগুলিকে অবলম্বন করে তাদের কাহিনী, উপকথা রচিত হয় নি। পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে দেব-দেবী, প্রথম মানব-মানবী, নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, জীব-জন্তু, পশু-পাখী—এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে কেন্দ্র করে তাদের কোন-না-কোন কথা ও কাহিনী প্রচলিত এবং এগুলিই সাঁওতালী মৌখিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বস্তু। এগুলির ভাবধারা যেমন ভিন্ন, তেমনি এগুলি যেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কাহিনীগুলির সাহিত্যমূল্য অসীম, তা ছাড়াও যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তা হল তাদের মননশীল উদ্ভবনী শক্তির সাবলীল প্রকাশ ক্ষমতা। যদিও এগুলির মধ্যে নিশ্চিত আছে কিছু কিছু অপরিণত চিন্তা-ভাবনার স্পর্শ এবং অবশ্বাস্য অকল্পনীয় বর্ণনার সমাবেশ। তবু স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, সেই অপরিণত অবস্থাতেও তাঁদের চিন্তাশক্তি মোটেই নিষ্ক্রিয় ছিল না, বস্তুত এসব কাহিনীর অবতারণা তাই তো প্রমাণ করে।

এসব কাহিনীর আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সাঁওতালদের বিশ্বাসের আদিমতম নিদর্শন 'সর্বপ্রাণবাদ' বা 'এ্যানিমিজম' এবং ম্যাজিক এ সমস্তের নিশ্চিত আকর। এ কারণেই সাঁওতালী মৌখিক সাহিত্য এমন সরস, এমন আকর্ষণীয়।

সৃষ্টিতত্ত্বের কথাই ধরা যাক। বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাঁওতালী সমাজের কল্পনাশক্তি, রসবোধ ও লৌকিক আবেদন রীতিমত সার্থক অবদান। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানও এ সব ধ্যান-ধারণাকে আদৌ উপেক্ষা করতে পারে না। বিশ্বসৃষ্টির আদিপর্যায়ে জলের উল্লেখ আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে। বস্তুত এই আদি সাহিত্য সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ।

জীব-জন্তু, পশুপাখী, নদী-নালা সম্পর্কিত কাহিনীগুলি তেমনই সমানভাবে আকর্ষণীয়। পশু-পাখী কাহিনীগুলি মানব সমাজের সঙ্গে মানববহির্ভূত সমাজকে একাত্ম করার রীতি বাস্তবিকই চিন্তনীয় বিষয়। নদী-নালা সম্পর্কিত কাহিনীগুলিতে যা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হল যে, এককালে নদীগুলিকেও মানুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পরের উপকারার্থে তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে নদী-নালা, খাল-বিল হয়ে গেছে।

একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যায়, সাঁওতালদের গোত্রগুলি জীব-জন্তু, গাছ-পালা ইত্যাদির নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলিই তাদের 'টোটেম' বা

ধর্মীয় প্রতীক। নিজ নিজ গোত্রের নামধারী জীব-জন্তু, গাছ-পালার কোনরকম ক্ষতি তারা কোনদিন তাই করে না। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ কোন এক সময়ে এই সব জীব-জন্তু, গাছ-পালার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুবাদেই গোত্রের নাম সেই সব জীব-জন্তু, গাছ-পালার নামে পরিচিত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত জীব-জন্তু, গাছপালার যেন কোন ক্ষতি না হয় সেজন্যও স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। দিন, রাত্রি, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, বজ্র-বিদ্যুৎ ইত্যাদির উদ্ভবকেন্দ্রিক কাহিনীগুলি প্রত্যেকটিই চিত্তাকর্ষক। এমনি ধরণের বিচিত্রধর্মী কথা-উপকথা সাঁওতালী সমাজজীবনকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলা বাহুল্য এগুলিই সাঁওতালী মৌখিক সাহিত্যে সমৃদ্ধিশালী উপজীব্য। এখানে কয়েকটি লোককথা তুলে ধরা হল ঃ

প্রথম কাহিনী

এক শীতের দিনে বনের মধ্যে এক বাঘ আর আক ভালুকের দেখা হল। সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা। দেখা হতেই বাঘ ভালুকে প্রশ্ন করল—ভায়া, কেমন লাগছে?

কেন, ভালোই তো—ভালুক উত্তর দিল।

বাঃ ! ঠাণ্ডা না ? গত রাতে থেকে বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। এই পৌষ-মাঘ মাসটাই শীতের কাল, না ? বাঘের প্রশ্ন।

ভালুক ঘাড় নেড়ে বলল—না ভাই, বর্ষাকালেই বেশী শীত।

বাঘ বলল—না ভাই, পৌষ-মাঘ মাসেই বেশী ঠাণ্ডা।

ভালুক কিছুতেই মানবে না বাঘের কথা। সে বলল—না আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেই বেশী শীত পড়ে। ওটাই শীতের সময়।

ভালুকের কথায় প্রবল প্রতিবাদ করে একপর্দা উঁচুতে গলা তুলে বাঘ বলল-আজ্ঞে না, মশাই। সবচেয়ে ঠাণ্ডার দিন হচ্ছে পৌষ-মাঘ মাস।

এই নিয়ে তাদের দু'জনের মধ্যে তুমুল তর্ক বাধল। কেউ কারুর কাছে হার মানবে না। দু'জনের মধ্যে ঝগড়া চলতে লাগল। ঠিক সেই সময়ই একটা লোক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটাকে দেখেই তারা ডাকাডাকি শুরু করল। বাঘ আর ভালুকের ভয়ে লোকটা ছুটতে লাগল। কিন্তু পালাবে কোথায় ? বাঘ আর ভালুক দু'দিক দিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াল। তবে তাকে অভয় দিয়ে বলল—আমাদের

একটা সমস্যার মীমাংসা করে দিতে হবে। এ মীমাংসা না করে দিলে তোমায় মুক্তি নেই।

লোকটি আতঙ্কে বসে পড়ল। নিরুপায় হয়ে বলল–তা আগে তো বল, শুনি কি সমস্যা ? নইলে সমস্যা মেটাই কি করে ?

তখন বাঘ বলল, কিছুক্ষণ আগে ভালুক ভায়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি বললাম, বল তো কোন্ সময়টা সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা ? ও বলে কিনা বর্ষাকাল। আমি তার প্রতিবাদ করে বললাম–কিছুতেই না, সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে পৌষ আর মাঘে। ও আমার কথা কিছুতেই মানবে না, বলে কিনা আষাঢ় ও শ্রাবণই সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা। এই নিয়ে আমাদের ঝগড়া কিছুতেই মিটছে না। তুমি এখন এর ফয়সালা করে দাও।

ভালুক বাঘের কথায় সায় দিয়ে বলল–ঠিক, ওই নিয়েই আমাদের ঝগড়া। এখন আমাদের ঝগড়াটা মিটিয়ে দাও তো বাপু।

তখন বাঘ বলল–তবে সাবধান, ভালুকের পক্ষে যদি রায় দাও তবে কিন্তু আমি তোমায় খেয়ে ফেলব।

ভালুকও বাঘের দেখাদেখি বলল–আমারও ঐ এক কথা। বাঘের পক্ষে যদি তুমি মত দাও আমিও তোমায় খেয়ে ফেলব।

বাঘ আর ভালুকের কথা শুনে লোকটার অবস্থা তখন কাহিল। কোন দিক্ সে সামলায় ? বাঘকে বাঁচালে ভালুক খাবে, আর ভালুককে বাঁচালে বাঘ খাবে। কি ভাবে এ ঝগড়া মেটাবে ? কোন কিছু ভাবতে পারছে না।

বাঘ ও ভালুক দু'জনেই গর্জন করে উঠল–নাও, তাড়াতাড়ি বিচার শেষ কর। কথা বলছ না কেন ? চুপ করে থাকলে চলবে না।

লোকটা কইল–না, না, কথা বলব না কেন ? কিন্তু যা বলব তা শুনবে তো? নাকি অর্ধেক বিচার শুনেই আমাকে খেয়ে ফেলবে ?

বাঘ ও ভালুক দু'জনেই বিচারের রায় শোনার জন্য ছটফট করছিল। তারা বলল–কেন শুনব না ? তোমাকে তো আমরা বিচারকই মেনেছি। তোমার কথাই শুনব। কিন্তু সাবধান ! ঠিক মত ভেবেচিন্তে বিচার করবে। আমরা দু'জনেই তোমার বিচারে যেন সন্তুষ্ট হই। সন্তুষ্ট না হলে কিন্তু তোমাকে আমরা খাবই খাব। তোমার আজ আর নিস্তার নেই।

লোকটা এবার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল–তাহলে শোন, তোমাদের কারো কথাই ঠিক নয়। পৌষ-মাঘও শীতের মাস নয় আর আষাঢ়-শ্রাবণও শীতের মাস নয়। আসলে যখনই বাতাস জোরে বয়, তখনই শীত লাগে। বর্ষাকালে বাতাস জোরে না বইলে শীত লাগবে না। আবার পৌষ-মাঘেও জোরে বাতাস না বইলে শীত লাগবে না। কাল রাত থেকে জোরে বাতাস বইছে, তাই আজ এত ঠাণ্ডা। বাতাস না বইলে ঠাণ্ডাই থাকত না। তবে আর একটা কথা আছে–বর্ষাকালে ভালুকের গায়ের লোম জলে ভিজে যায় বলে তার ঐ সময়ে বেশী শীত লাগে। কিন্তু এখন বর্ষা নেই, ওর ঐ লোমের জন্য তাই এখন এত আরাম। কিন্তু বাঘ মশাইয়ের তো ওর মত গায়ে লোম নেই, তাই তার এখন দারুণ শীত। সত্যি কথা বলতে হাওয়াই হচ্ছে শীতের কারণ, অন্য কিছু নয়। তোমরাই চিন্তা করে দেখ আমার কথা ঠিক কিনা !

বাঘ ও ভালুক দুজনেই সমান খুশী হয়ে ফিরে গেল। লোকটাও বেঁচে গেল।

গল্পটি থেকে সাঁওতালদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যেমন পাওয়া গেল, মধ্যপন্থা অবলম্বনে তার স্বাভাবিক জীবনবোধেরও সাক্ষ্য পাওয়া গেল। এ যেন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

দ্বিতীয় কাহিনী

এক বনে থাকত এক বাঘ। প্রতিদিন সে বন থেকে বেরিয়ে আশেপাশের গ্রামের লোক-জন গরু-ছাগল মেরে খেত। তার অত্যাচারে গ্রামের লোকেরা সব অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, কিন্তু কেউ বাঘটিকে মারতে সাহস করত না। বাঘটির অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে চলল, গ্রামবাসীদের গ্রামে বাস করা ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এই অবস্থায় একটা কিছু না করলে আর চলছে না।

গ্রামের লোক একদিন এক হাটে সমবেত হয়ে বাঘটিকে মারার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক হল, পরের হাটবারে গ্রামের সবাই তীর-ধনুক, লাঠি-সোটা নিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে হাটে উপস্থিত হবে এবং একসঙ্গে সমস্ত জঙ্গল ঘিরে ফেলে বাঘকে হত্যা করবে। কথা যেমন কাজও তেমন।

হাটের দিন হাজার হাজার লোক ঢোল পেটাতে পেটাতে তীর-ধনুক, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাটে হাজির হল। সারারাত চলল হৈ-চৈ আর ঢাক পেটানো। ঢাকের শব্দে

মানুষ তো দূরের কথা, জঙ্গলের সেই বাঘের পর্যন্ত ঘুম ছুটে গেল। বাঘ বুঝতে পারল, আর তার নিস্তার নেই। সকাল হলেই মরণ। কাজেই সূর্য ওঠার আগেই সে জঙ্গল ছেড়ে পালাতে লাগল। যে দিকে শব্দ নেই, সেই দিকেই দ্রুত চলল।

এদিকে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক জঙ্গল ঘিরে ফেললো। আর সমস্ত জঙ্গল তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু বাঘের আর সন্ধান পেল না। তারা বুঝতে পারল যে, ভয়ে বাঘ পালিয়েছে।

বাঘ যে পথ দিয়ে পালাচ্ছিল সে পথ দিয়ে এক লবণ ব্যবসায়ী গাড়িতে করে একগাদা লবণের বস্তা নিয়ে যাচ্ছিল। সামনে বাঘকে দেখেই সে তো ভয়ে কাঁপতে লাগল। বাঘের হাতে আজ নিশ্চিত প্রাণ যাবেই। বাঘ কিন্তু ব্যবসায়ীকে কাঁপতে দেখে বলল–"ভয় নেই, আমি তোমাকে খাব না। আমি বড়ই বিপদে পড়েছি, আমাকে বাঁচাও।"

ব্যবসায়ী বলল–"তোমার আবার বিপদ কিসের ?"

"দেখছ না দলে দলে লোক তীর-ধনুক নিয়ে আমাকে মারতে আসছে ? ঐ শোন তাদের চিৎকার আর ঢাকের আওয়াজ" –বাঘ বলল।

লবণ ব্যবসায়ী বাঘের বিপদের কথা বুঝতে পারল। কিন্তু বাঘকে সে কেমন করে বাঁচাবে ভেবেই পেল না। বাঘ তখন তাকে বলল–"তোমার এক বস্তার মাল ফেলে দিয়ে আমাকে বস্তার মধ্যে ভরে রাখ। তারপর অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দিও।"

ভয়ে ব্যবসায়ী তখন বাঘের কথামতই কাজ করল। এক বস্তার সব লবণ রাস্তায় ফেলে দিয়ে বাঘকে বস্তার মধ্যে ভরলো। তারপর গাড়ির উপরে চাপিয়ে সে এগোতে লাগল। অনেক দূরে গিয়ে যখন দেখল বাঘের আর কোন বিপদ নেই, তখন বাঘকে ছেড়ে দিল।

কিন্তু বাঘ বস্তা থেকে বেরিয়েই অন্যরূপ ধারণ করল। বাঘ বলল–"আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, আমি তোমাকেই খেতে চাই।"

ব্যবসায়ী বাঘের কথা শুনে তো অবাক। সে বলল–"আমি তোমার প্রাণ বাঁচালাম আর উল্টে তুমি আমাকেই খেতে চাও ?"

বাঘ বলল–"হ্যাঁ, উপকারীকেই খেতে হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বিশ্বাস না হয় তুমি পুকুরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।"

ব্যবসায়ী তখন পুকুরের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বিচার চাইল।

পুকুর বলল—"মানুষ আমার জল খায়, জলে স্নান করে, কাপড় ধোয়, সবকিছু পরিষ্কার করে। কিন্তু তারা আবার আমার জলেই কফ-থুতু ফেলে, ময়লা ফেলে। আমার জল নোংরা করে। মানুষ অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। কাজেই আমার বিচারে বাঘ তোমাকে খেতে পারে। মানুষ তার বধ্য, তাই কোন অন্যায় হবে না।"

পুকুরের কথায় ব্যবসায়ী নিরাশ হল। বাঘকে বলল—"শুধুমাত্র একজনের বিচারের রায়ে তুমি আমাকে খেতে পারবে না। সামনে বটগাছ আছে, তার কাছে বিচার চেয়ে দেখি সে কি বলে ?"

বাঘ তার প্রস্তাবে রাজী হল। ব্যবসায়ী বটগাছের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে বিচার চাইলো। বটগাছ ব্যবসায়ী সব কথা শুনে দুঃখ করে বলল—"মানুষ রোদের সময়ে ছায়ার জন্য আমার তলায় এসে বসে। আমি তাদের ছায়া দিই, বাতাস দিই। কিন্তু তাদের উপকার করা সত্ত্বেও তারা চলে যাওয়ার সময়ে আমার ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছেঁড়ে, আমার ঝুরিগুলোও কেটে দেয়। মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ, সুতরাং বাঘ তোমাকে স্বচ্ছন্দে খেতে পারে। তাতে তার কোন দোষ হবে না।"

বটগাছের কথা শুনে বাঘ বেজায় খুশী। সে ব্যবসায়ীকে বলল—"দেখলে তো, বটগাছও একই রায় দিলেন। এবার আমি তোমাকে খাব।"

বাঘের কথা শুনে ব্যবসায়ী ভয়ে কাঁপতে থাকল। ঠিক সে সময়ে সেখানে হাজির হল এক শেয়াল। ব্যবসায়ী শেয়ালকে দেখে বাঘকে বলল—"আমাকে তো তুমি খাবেই ; তবে তার আগে এই শেয়ালের কাছে সর্বশেষ বিচার চেয়ে দেখি, সে কি বলে।"

বাঘ ভাবল, শেয়ালও তো জঙ্গলেরই জন্তু, তার মত জঙ্গলেই বাস করে, অতএব তার রায় নিতে দোষ কি ?

বাঘ আর কোন আপত্তি করল না। ব্যবসায়ী শেয়ালের কাছে সব কথা খুলে বলল।

শেয়ালের সঙ্গে বাঘের বিরোধ, বাঘের মাতব্বরি শেয়াল পছন্দ করে না। সে এই সুযোগে বাঘকে শাস্তি দেওয়ার ফন্দি আঁটলো। শেয়াল বাঘকে বলল, "আমি বিচার করব ঠিকই, কিন্তু তার আগে আমি দেখতে চাই এই সামান্য বস্তার মধ্যে বাঘমশায় থাকলেন কেমন করে ? মনে হয় সব কথা তুমি বানিয়ে বলছ !"

শেয়ালের কথায় বাঘ ক্ষেপে গেল এবং সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বস্তার মধ্যে দিব্যি ঢুকে পড়ল। বাঘ সেই বস্তার মধ্যে ঢুকেছে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী শেয়ালের কথায় বস্তার মুখ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

তারপর বাঘকে গাড়িতে চাপিয়ে ব্যবসায়ী আর শেয়াল গাড়ি চালিয়ে দিল। এক পাহাড়ের কাছে এসে শেয়াল ব্যবসায়ীকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থামল। শেয়াল তখন ব্যবসায়ীকে বলল–বস্তাটা না খুলে বাঘের মাথাটা একটা পাথরের ওপর রেখে অন্য পাথর মেরে মাথাটা ফাটিয়ে দাও।

ব্যবসায়ী শেয়ালের কথামত বাঘের মাথাটা পাথর মেরে থেঁতলে দিল। বাঘ মারা গেল। আর শেয়ালও খুশীতে হাসতে হাসতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

এ সব জীব-জন্তু-পশু-পাখী প্রধান গল্পকেই সাধারণতঃ বলা হয় উপকথা, পাশ্চাত্ত্যে যাকে বলে Animal Tales, তবে উপকথা তথা লোককাহিনীতে শুধু জীব-জন্তুর কথাই থাকে না, মানুষের কথাও থাকে। সাঁওতালী উপকথায় জীব-জন্তু, পশু-পাখী এবং মানব চরিত্রের নানা সমাবেশ দেখা যায়। জীব-জন্তুর কাহিনীর পরই রূপকথার স্থান। ইংরেজী Fairy Tales এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপকথা। Fairy Tales বলতে পরীর গল্প বোঝালেও সব গল্পেই কিন্তু পরীর দেখা পাওয়া যায় না। রাক্ষস-খোক্কসের পুরীতে গমন, রাজপুত্র কর্তৃক অসাধ্যসাধন, দৈবসাহায্য, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ইত্যাদি রূপকথার বৈশিষ্ট্য। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "কোন কোন লোককথা অতিরিক্ত রোমান্স ধর্মী, কল্পনা স্বপ্নরাজ্যে ইহারা স্বাধীন বিহার করিয়া থাকে, ইংরাজীতে ইহাদ্গিকে Fairy Tales ও বাংলায় রূপকথা বলা হয়।"

এই ধরণের রূপকথাভিত্তিক অনেক কাহিনীই সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত আছে। এরকম দুটি কাহিনী এখানে তুলে ধরা হল।

প্রথম রূপকথা

বহুকাল পূর্বের কথা। কিস্কুরা তখন ছিল দেশের রাজা। প্রজারা মহাসুখে ছিল। একদিন দরবারে এক তাঁতি আর এক কামার এসে বলল–মহারাজ, বিচার চাই।

কিস্কু রাজা জিজ্ঞাসা করলেন–কি বিচার ? প্রথমে তোমাদের অভিযোগ পেশ কর।

তখন দু'জনেই বলল–মহারাজ, আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বড়, সেটা আমরা ঠিক করতে পারছি না, এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অবিরত ঝগড়া চলছে।

রাজা বললেন–আজ আর বিচার করছি না। তোমরা এক সপ্তাহ পরে তোমাদের তৈরী জিনিস নিয়ে এস ; তা দেখে আমি সুবিচার করব। তার আগে বিচার হবে না।

রাজার কথা শুনে দু'জনেই বাড়ী ফিরে এল এবং নিজেদের জিনিস তৈরী করল। কামার তৈরী করল একটি মাছ আর তাঁতি তৈরী করল একটি কাগজের শঙ্খচিল। তারপর তারা রাজদরবারে এসে বলল–মহারাজ, আমরা আমাদের তৈরী জিনিস এনেছি। এবার বিচার করুন।

রাজা কামারকে বললেন–ও কামার ভাই, তুমি কি এনেছ ? দেখাও।

কামার বলল–মহারাজ, আমি মাছ তৈরী করে এনেছি।

এই বলে তৈরী মাছটি জলে ছেড়ে দিতেই মাছটি ফরফর করে জলে ঘুরতে লাগল। রাজা বললেন–বাহবা। বেশ হয়েছে !

এবার রাজা তাঁতিকে বললেন–ওহে তাঁতি ভাই, তুমি কি তৈরী করেছ ? দেখাও। তাঁতি বলল–মহারাজ আমি কাগজের শঙ্খচিল তৈরী করে এনেছি। এই বলে সে শঙ্খচিলটি উড়িয়ে দিল আর সেই চিলটি ছোঁ মেরে জল থেকে কামারের মাছ নিয়ে উড়ে গেল।

রাজা তখন তাঁতিকেই বড়ে বলে ঘোষণা করলেন। এরপর দরবারের অন্যান্য কাজকর্ম সেরে কিস্কুরাজা তাঁতিকে বললেন–ওহে তাঁতিভাই, শোনো ঠিক এরকম একটা কাগজের ঘোড়া আমার জন্য তৈরী করে দাও।

তাঁতি রাজার কথায় রাজী হয়ে বাড়িতে ফিরে এল।

এক সপ্তাহ পরে তাঁতি কাগজের একটি ঘোড়া তৈরী করে রাজাকে দিয়ে এল। কিস্কুরাজের ছেলে একদিন সেই কাগজের ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বের হল আর উড়তে উড়তে বহুদূর উড়ে গেল। এদিকে দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ ছেয়ে উঠল, আর প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। ঝড়ে কিস্কু রাজকুমারকে বহুদূরে এক দেশে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ঐ দেশটা ছিল মুরমুদের। মুরমু রাজবাড়ির পাশেই ফুলের বাগানে থাকত মালিনী বুড়ী। সেই বাগানের একটা গাছে রাজকুমার ও ঘোড়া আটকে গেল।

পরের দিন সকালে মুরমুদের রাজকুমারী বাগানে গিয়ে দেখে যে, বাগান ভরে আলো করে ফুল ফুটেছে। রাজকুমারী তাই মালিনী বুড়ীকে ডেকে বলল– 'ওগো মালিনী মাসী, তোমার বাগানে তো প্রচুর ফুল ফুটেছে। মালা গেঁথে আজ রাজবাড়ীতে দিয়ে আসবে।'

মালিনী বুড়ী ফুল তুলতে গিয়ে সেই ঘোড়া আর রাজকুমারকে দেখতে পেল এবং তাদের বাড়ীতে নিয়ে এল।

রাজকুমার মালিনী বুড়ীর ছাগল চরায় আর বাগানের কাজকর্মও করে। মাঝে মাঝে মালিনী বুড়ীকে মালা গাঁথতে সাহায্য করে। কিন্তু একা একা তার ভাল লাগে না, তাই সে দুটি কাক, দুটি ময়ূর ও দুটি ময়না পাখি পুষল।

একদিন মালিনী বুড়ীর জ্বর হওয়াতে কিস্কু রাজকুমারই মালা গেঁথে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল। রাজকুমারী সেই মালা দেখে তো ভারী খুসী। কিস্কু রাজকুমারকেও তার ভারী ভাল লাগল, কিছুতেই আর বাড়ি যেতে দেয় না। সেদিন কোনরকমে রাজকুমারীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজকুমার তো বাড়ী এল। পরের দিনও তাই। এভাবে কয়েকদিন আসা-যাওয়াতে দু'জনই দু'জনকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলল। রাজকুমার যেন রাত্রেও রাজবাড়ীতে আসে, সেই প্রতিশ্রুতি রাজকুমারী কিস্কু রাজকুমারের কাছ থেকে আদায় করল। তারপর থেকে মালিনী বুড়ীর সহায়তায় গোপনে রাজকুমার প্রতিদিন রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে ময়ূরের পিঠে চেপে রাজকুমারীর কাছে আসতে লাগল। কয়েক মাস পরে স্পষ্টই রাজকুমারীর শারীরিক পরিবর্তন দেখা গলে। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এসে পড়েছে। বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী তিনটি চরিত্রই বিদ্যমান। মুরমু রাজার সন্দেহ হল যে, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ রাত্রে রাজবাড়ীতে আসছে। তাই তিনি রাত্রে রাজবাড়ীতে কাঁটার জাল পাতবার জন্য প্রহরীদের হুকুম দিলেন।

রাজকুমারী এ কথা জানতে পেরে সেদিন কিস্কু রাজকুমারকে রাত্রে রাজবাড়ীতে আসতে মানা করল। কিন্তু রাজকুমার বলল যে, সে কোন বাধাবিঘ্নকে আর ভয় পায় না, সে আসবেই, যেমন করে হোক নিশ্চিত আসবে।

রাত্রে রাজকুমার ময়ূরের পিঠে চেপে রাজবাড়ী এল এবং রাজবাড়ীর উঠানে নামার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার জালে ধরা পড়ল। ভোরে রাজকুমারের পোষা পাখিরা দেখল যে, তাদের মনিব ফিরে আসেনি। কাক তখনই মনিবের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল এবং রাজবাড়ীতে এসে দেখল যে, মনিব কাঁটা জালে আটকে পড়ে আছে। কাক সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ফিরে সবাইকে খবর দিল।

সকালবেলা মুরমু রাজা ও প্রহরীরা সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে যে মালিনী বুড়ীর রাখাল ছেলেটি জালে ধরা পড়েছে। এদিকে রাজকুমারের পোষা পাখিরাও সেখানে হাজির আর মনিবকে কাঁটা জালে আবদ্ধ দেখে তার কাছে উড়ে গেল এবং এক-এক করে জালের কাঁটা ছাড়াতে লাগল। কিস্কু রাজকুমার সামান্য মুক্ত হতেই কাক ও ময়নাকে ওষুধ আনতে পাঠাল। কাক গেল যে গাছে সবুজ রঙের ফুল হয় সে গাছের ছাল আনতে আর ময়না গেল সীতানালার জল আনতে।

কাক ও ময়না ওষুধ ও জল নিয়ে এল। রাজকুমার সেই ওষুধ ও জল খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ময়ূরের পিঠে চেপে মালিনী বুড়ীর বাড়ীতে চলে এল। তার পোষা পাখিরাও সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফিরে গেল।

এ ঘটনা ঘটার পরই রাজকন্যা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। রাজা আর কি করবেন ! তিনি মালিনী বুড়ীর বাড়ী থেকে রাখাল ছেলেটিকে ধরে আনার জন্য সিপাহীদের হুকুম দিলেন। কিন্তু কিস্কু রাজকুমার এল না, আর কেউ তাকে আসতেও দিল না। তখন মুরমু রাজা নিজেই মালিনী বুড়ীর বাড়ীতে গেলেন। কিস্কু রাজকুমার রাজাকে বলল–'রাজমশায়, কি জন্য আমি রাজপ্রাসাদে যাব ? আমাকে তো আপনি এখনও জামাই করতে চাননি।'

রাজা তখন বললেন–'তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমার কোন ক্ষতি হবে না, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।'

এই বলে রাজা তাকে জোর করে রাজবাড়ীতে এনে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পরে তাদের একটি ছেলে হল। তখন সেই কাগজের ঘোড়া রাজকুমারকে বলল–'তুমি এখানে একা এসেছিলে, তারপর এক থেকে দু'জন হলে। এখন তোমরা তিনজন। আবার যা দেখছি চারজন হতেও বেশি দেরী নেই। আমি এখন তোমাদের তিনজনকে দেশে নিয়ে যেতে পারব, কিন্তু চারজন হলে আর নিয়ে যেতে পারব না।'

তখন রাজপুত্র, রাজকন্যা তাদের শিশু পুত্রকে নিয়ে সেই কাগজের ঘোড়ায় চেপে দেশে ফিরতে লাগল। পথে একটা বড় নদী পার হবার সময়ে রাজকন্যার পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা শুরু হল। বড় চিন্তায় পড়ল রাজকুমার। কি করবে ? তাড়াতাড়ি মাঝনদীতে একটা উঁচু ঢিবি দেখে সেখানেই ঘোড়াকে নামাল এবং একটা গাছের নীচে রাজকন্যা ও পুত্রকে রেখে কাছাকাছি একটা গ্রামে আগুন আর ওষুধ খুঁজতে গেল। সেই অবসর রাজকন্যা আর একটি পুত্রের জন্ম দিল। পথের মধ্যে তারা চারজন হয়ে গেল।

ওদিকে, রাজপুত্র ঘুঁটেতে আগুন নিয়ে আসার সময়ে বাতাস লেগে ঘুঁটের আগুন জ্বলে উঠল আর কাগজের ঘোড়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাজকুমার নিদারুণ মুস্কুলে পড়ল, তার আর স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে আসা সম্ভব হল না। কি করে সে সেই অগম্য স্থানে ফিরবে ?

তিন-চার দিন অপেক্ষা করার পর রাজকন্যা বড় ছেলেকে বলল–বাবা, তোমার বাবা আজও ফিরল না, নিশ্চয় কোন কিছু ঘটেছে। এখানে এমনভাবে আর কতদিন আমরা থাকব ? ঐ একটা জাহাজ আসছে, চল, ঐ জাহাজে করে আমরা লোকালয়ে দিকে যাই।

ছেলে জাহাজের লোকদের ডাকলে পর তার এল, কিন্তু তারা মোটেই ভাল লোক ছিল না। তারা রাজকন্যাকে জাহাজে তুলেই জাহাজ ছেড়ে দিল। ছেলে দুটি সেখানেই একলা পড়ে থাকল। রাজকন্যা বুঝতে পারল যে, তার রূপ দেখেই জাহাজের লোকরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাই সে ভগবানের কাছে একমনে প্রার্থনা জানাতে লাগল যেন তার চেহারা অবিলম্বে কুৎসিত হয়ে যায়। ভগবান তার প্রার্থমা শুনলেন এবং তাই হল। রাজকন্যার চেহারা কুৎসিত হয়ে গেল। এ যেন বৎসরাজ-চিন্তার সেই গল্প।

এদিকে এক গোয়ালার গাই প্রতিদিন গাছতলায় এসে ছেলে দুটিকে দুধ খাইয়ে যায়। গোয়ালা একদিন তা দেখে তাদের বাড়ীতে নিয়ে এল। গোয়ালার কোন ছেলেপিলে ছিল না, ছেলে দুটিকেই তাই নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগল। ছেলে দুটি বেশ বড় হল।

একদিন রাতে দু'ভাই গল্প করার সময় বড় ভাই ছোট ভাইকে বলছিল–আমরা আসলে গোয়ালার ছেলে নই। মাকে জাহাজের লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে, আর বাবা আগুন আনতে সেই যে গিয়েছে আর ফিরে আসেনি। গোয়ালা বুড়ী একথা শুনে সোরগোল শুরু করে দিল। গোলমাল শুনে লোকজন আসতে না আসতেই দু'ভাই পালিয়ে গেল। আর এমনই দৈবের খেলা যে, মা যে জাহাজে আছে, সেখানেই তারা আশ্রয় নিল।

দু'ভাই যে জাহাজে উঠল সে জাহাজে তাদের মা চাকরাণীর কাজ করে, আবার তাদের বাবাও ঐ জাহাজে কাজ করে। কিন্তু তাদের মা-বাবা কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

একদিন সেই জাহাজেই বড় ভাই আবার ছোট ভাইকে পুরানো ঘটনার বাকি অংশটুকু বলছিল। সে সময়ে তাদের মা-বাবা দু'জনেই আড়াল থেকে তাদের গল্প শুনতে পেল। দু'ভাইয়ের গল্প শুনে মা-বাবার মন ছেলেদের ফিরে পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

মুরমু রাজকন্যা আবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল যেন সে তার পুরানো রূপ ফিরে পায়। ভগবান তার কথা শুনলেন, সে তাঁর পুরানো রূপ ফিরে পেল। তখন সকলে সকলে চিনতে পারল।

সাঁওতালী লোকগল্পটিতে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত। মালিনীর আবির্ভাব, বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন অভিসার, বিদ্যার গর্ভসঞ্চার–এগুলি যেন ভারতচন্দ্রের গল্পের প্রতিধ্বনি। নিশ্চিত সে সময়ে এই ধরনের গল্প আদিবাসী সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। মহান সাহিত্যের সঙ্গে আদিবাসী লোককাহিনীর এই ধরনের একাত্মতা দুই সমাজের মধ্যেকার আটুট বন্ধনেরই ইঙ্গিত করছে। নিহিত আছে আদি সাহিত্যের মধ্যে চিরন্তন সাহিত্য, মহান সাহিত্য।

দ্বিতীয় রূপকথা

এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার ধন-দৌলত, লোক-লস্কর কোন কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু সন্তানের। তাই রাজার মনে শান্তি নেই। সন্তানের জন্য রাজা একে একে সাত-সাতটি বিয়ে করল, কিন্তু কোন রাণীরই সন্তান হল না। এজন্য রাজকার্যেও রাজার মন বসত না, সব সময়েই গালে হাত দিয়ে বসে থাকত। রাজার দুঃখে প্রজারাও সমান দুঃখী। তারাও চিন্তা করত রাজার জন্য। রাজার ছিল এক জোড়া পোষা টিয়ে পাখি। পোষা পাখি দুটোকে রাজা খুবই ভালবাসতেন। একদিন প্রজারা এসে রাজাকে বলল, "রাজামশায়, আপনার পাখি দুটোকে যদি বিয়ে দিতে পারেন তাহলে হয়তো আপনার সন্তান হবে।"

রাজা প্রজাদের খুবই ভালবাসতেন, তাদের মনের খবর রাখতেন, প্রজারা যে তাঁর মঙ্গল চায় তা তিনি জানতেন। তাই প্রজাদের কথায় আপত্তি করলেন না।

শুধু বললেন, "পাখিদের মত নিয়ে দেখ, তারা রাজী হলে তাদের বিয়ে হবে, আর রাজী না হলে বিয়ে হবে না। বিয়ে হলে তাদের যদি সন্তান হয়, আমার নিশ্চিত হবে।"

প্রাজারা রাজার কথামত পাখিদের মতামত জানতে চাইলো। কিন্তু পুরুষ পাখি আর নারী পাখি কেউই বিয়ে করতে রাজী হল না। প্রজারা তার কারণ জানতে চাইল তাদের কাছে। নারী পাখিটা তখন তাদের কাছে একটা গল্প বলল। গল্পটা হল ঃ

এক জঙ্গলে ছিল এক রাক্ষস। দেশ-বিদেশ থেকে সে মানুষ ধরে এনে খেত। একবার এক রাজকন্যাকে সে ধরে আনল খাওয়ার জন্য। কিন্তু রাজকন্যার রূপে রাক্ষস নিজেই মুগ্ধ হল। তাই রাজকন্যাকে না খেয়ে নিজের সেবা-যত্নের জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখল। রাজকন্যা রাক্ষসপুরীতে বন্দী হয়ে থাকল। আর রাক্ষস তাকে আদর যত্ন করে ঘরে রেখে দিল।

একবার রাক্ষস মানুষ শিকারের জন্য গেল বহু দূরে। ছ'মাসের আগে ফিরবে না। এই সময় জনৈক রাজপুত্র সেই জঙ্গলে শিকার করতে এসে পথ ভুলে রাক্ষসপুরীতে ঢুকে পড়ল। রাক্ষসপুরীতে বিরাট বড় বড় দালান। অসংখ্য ঘর, কোন সাড়াশব্দ নেই। রাজপুত্র এ ঘর সে ঘর করতে করতে শেষে গেল রাজকন্যার ঘরে। রাজকন্যা একা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

রাজকন্যা তো মানুষ দেখেই অবাক ! সে রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় তোমার বাড়ী, কি তোমার নাম, কেমন করেই বা তুমি এখানে এলে?"

রাজপুত্র একে একে রাজকন্যার সব প্রশ্নের উত্তর দিল। সে যে এক রাজপুত্র তাও খুলে বলল।

রাজকন্যা তখন রাজপুত্রকে বল, "এটা রাক্ষসপুরী, এখানে কোন মানুষ থাকতে পারে না। আমি এক রাজকন্যা, রাক্ষস আমাকে খাওয়ার জন্য ধরে এনেছিল, কিন্তু কি মনে করে সে আমাকে খায় নি। পরিবর্তে তার সেবাযত্নের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। তুমি যদি বাঁচতে চাও তো এখনই এখান থেকে পালাও।"

রাজকন্যার কথা শুনে রাজপুত্র ভয় পেল না। সে রাজকন্যাকে বলল— "আমি একা ফিরে যাব না, আমি তোমাকেও আমার দেশে নিয়ে যাব আর তোমাকে বিয়ে করব।"

রাজপুত্রের কথা শুনে রাজকন্যা মনে মনে খুশী হলেও তা প্রকাশ করল না। সে রাজপুত্রের সবরকম সেবা-যত্ন করল। আর যখন দেখল যে, রাক্ষসের ফিরে আসবার সময় হয়েছে তখন রাজপুত্রকে এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখল।

রাক্ষস তার পুরীতে ঢুকেই রাজকন্যাকে বলল, "হাঁউমাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাচ্ছি কেন ? তোমার ঘরে কি কোন মানুষ এসেছে ?"

রাজকন্যা বলল, "এই পুরীতে মানুষ আসবে কেমন করে ? আমার শরীর থেকেই মাঝে মাঝে মানুষের গন্ধ বের হয়। হয়তো ঐ গন্ধই পাচ্ছ।"

রাক্ষস রাজকন্যার কথা বিশ্বাস করে আর কিছু বলল না। পরদিন আবার রাক্ষস মানুষ খাওয়ার জন্য পুরীর বাইরে বেরিয়ে গেল। এই সুযোগে রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে দেশের দিকে পালাতে লাগল।

সন্ধ্যেবেলা রাক্ষস ফিরে এল পুরীতে আর দেখল তার রাক্ষসপুরী শূন্য। রাক্ষস বুঝল যে, রাজকন্যা পালিয়েছে। সে তখনই রাজকন্যাকে ধরার জন্য ছুটতে লাগল। রাজকন্যা আর রাজপুত্র ততক্ষণে ছয় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাত সমুদ্রে পড়েছে মাত্র। রাক্ষসও জোরে ধাওয়া করে আসছে। প্রায় রাজপুত্রের কাছে এসে পড়েছে। রাজপুত্র তখন নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য রাজকন্যাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিল। রাজকন্যা মারা গেল।

পক্ষিণী এবার গল্প শেষ করে বলল, "দেখলে, রাজকন্যা রাজপুত্রের উপকার করল, কিন্তু বিপদ দেখে রাজপুত্র রাজকন্যাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। পুরুষ জাতটা এমনই বিশ্বাসঘাতক। তাই পুরুষকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।"

এরপর গল্প শুরু করল পুরুষ পাখিটা। সে বলতে লাগল–এক দেশে এক রাজা। রাজার ছিল শুধু একটি মাত্র রাণী। রাজা ও রাণীর মধ্যে খুব ভাব। একদিন তারা দু'জনই প্রতিজ্ঞা করল যে, তাদের কেউ আগে মারা গেলে অন্যজন জীবনে আর বিয়ে করবে না।

কিছুদিন পর রাণী তার বাবার বাড়ীতে গিয়ে অসুখ পড়ল আর সেখানেই মারা গেল। রাজার কাছে খবর এল। রাজা এখবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ী গেলেন। রাজা রাণীর মৃতদেহ তার দেশে আনার জন্য একটি কাঠের বাক্স তৈরী করালেন এবং রাণীর মৃতদেহ বাক্সে ভরে দেশের দিকে রওয়ানা হলেন।

কিছুদূর আসার পর রাজা ক্লান্ত হয়ে এক গাছের নীচে বসলেন একটু বিশ্রাম করার জন্য। রাণীর মৃত্যুতে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। সে সময় ঐ পথ দিয়ে এক দেবতা যাচ্ছিলেন। রাজাকে দেখে তাঁর দয়া হল। তিনি রাজাকে বললেন, "তোমার আয়ু আছে চল্লিশ বছর। তার থেকে বিশ বছর যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে দিতে রাজী থাক, তবে তাকে আমি নতুন জীবন দিতে পারি।"

রাজা তখন রাণীর জন্য নিজের বিশ বছর আয়ু ছেড়ে দিতে রাজী হল।

দেবতা তখন রাজাকে বললেন, "তোমার কাঁধে যে গামছা আছে তা দিয়ে রাণীর মুখ ঢেকে দাও আর ভাত রান্না করে রাণীকে খাওয়ার জন্য ডাক দাও।"

এই বলে দেবতা সেখান থেকে চলে গেলেন।রাজা কাঁধের গামছা দিয়ে রাণীর মুখ ঢেকে দিল। তারপর ভাত রান্না করে খাওয়ার জন্য রাণীকে ডাকল।রাজার ডাক শুনে রাণী উঠে বসল। রাণীকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে রাজা যেমন খুশী হল, রাজাকে পেয়ে রাণীও তেমনি খুশী হল। দু'জনের ভালবাসারই যেন জয় হল।

তখন তারা রাজবাড়ীর দিকে চলল। বহুদূর আসার পর তারা এক নদীর ধারে এল। এক গাছের নীচে তারা বিশ্রামের জন্য বসল। নিদারুণ ক্লান্ত। রাজা রাণীকে বলল, "আমি ভীষণ ক্লান্ত, তুমি একটু বস, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।"

এই বলে রাজা ঘুমিয়ে পড়ল।

সে সময় নদীর ঘাটে এক সওদারের নৌকা এসে ভিড়লো। রাণীর রূপ দেখে তো সদাগর পাগল। সওদাগর মিষ্টি মিষ্টি কথা আর দামী দামী জিনিস দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই রাণীর মন জয় করে ফেলল। এরপর রাণী রাজাকে ফেলে সওদাগরের নৌকায় উঠে পড়ল। সওদাগরও নৌকা ছেড়ে দিল। রাজা সেইখানেই পড়ে রইল।

রাজা ঘুম থেকে উঠে রাণীকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় পাবে রাণীকে ? রাজা তখন নদীর ধারে ধারে রাণীকে খুঁজতে খুঁজতে চলল। কিছুদূর যাবার পর সওদাগরের নৌকায় রাণীকে দেখতে পেল। রাজাও সওদাগরের নৌকার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। সাত দিন সাত রাত যাওয়ার পর নৌকা সওদাগরের ঘাটে এসে ভিড়লো। রাণী নৌকা থেকে নেমে সওদাগরের হাত ধরে তার বাড়ীতে প্রবেশ করল অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত না করে।

এদিকে রাজা রাণীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভিখারীর বেশ ধারণ করল। ভিখারী সওদাগরের বাড়ীর দরজায় এসে ভিক্ষা চাইল। রাণী ভিক্ষা দেওয়ার জন্য বাইরে এল। রাজা তো ভিক্ষা চায় না, চায় রাণীকে। রাজা রাণীর হাত চেপে ধরে বলল—আমি তোমাকে নিজের আয়ু দান করে বাঁচিয়ে তুলেছি। তুমি কি করে আমাকে পরিত্যাগ করলে ? এই কি তোমার ব্যবহার ? চলো, অনেক হয়েছে, আমার রাজ্যে ফিরে চলো।

রাণী রাজার কথায় সাড়া তো দিলই না, বরং সে যে তার স্ত্রী নয় আসলে সওদাগরের স্ত্রী এই বলে রাজার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল। সেই সময়ই সওদাগর সেখানে এল এবং রাজা রাণীর হাত ধরে টানাটানি করছে দেখে রাজার মাথায় লাঠি মারল। লাঠির ঘায়ে রাজা মারা গেল।

গল্প শেষ করে পুরুষ পাখিটা বলল, "নারী জাতিকে বিশ্বাস করতে নেই, তারা যখন যার, তখন তার।"

প্রজারা দুই পাখির গল্প শোনার পর রাজার স্বার্থে তাদের বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করল। পাখিরাও জানত রাজা তাদের খুব ভালবাসে। তাই তারা বিয়েতে রাজী হল। মহা ধূমপানের সঙ্গে রাজা পাখিদের বিয়ে দিলেন।

এ গল্পটি শিশুদের জন্যে রচিত কোন রূপকথা নয় ! গল্প বলার ধরন, এক গল্প থেকে অন্য গল্পে অনায়াসে গমন, গূঢ় মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ সবই আরব্য উপন্যাসের গল্প থেকে নেওয়া। তবে আরব্য রজনীর একটি মাত্র গল্প নয়–বহু গল্পের আপাত ছায়া এতে পড়েছে। সাঁওতাল আদিবাসী সমাজে নিশ্চিত আরব্য উপন্যাসের কোন প্রভাব থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু মানবসমাজ তো সর্বত্রই এক ও অক্ষুণ্ণ–তাই সাঁওতাল সমাজও সেই একই মানবিক কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল। হয়তো আরব সওদাগররাই এ গল্প নিজেদের দেশে সযত্নে নিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, আদিবাসী সমাজের অবিকল প্রতিচ্ছবি যদি এতে পড়ে থাকে তবে বলতে হবে বিশ্ব সাহিত্যের আধুনিক যুগের সঙ্গে তাঁদের কথা-সাহিত্যের মাধ্যমে দৃঢ়বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল বহুকাল আগে।

লোকগীতি

মৌখিক সাঁওতালী সাহিত্যের আর এক অপূর্ব নিদর্শন তাদের মুখে প্রচলিত লোকগীতি। কালের করাল গ্রাস উপেক্ষা করে আজও এসব লোকগীতি সমানে তাদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়ে আসছে। সহজ, সরল এ সব লোকগীতিই সাঁওতাল সমাজের অমূল্য সম্পদ। যুগ যুগ ধরে তারা লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অনাদৃত, বঞ্চিত। এ দেশের আদিবাসিন্দা হয়েও সব হারিয়ে তারা নিঃস্ব হয়েছে, কিন্তু সুর সংযোজিত এ সব অন্তরগ্লানি হৃদয়বাণী তারা আজও হারায়নি, বরং সযত্নে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। কারণ, এগুলিই তাদের সামগ্রিক সামাজিক পরিণতির ফলশ্রুতি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সাঁওতাল সমাজের অসংখ্য লোকগীতি। এ সব লোকগীতির ভাব যেমন গভীর, ছন্দও তেমনি সাবলীল এবং অর্থও ব্যঞ্জনাময়। আবহমান কাল ধরে এগুলি তাদের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে আসছে। লোকসাহিত্যে এমন নিখুঁত দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এসব গানের বাণীও ত্রুটিহীন অক্ষতই আছে, অক্ষুণ্ণ রেখেছে ক্রমান্বয়ে তাদের সেই সুপ্রাচীন ধারা।

সাঁওতালী লোকগীতি মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়–ধর্মীয়, সামাজিক এবং প্রেম সম্পর্কিত। সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা, দেবতা অপদেবতার পূজা-অনুষ্ঠান, রোগ-ব্যাধি নিবারণ, মৃত আত্মার আবাহন ইত্যাদি কেন্দ্রিক লোকগীতিসমূহ ধর্মীয় পর্যায়ের পূজা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) এবং জন্মোৎসব, বিবাহ, অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসব ইত্যাদি সামাজিক গান আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের। প্রেম সম্পর্কিত লোকগীতিতে নরনারীর মনের গভীরতম প্রকাশের আর্তিই ব্যক্ত হতে দেখা যায়। তাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রেম পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এখানে কিছু লোকগীতি তুলে ধরা হল ঃ

ধর্মীয় লোকগীতি

সাঁওতালী লোকগীতির একটা বড় অংশ ভরে আছে ধর্মীয় লোকগীতিতে। ধর্মীয় লোকগীতিতে আছে নানা দেব-দেবীর প্রশংসা এবং সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা। যেমন–

তকয় দরে সেটেরেনায় তি রে কাঁপি*আতে ?
তি রে কাঁপিআতে মানা সাক্ওয়া অরং আতে।
মারাং দেওয়ায় সেটেরেনা তি রে কাঁপিআতে,
তি রে কাঁপি আতে মানা সাক্ওয়া অরং আতে।
মাঃ মাগে মাগায় বাড়িজাঃ এ মাগায়,
অরং অরং অরংআয় সাক্ওয়া হাতে অরংআয়।

ভাবার্থ–

হাতে কাঁপি এবং শিঙ্গাধ্বনি দিতে দিতে কে এল ? প্রধান দেবতা হাতে কাঁপি এবং শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে এলেন। তিনি সমস্ত কিছু কাটাকাটি করে পরিষ্কার করেন এবং শৃঙ্গধ্বনি দেন।

* কাঁপি–এক ধরনের কুঠার

আবার–

তকয় দরে সেটেরেনায় তি রে জনঃ আতে ?
তি রে জনঃ আতে মানা দাউড়া দিপিলাতে।
জাহের এরা সেটেরেনায় তি রে জনঃ আতে,
তি রে জনঃ আতে মা না দাউড়া দিপিলাতে।
জঃ জঃ এ জগায় বাড়িজাঃ এ জগায়
দিপিল দিপিল দিপিলায় বোগেয়াঃ এ দিপিলা।

অর্থাৎ–

হাতে ঝাড়ু এবং মাথায় ডালা নিয়ে কে হাজির হল ? ওগো জাহের এরা হাতে ঝাড়ু এবং মাথায় ডালা নিয়ে হাজির হলেন। তিনি সমস্ত আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেন এবং ভাল কিছু ডালায় করে মাথায় নেন।

আবার–

তকয় দরে সেটেরেনায় তি রে আঃ সার আতে ?
তি রে আঃ সার আতে মা না আঃ রে ঘাণ্টি আতে।
লিটা গঁসায় সেটেরেনায় তি রে আঃ সার আতে।
তি রে আঃ সার আতে মা না আঃ রে ঘাণ্টি আতে।
টেরা টেরাং টেরাকেৎ সিন্দুর সারে টেরাকেৎ,
লাড়াও লাড়াও লাড়াওকেৎ আঃ রে ঘাণ্টি লাড়াওকেৎ।

ভাবার্থ–

হাতে তীর-ধনুক এবং ধনুকে ঘণ্টি বেঁধে কে হাজির হল ? ওগো, লিটা গঁসায় হাতে তীর-ধনুক এবং ধনুকে ঘণ্টি বেঁধে হাজির হলেন। তিনি ধনুকে সিঁদুর মাখানো তীর লাগিয়ে তাক করছেন এবং ধনুকের ছোট ঘণ্টাটি নাড়া দিচ্ছেন।

আবার–

তকয় দরে সেটেরেনায় বার্ছি হাপা আতে ?
বার্ছি হাপা* আতে মানা অতে কটাব আতে।
ধরম গুরু সেটেরেনায় বার্ছি হাপা আতে।
বার্ছি হাপা আতে মানা অতে কটাব আতে।
কটাব কটাব কটাবায় নতে অতে কটাবায়,
উদুঃ উদুঃ উদুগায় বার্ছি হাপা সিদুরায়।

---

* বার্ছি হাপা–ধরম গুরুর ন্যায়দণ্ড

অর্থাৎ–

হাতে বার্‌ছি লাঠি নিয়ে কে এল ? বার্‌ছি লাঠি নিয়ে পা টিপে কে এল ? ধরম গুরু বারছি লাঠি নিয়ে পৌছলেন, ধরম গুরু পা টিপে টিপে এলেন। এক একবার তিনি পা টিপে টিপে হাঁটেন এবং সে সঙ্গে সঙ্গে বার্‌ছি লাঠি দেখান্।

সাকরাত উৎসবের সময় দেবদেবীর উদ্দেশ্যে একটা অবিস্মরণীয় সাঁওতালী গান শোনা যায়, তা হল ঃ

'কুলহি কুলহিতে দ তকয় দারাকান
বাড়্গে বাড়্গেতে দ তকয় দারাকান ?
কুলহি কুলহিতে দ মারাং বুরুয় দারাকান
বাড়্গে বাড়্গেতে দ জাহের এরায় দারাকান।
তি রেতায় নায়ো গ মুতকী মুতীক্
তারেন রেতায় নায়ো গ নারাঃ গামছা
বহঃ রেতায় নায়ো গ জাটা টুইলা।
নীয়ুরেলেরে নায়ো গ জাহের নেরা
সতঃ লেরে নায়ো গ জাহের নেরা।
তি রেতায় নায়ো গ সনা শাংকা
হটঃ রেতায় নায়ো গ মালা মীন্দীলি
সুৎ রেতায় নায়ো গ জবা বাহা।'

অর্থাৎ–মাগো, গ্রামের রাস্তা দিয়ে কে আসে ? মাগো, ক্ষেতখোলার ভিতর দিয়ে কে আসে ? গ্রামের রাস্তা দিয়ে আসে মারাং বুরু, ক্ষেতখোলার ভিতর দিয়ে আসে জাহের এরা। মাগো, মারাং বুরুর হাতে বড় লাঠি, কাঁধে আছে লালা গামছা, মাথায় বড় বড় জটা। মাগো জাহের এরা আমাদের পথ দেখায় ; মাগো, জাহের এরা আমাদের সঙ্গ দেয়। মাগো, জাহের এরার হাতে সোনার শাঁখা, গলায় মালার মাদুলী, মাগো খোঁপায় তার জবা ফুল।

এবার 'বাহা' উৎসবের কয়েকটি গানের উল্লেখ করব। এই আবাহনী গানগুলি অন্য ধরণের–

তকয় মেদয় জাহেরা জা গঁসায় ধিরিঘুটু জাহেরা ?
তকয় মেদয় জাহেরা জা গঁসায় সীরি সারজম জাহেরা ?
মারাং বুরুয় জাহেরা জা গঁসায় ধিরিঘুটু জাহেরা,
জাহের এরায় জাহেরা জা গঁসায় সীরি সারজম জাহেরা।

মঁড়েকো কো জাহেরা জা গঁসায় ধিরিঘুটু জাহেরা,
তুরুই কো কো জাহেরা জা গঁসায় সাঁরি সারজম জাহেরা।'

অর্থাৎ–

পাথুরে জমিতে কে 'জাহের' তৈরী করবে ? কে সত্য শালকুঞ্জ তৈরি করবে? মারাং বুরু পাথুরে জমিতে জাহের তৈরি করবেন, জাহের এরা সত্য শালকুঞ্জে পরিণত করবেন। 'মঁড়েকো'রা পাথুরে জমিতে জাহের নির্মাণ করবেন, 'তুরুইকো'রা সত্য শালকুঞ্জের জাহের প্রতিষ্ঠা করবেন।

আবার–

'তকয় মায় সাব্‌কেৎ হো সামানম কাপি ?
তকয় মায় হবরকেৎ হো রাঁগাইনি মা তড়া ?
মারাং বুরুয় সাব্‌কেৎ হো সামানম কাঁপি,
জাহের এরায় হবরকেৎ হো রাঁগাইনি মা তড়া।
সাব্ তেহঁয় সাব্‌কেৎ হো সামানম কাঁপি,
হবর তেহঁয় হবরকেৎ হো রাঁগাইনি মা তড়া।
কাঁপি কাঁপি মাঁয়ামেন হো সামানম কাঁপি,
তড়া তড়া গিরুয়েন রাঁগাইনি মা তড়া।'

অর্থাৎ–

কে সোনার কুঠার হাতে নিল রাঁগাইনি মালার ডালি কে নিল ?

মারাং বুরু সোনার কুঠারে হাতে নিলেন, জাহের এরা রাঁগাইনি মালার ডালি কাঁধে নিলেন। সোনার কুঠার রক্তিম বর্ণ এবং রাঁগাইনি মালা গৈরিক বর্ণ ধারণ করেছে। পূজার সময় সবাই গান গায়–

মঁড়েকো দ মঁড়ে বয়হা–
তুরুই কো দ তুরুই বয়হা
জারগে দাঃ মা হালায় হালায়
সিতী নালা পোরোই পোরোই
চেতে তেকো গুগুরিজা ?
চেতেতেকো লামাগা ?
তওয়া তেকো গুগুরিজা
দাহে তেকো লামাগা।

নে তাপে সুনুম সিন্দুর
নে তাপে নায়নম রড়া,
আতাঙ তাপে সুনুম সিন্দুর
তেলায় তাপে নায়নম রড়া।

অর্থাৎ–

মঁড়েকো-রা পাঁচ ভাই, তুরুইকো-রা ছয় ভাই। ঝমঝম ঝড়বৃষ্টিতে সিতৗনালা আচ্ছন্ন। কি দিয়ে গোবর দেবে ? কি দিয়ে নিকাবে ? দুধ দিয়ে ছড়া দিবে, দই দিয়ে নিকাবে। এই নাও তোমাদের তেল সিঁন্দুর, এই নাও তোমাদের কাজললতা; তোমাদের তেল সিঁন্দুর গ্রহণ কর, তোমরা কাজললতায় তেল মাখাও।

এবার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে দু'একটা গানের উল্লেখ করি। জন্মের পর আদি পিতা-মাতা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির দুঃখ-দুর্দ্দশার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে তারা গান রচনা করেছিলেন–

হায় হায় ! জালাপুরিরে
হায় হায় ! নুকিন মানওয়া
হায় হায় ! বুঁসাড় আকানকিন
হায় হায় ! নুকিন মান্‌ওয়া
হায় হায় ! তকারে দহকিন ?
হায় হায় ! দো সে লীইয়ায়বেন
হায় হায় ! মারাং ঠাকুর জীউ
হায় হায় ! বুঁসাড় আকান কিন
হায় হায় ! নুকিন মান্‌ওয়া
হায় হায় ! তকারে দহকিন ?

অর্থাৎ–

হায় হায় ! এই মহাসমুদ্রে দুটি মানব শিশু জন্ম নিয়েছে। হায় হায় ! দুটি মানব শিশু। হায় হায় ! কোথা তাদের রাখা হবে !

হায় হায় ! বলে দাও মহান ঠাকুর। হায় হায় ! দুটি মানব শিশু জন্মেছে। হায় হায় ! মানব শিশু দুটিকে কোথায় রাখা হবে ?

আর একটি গান–

অত্ জানামলেন, ধুবি ঘাঁস জানামলেন
মানমি জানামলেন, দুক হঁ জানামলেন
কাঁসা পিতল জানামলেন, ঘুরি ফিরি জানামলেন
মানমি জানামলেন, রাঃ জং জানামলেন।

অর্থাৎ–

মাটির জন্ম হয়েছে, দুর্ঘাঘাসের জন্ম হয়েছে,
মানুষের জন্ম হয়েছে, দুঃখের জন্ম হয়েছে ;
কাঁসা পিতলের জন্ম হয়েছে, বার বার জন্ম হয়েছে,
মানুষের জন্ম হয়েছে, কান্নার জন্ম হয়েছে॥

সামাজিক পর্যায়ের লোকগীতি

জন্মোৎসব, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং ঋতু উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে রচিত গীতগুলিই সামাজিক পর্যায়ের লোকগীতি। এ পর্যায়ের লোকগীতির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং চিত্তাকর্ষক হল বিবাহ-গীতি। বর ও কনের গায়ে হলুদ মাখানো থেকে শুরু করে কনে বিদায় পর্যন্ত সাঁওতালী সমাজ বিভিন্ন গানের মাধ্যমে বর-কনের নবজীবনকে চিত্রধর্মী করে রাখে। গায়ে হলুদ সাঁওতালী সমাজের বিবাহোৎসবে একটি বিশেষ অঙ্গ।

বিয়ের আগে বর ও কনেকে তেল-হলুদ মাখানো সাঁওতাল সমাজের প্রচলিত রীতি। যে গান দিয়ে এ অনুষ্ঠান শুরু হয় সেটি হল–

আঁচুরে বিহুরে সেঙ্গেলে তিতি দ
বেডারে এ্যামেরে কুইলিগর অড়াঃ
দেলাসে কারমি হো দুড়ুবে মেতায়মে
দেলাসে কারমি হো সিদুবে মেতায়।
গাতেমগে হোয়োঃ হো দুড়ুবে মেতায়মে
সাঁগামগে হোয়োঃ হো সিদুবে মেতায়,

কুঁঞ দাঃরে ঞুরেন সনেগর শিকড়ি দ
ডাডি দাঃরে বোহেলেন রূপেগর পাঁইড়ি।
তকয় দয় হালাং কেৎ সনেগর শিকড়ি দ ?
তকয় দয় তুমীলকেৎ রূপেগর পাঁইড়ি ?

ফালনাগে হালাঙকেৎ সনেগর শিকড়ি দ
ফালনাগে তুমীলকেৎ রূপেগর পাঁইড়ি।

গাতেমগে হোয়োঃ হো দূড়ুবে মেতায়ম
সাঁগামগে হোয়োঃ হো সিদুবে মেতায়।

এমাকাতায় মেতায় মে সনেগর শিকড়ি দ
চালকাতায় মেতায় মে রূপেগড় পাঁইড়ি।

উপরোক্ত গানটিতে কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলির অর্থ পরিষ্কার নয়। তবুও সংক্ষেপে বলা যায় যে, সঙ্গী পাওয়া গেছে তাকে ডাক দিয়ে বসতে বল। সে আপনজন। কুঁয়োর জলে সোনার শিকল পড়ে গেছে, ঝরণার জলে রূপোর অলঙ্কার ভেসে গেছে। কে সেই সোনার শিকল কুড়িয়ে পেল ? কে রূপোর অলঙ্কার কুড়িয়ে আনল ? তোমরা তাকে সোনার শিকল দিতে বল, রূপোর অলঙ্কার দিয়ে দিতে বল।

গ্রামের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে বাংলাভাষী প্রতিবাসীরাও অনেক সময়ে হাজির হয়।তাই, গায়ে হলুদের গানে বাংলা কথা মেশানো থাকে যেমন-

হাতে মাখাইতে হাতে চিখন নাই
নাজানুরে তেলাইতে লীইতে
নাজানুরে না নাওয়ান যে।

পিঠে মাখাইতে পিঠে চিখন নাই
না জানুরে তেলাইতে লীইতে
না জানুরে না নাওয়ান যে।

মুখে মাখাইতে মুখে চিখন নাই
না জানুরে তেলাইতে লীইতে
না জানুরে না নাওয়ান যে।

গোড়ে মাখাইতে গোড়ে চিখন নাই
না জানুরে তেলাইতে লীইতে
না জানুরে না নাওয়ান যে।

নাকিজে নাকিজে নাকিজে দ
ন নলে সুন্দরি নাকিচ্ দ

রাঁপুৎ কিতিঞ হো কারমি।
তাড়া কিতিঞ হো কারমি
না নলে সুন্দরি নাকিচ দ।

রাঁপুৎ রেহঁ হো কারমা
তড়া রেহঁ হো কারমা
আপুঞে কিরিঞা
এগাঞে কিরিঞা
না নলে সুন্দরি নাকিচ্ দ।

নওয়া উপ্ দ লিসাঁয় লাসায়
গাঁগি চাঁওরিচ নওয়া উবেলাং
চাঁও রাহারে তাসে কাতালাং
গাঁগি চাঁওরিচ গাঁগি চাঁওরিচ
নওয়া উবেলাং।

বহঃ উপ্ নাকিচ্ নাকিচ্‌তে
নাকিচ মা রাঁপুৎএন
এগো এগো জাঁওয়ায় এঙ্গাত
নাকিচ্ কিরিঞে হড় কোলকম।

মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো এক বিশেষ স্মরণীয় মূহুর্ত। কোন মেয়েই এই স্মরণীয় মূহুর্তটুকু ভুলতে পারে না। সাঁওতাল সমাজ তাই এই স্মরণীয় মূহুর্তটি বরণীয় করে রচনা করেছে–

বাঁরিয়াত ক দুল দুল
বলয়েনাক বাঁহ্ তুতুল
সনের ডালারে বাঁহক তুলেকান
মঁড়ে বেড়হা ক আঁচুরেকান।

বেড়ায় রাকাপ্‌কান জিরি হিরি
পূর্বাৎ সাদমরে যুগের তিরি
সারজম সাকামরে কিয়াঁ সিন্দুর
লাঠা আদিঞায় আঁদুর মাদুর।

দিসম পেড়াক হারে ফারে
*'হরিবোল' কেদাক বারে বারে
উলে টাওরাঃ তিরিম রুকু আদিঞ
টিকা সিন্দুরতেম বুঁদি কিদিঞ।

অর্থাৎ–

বরযাত্রীরা কনেকে ডালায় তুলতে প্রবেশ করল, সোনার ডালাতে কনেকে তুলছে আর পাঁচবার প্রদক্ষিণ করছে।

সূর্যদেব পূর্বদিকে ঝলমল করে উঠছে, এ সময়ই এ জীবনের সঙ্গী শালপাতায় মোড়া সিঁদুর এলোপাতাড়ি লাগিয়ে দিল।

আত্মীয়স্বজন সঙ্গে সঙ্গে বার বার 'হরিবোল' ধ্বনি দিল, জীবনসঙ্গী আমপাতায় জল ছিটিয়ে দিল এবং সিঁদুরের ফোঁটায় বন্দী করল।

বিয়ের গানের মধ্যে সবচেয়ে করুণ হল বিদায়ের গান। কনে বিদায়ের সময়ে আত্মীয়স্বজন সবাই অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এ সময়ের গানগুলিই করুণ চিত্রের সাক্ষী–

সেদায় দ গো নেগেরিঞ নেগেরিঞ
চিলি হঁ বাং বাপ্লা নিদি মেয়া
হানকো গো এ্ঞেলকম
লাড় নাড়ি বাঁদো নাড়ি লেঞ বোঞ
ছাতার উমুল বালাম তাকো
মেরম লেকা ক তিয়াঃ কিদিঞ
মা গো তাহেন মে তওয়া দারে।

অর্থাৎ–

মাগো, তুমি তো বলেছিলে আমাকে কেউ বিয়ে করতে আসবে না। ঐ যে দেখা যাচ্ছে তোমার বেয়াইরা লতার মত সারি বেঁধে ছাতা মাথায় দিয়ে আসছে। তারা আমাকে ছাগলের মত দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। মাগো, তুমি সুখে থাক।

আর একটি মূল্যবান গান–

* 'হরিবোল' শবযাত্রার সময়ে যেমন দেওয়া হয়, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও তা অনায়াসে ধ্বনিত হয়।

সাঙ্গিঞ দিসম মিরু সাঙ্গিঞ নাঁইহার
জনমের যুগ মিরু গাতে আপাৎ
গুজুঃ বুরু মিরু খবর সেটেরামা
অমনামা মিরু ধুবি ঘাঁস দ।

অর্থাৎ–

মা আমার, বহুদূরে শ্বশুরালয়। জন্মের মত তোমাকে হারালাম। আমার মৃত্যু সংবাদ যখন তোমার কাছে পৌঁছবে ততদিনে আমার কবরের উপর দূর্বাঘাস জন্মে যাবে।

তবে সাঁওতালী লাগড়েঁ সুরের অধিকাংশ গানই বাংলা ভাষায় রচিত। কবে এবং কিভাবে এসব গান সাঁওতাল সমাজে স্থান পেল, তা বলা শক্ত। অনুমান হয়, বর্তমানের মত হয়তো এক সময় সাঁওতাল ও বাঙ্গালী সমাজের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করত এবং তাদের মধ্যে ভাষা-সংস্কৃতির আদানপ্রদান যথেষ্ট হয়েছিল। এ সব গান তারই প্রমাণ। সাঁওতালী পুরাণেও কলেয়ান গুরু বলেছেন ঃ

"আঁডি দিন দেকো তুলুচ্ লাঁড়হাই জাহান বাও তাঁহেকান তালেয়া। ওনকো দ টাণ্ডিরেকো তাঁহেকানা আর আলে দ বিরকোরে আর বুরুকোরে। মেনখান তায়মতে দেকোকো তুলুচ্ আঁডি লাঁড়হাই হোয়এনতালেয়া।"

অর্থাৎ–

'বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। তারা মাঠে সমতলভূমিতে বাস করত এবং আমরা বন-জঙ্গলে ও পাহাড়ে। কিন্তু পরে হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল।' এখানে এ ধরণের দুটি অতি প্রাচীন লোকগীতি তুলে ধরা হল ঃ–

(১)

নায়ো মরিলে কান্দিব ছ'মাস
বাবা মরিলে গো কান্দিব বারো মাস
তিরি মরিলে আরও তিরি পাব গো
ভাইয়া মরিলে কান্দিব জনমে জনম
ভাইয়া মরিলে হিঁজুরিব পহরে পহরে।

[নায়ো–মা, তিরি–স্বামী, হিঁজুরিব–কাঁদিব]

(২)

মায়ে তো জনম দিয়ে গেল গো,
মাই বাপের দয়া নাই, কারো দয়া নাই।
যেমন ভাই চিল শুগুন সরগে ঘুরে গো,
তেমন ভায় অন্তর কান্দে বিকলে,
আমি কান্দি নাই, মন কান্দে গো,
কান্দিতে কান্দিতে মাই গো ছাতি ভিজিল।

[শুগুন-শকুন]

এবার শিকার উৎসবের একটি গানের কয়েক লাইন উল্লেখ করেই সামাজিক পর্যায়ের লোকগীতির অংশটি শেষ করব। গানটিতে শিকার যাত্রার গোড়া থেকেই বর্ণনা আছে। মনে রাখতে হবে অন্যান্য আদিবাসীদের মতো শিকার উৎসব সাঁওতাল সমাজের এক বিশিষ্ট উৎসব।

সিঞ বির্‌ক গিরাকেদা–
সেন্দরা দ হিলি হোঞ সেনঃআ স্যে বাং ?

লাঠে বাবু জা পাঠেয় মেসে,
তির্‌য়ো বাবু জা ঠেমেদ মেসে,
আঃ সার কাঁপি দ সাব্ মেসে,
চাঁওরা-ভাঁওরা সেতা বাবু জা তিয়াঁঃকিন মে।
সেন্দরা দ দগো বাবুজা সেনঃ মেসে॥

লাঠে হিলি হোঞ পাঠেকেদা,
তির্‌য়ো হিলি হোঞ ঠেমাকেদা,
আঃ সার কাঁপি হোঞ সাব্‌কেদা,
চাঁওরা-ভাঁওরা সেতা হিলি হো বাঁনুঃকিনা
সেন্দরা ক দগো হিলি ক বাঁগিয়াদিঞ দ !

গানাড়া খন ওডোক্ মাড়াংরে
এতম-কঁয়ে তায়ম মাড়াং দকো বাবুজা গড হটকাঃ।
সেন্দরা বলন মাড়াংরে
দিহরি বাবুজা উচাড়ায় মে,
বোগে বাঁড়িচ দগো বাবুজায় এেল সোজহে॥

বাং দ বাছারে বরাত রেনাঃ
বাং দ বাছারে হড় রেয়াঃ দুসাহাতে,
বির্ দ বাছারে বাগাহিয়েন
লেলে চাঁওরা লেলে ভাঁওরা,
এতম কঁয়ে জজম কুলকিন চাঙ্কেয়াকান॥.......

অর্থাৎ—

সিঞ জঙ্গল শিকারের দিন ধার্য হল।
বৌদি গো শিকারে যাব কি আমি ?

বাবু, কোমরে গামছা জড়িয়ে নাও,
বাবু কোমরে বাঁশী গুঁজে নাও,
তীর-ধনুক কাপি* সঙ্গে নাও,
চাঁওরা-ভাঁওরা কুকুর দুটিকে সঙ্গে নাও,
বাবু তুমি শিকারে যাও॥

বৌদি গো, কোমরে গামছা জড়িয়েছি,
বৌদি গো, কোমরে বাঁশী গুঁজেছি,
তীর-ধনুক কাপিও সঙ্গে নিয়েছি,
বৌদি গো চাঁওরা-ভাঁওরা কুকুর দুটি নেই।
বৌদি গো শিকারীরা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে॥

চৌকাঠ পেরোবার পূর্বে
ডাইনে-বামে সামনে-পিছনে বাবু প্রণাম করবে,
শিকার জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে,
'দিহ্‌রি'কে সব জানাবে,
বাবু, ভাল-মন্দ তিনিই কাটিয়ে দেবেন।

বাছারে, না জানি অদৃষ্টের পরিহাস !
বাছারে, না জানি মানুষের দীর্ঘশ্বাস !
বাছারে, জঙ্গল আরও ঝোপ-ঝাড়ে ভরে গেল,
লেলে চাঁওরা লেলে ভাঁওরা,
ডাইনে বামে মানুষখেকো বাঘ ওঁৎ পেতে আছে॥.......

* 'কাঁপি'–শিকারে ব্যবহৃত ছোট কুড়াল বিশেষ।

প্রেমগীতি

সামাজিক পর্যায়ের লোকগীতির পরই প্রেমগীতির উল্লেখ করা যায়। সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন ধরনের লোকগীতির মধ্যে প্রেমগীতির আবেদনই সবচেয়ে ব্যাপক। নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে যে বেদনা-মধুর ভাবরাশি তাদের মানসলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেই ভাবরাশিই এই গানগুলির মূল উপজীব্য। এই বিধুর-মধুর ভাবরাশির মধ্য দিয়েই নরনারীর মনের গভীরতম প্রদেশের অনুভূতি সুপ্রকাশ পায়। তাই বলা যায় যে, প্রেমগীতি দুটো হৃদয়কে একীভূত করবার একমাত্র যোগসূত্র। অর্থাৎ প্রেমবন্ধনই হল প্রেমগীতি।

সাঁওতাল প্রেমগীতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি স্বল্প আয়তনের চিন্তাভাবনায় বাঙময়। আদিবাসী মানুষ মাত্রই যেমন নিজের মনের আবেগকে দীর্ঘকাল ধরে গোপন করতে পারে না, তেমনি সুদীর্ঘ করে তা বর্ণনা করাও তাদের রুচিতে যেন বাধে। তাই চিরন্তন মনের আর্তি স্বল্প কয়েকটি কথা ব্যক্ত করতেই তারা যেন বেশী আগ্রহী। যেমন–

দায়া দুলাঁড় এ্ঞেলতে,
কুলি মেগে সানাঞা,
মনের ভাবনা বাচম লাঁই
মন তিঞ্ মা চুটচুট, কড়াম তিঞ্ মা ধাকধাক
আম তুলুচ্ রড়গে চ বাচঞ দিলা॥

অর্থাৎ–

তোমার ভালবাসা গভীরতা দেখে জিজ্ঞাসা করতে স্বতই ইচ্ছা হয়। আমার মনের কথা বলতে পারছি না, আমার বুক কাঁপছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমি যেন সাহস হারিয়ে ফেলেছি। হায় হায় ! কি করেই বা প্রেমের কথা বলব ?

আর একটি গান–

আবেন দ না জুরী কুড়ি
অকা ঊাঁডি রেয়াঃ দাঃ বেন লোয়আ ?
বাবেন এ্ঞেল আকাৎ কড়া,
বালিঞ লাঁইয়াবেনা,
তিকিন সময় চালাঃবেন
ময়না ঊাঁতি রেয়াঃ দাঃ লিঞ লোয়আ॥

অর্থাৎ–

তোমরা দু'জনই তরুণী, কোন পুকুরের জল আনছ। তোমরা কি দেখ নি, তোমাদের সেকথা এখন বলব না। দুপুরের সময় তোমরা দু'জন যেও, আমরা ময়না পুকুর থেকে জল আনি।

প্রেমের জ্বালা-যন্ত্রণা সহজে ভোলা যায় না, বিষের মত তা সর্বদাই জ্বলতে থাকে। এক অবিবাহিত দেওর তাঁর বৌদিকে বলছে–

"সারু বির সাকাম হেঃচ্‌ইঞ্‌
দুকানা হিলি হো ;
হেন্দে সাংসড় বিঞ্‌ দ হিলি হো,
বিঞ্‌ দ হিলি হোয় জটেৎ আদিঞ॥

* * * *

ঝাড় তেহঁ ঝার্‌নি তেহঁ
বিঞ্‌ বিষ দ আঁড়গোনা ;
ঊঙ্গুয়া কড়া বিষ দ হিলি হো,
চেকাতে আঁড়গোনা ?"

অর্থাৎ–

'সারু জঙ্গলে পাতা তুলতে গেছলাম, বৌদি। কালো সাপ আমাকে ছোবল মেরেছে। বৌদি, ঝাড়-ফুঁকের সাহায্যে তো সাপের বিষ নামে, কিন্তু অবিবাহিত ছেলের উপর থেকে যৌবনের বিষ নামবে কি ভাবে ?

সাঁওতালী লোকগীতির এক বিরাট অংশই স্বভাবতই প্রেমগীতিতে পরিপূর্ণ। এই প্রেম বলতে কি বোঝায় তা এক সাঁওতাল তরুণ তার ঘনিষ্ঠ বৌদির কাছে জানতে চায়–

পিরিত, পিরিত, পিরিত হিলি হো,
পিরিত দি হিলি হো লাঁইয়াঞ মেসে।

অর্থাৎ–

প্রেম প্রেম প্রেম বৌদি গো,
প্রেম মানে কি আমাকে বলে দাও না গো বৌদি।

বৌদি প্রেমের পরিণাম জানায় দেওরকে–

"পিরিত দ বাবুজা বাংগে বুগিয়া
জাঁহা তিনরেম উইহীরলেখান,
উইহীরলেখানগে দ মেঁৎ দাঃ জরঃআ।
হারতা আকাৎ দাকা বাবুজা,
দাকা বাবুজা বাংগে জমঃ।
জাঁহাঁ তিনরেম উইহীরলেখান,
লাড়াআকান উপ্ বাবুজা বাংগে সুদুঃ দ।
আহাই আকাৎ ঠিলি বাবুজা বাংগে দিপিলঃ,
পিরিত দ বাবুজা বাংগে বাগিয়া॥"

অর্থাৎ–

'প্রেম মোটেই ভাল নয়।
যখনই কেউ স্মরণ করে,
দু'চোখ ভরা অশ্রু জলে।
সামনে বাড়া ভাতের থালা,
খেতে রুচি হয় না তার॥

যখন কেউ স্মরণ করে
এলো চুল তার বাঁধতে নারে।
ভরা কলস মাথায় নিতে না পারে।
প্রেম যে মোটেই ভাল লাগে না গো॥

প্রেমের আগুন নিরন্তর যন্ত্রণায় নারীমনের করুণ গুঞ্জন অতৃপ্ত সুর তীব্রতর হয়ে ফুটে উঠেছে তার একটি গানে–

বুরু সেঙ্গেল লঃ দ হড়কো এ্রেলা
ইঞাং জিউয়ি লঃ দ অকয় এ্রেলা ?
ইঞাং জিউয়ি লঃ দ বোরসে সেঙ্গেল,
ইঞাং জিউয়ি লঃ দ অকয় এ্রেলা ?

অর্থাৎ–

পাহাড় আগুন ধরা লোকে দেখে
আমার জীবন জ্বলে সেটা কে দেখে ?
আমার জীবন জ্বলে তুষের আগুন যেন
আমার জীবন জ্বলে সেটা কে দেখে ?

এ ধরনের আর একটি গান–

বির বুরু লঃআ দিসম হড়কো এ্রেলা,
নিঞাং জিউয়ি লঃ হায়রে তকয়ে এ্রেলা ?
হতৎ কঁহ্ড়া বাং সে গেৎকাতিঞ উদুঃ,
নিঞা জিউয়ি লঃ হায়রে এ্রেলা ?

অর্থাৎ–

পাহাড়-জঙ্গল পোড়ে সবাই দেখে,
আমার প্রাণ যে পোড়ে হায় হায় কেউ না দেখে ?
লাউ-কুমড়া নয় যে কেটে কেটে দেখাই,
আমার প্রাণ যে পোড়ে হায় হায় কেউ বা দেখে ?

এ তো সেই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকীষ্ণকীর্তনের চিরন্তন গান। 'বনের আগুন সবাই দেখে, মনের আগুন কেউ দেখে না।'

এছাড়া, আর এক ধরনের গীত আছে যা সাধারণত লোকালয়ে গাওয়া হয় না, বনে-জঙ্গলেই গাওয়া হয়। এগুলিকে 'বির সেরেঞ' বা 'বনগীতি' বলা হয়। এগুলিতে অশ্লীলতার ছাপতো আছেই, গানের ভাষাও সুরুচির নয়। শিকার উৎসবে যেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানেই সন্ধ্যেবেলা সাধারণত এ সব গান শোনা যায়। কলেয়ান গুরুর কথানুযায়ী স্বামী সুখবঞ্চিতা নারীরাই এ সব গানের স্রষ্টা। বনে জঙ্গলে পাতা তোলার সময়ই তারা এ সব গান অন্যান্যদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তরা তাদের কাছ থেকেই গানগুলি শেখে। বয়স্ক বিবাহিতা নারীরা এ সব গান মোটেই পছন্দ করে না পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। কিছুটা উন্নত রুচির একটি বনগীত এখানে দেওয়া হল ঃ

বির বুরুলাঙ পারমকেদা
গেল্‌বার্‌ বুরুলাঙ দেয়াকেদা
উকুর বাবুরেম সেকাওলিদিঞা ?
হড়্‌ম হিলি গো জালিতেগিঞা
ডাণ্ডা হিলি গো কুচিগেতিঞা
বাংখান দ নাওয়া সাগাড় আরা লেকা
ঠকাও মিলাওকেম॥

অর্থাৎ–

বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বত আমরা পার হলাম, বারোটি পাহাড় পিছনে ফেলে এলাম ; ওগো ঠাকুরপো, তুমি তো আমাকে আজও উত্তপ্ত করলে না ?

বৌদি গো, আমার শরীর এখনও কাঁচা, কোমর এখনও শক্ত হয়নি ; নইলে নতুন গাড়ীর চাকার পাখির মত একসাথে মিলে যেতাম।

পূর্বেই বলেছি, 'বির সেরেঞ' লোকালয়ে গাওয়া নিষেধ, কারণ এ গানে শুধু যৌন আবেদনই প্রচ্ছন্ন নেই, নারীর রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনাও আছে, উপমাসহ অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট ভাষায়। নারীর সৌন্দর্য তো পুরুষের কাছে এক আকর্ষণীয় বস্তু। তাই নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কত পুরুষ উন্মাদ হয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে, এমন কি সাম্রাজ্য পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু দেশের বহু কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী নারীর রূপ বর্ণনা করেই তো অমর হয়ে আছেন। বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকরাও তাঁদের বর্ণনায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন–'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার দিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' প্রভৃতি। আর অনামী এক সাঁওতাল লোককবি তার বর্ণনায় বলেছেন–'উল বেলে লেকা হড়ম তাম হো...' অর্থাৎ–'তোমার শরীর যেন সুপক্ক আমের মত রসাল.........'। এই রসাল বর্ণনায় সাঁওতালী কবিরা কোন অংশেই কম নন !

তৃতীয় অধ্যায়

মিশনারীদের অবদান ও সংগৃহীত সাহিত্য

মুখে মুখে প্রচলিত সাঁওতালী সাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাসে কয়েকজন বিদেশী মিশনারীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মিশনারীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সাঁওতালী ভাষা আজ লিখিত রূপ পেয়েছে এবং সাঁওতালী সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবতম অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এর ফলে সাঁওতালী সাহিত্যচর্চার পথ যেন উন্মুক্ত হয়েছে। কিভাবে এই লিখিত সাহিত্যচর্চার শুরু হয় এবং কারা কারা কি ভাবে কাজ করেছেন, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। তা না জানলে সাঁওতালী সাহিত্যবিকাশের মূল্যবান একটা অধ্যায় সম্পূর্ণ অজানাই থেকে যাবে। এ সম্পর্কেই এখানে সামান্য আলোচনা করা হচ্ছে।

'আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট্ ফরেন মিশন সোসাইটি' সর্বপ্রথম সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেন আর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজকর্ম পুরোদমে চালান। তারপর, 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' সংক্ষেপে সি-এম-এস-মিশন, 'নদার্ণ ইভানজেলিক্যাল লুথারণ চার্চ' 'মেথডিস্ট্ মিশনারী সোসাইটি' এবং 'রোমান ক্যাথলিক মিশন' ক্রমান্বয়ে এই কাজে অগ্রসর হন। কিন্তু ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে কয়েকজন মিশনারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাঁরাই বহু প্রাচীন সাঁওতালী গান, ছড়া ও লোককথা বিরামহীন ভাবে সংগ্রহ করেন।

কোন-কোন মিশনারী আবার ভাষা শিখতে গিয়ে এমন সব বিষয়ের সন্ধান পান যে, মূল ধর্মপ্রচার বাদ দিয়ে তাঁরা সাঁওতালী ভাষাচর্চাতেই মনোনিবেশ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় রোমান লিপিতে কয়েকটি মূল্যবান সাঁওতালী পুস্তক প্রকাশিত হয়। যে সব বিদেশী মিশনারী সাঁওতালী ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করে গিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য তুলে ধরে এই অবসরে সেই মহান্ পুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

রেভাঃ জে. ফিলিপস্

তাঁর পুরো নাম জিরিময় ফিলিপস্। আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট ফরেন মিশন সোসাইটি ১৮৩৮ সাল নাগাদ উড়িষ্যার জলেশ্বরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন

পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় রেভারেণ্ড জে. ফিলিপস এবং এলিনয়ের সাহেবের উপর। ফিলিপস্ সাহেব একদিন প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কিছু সাঁওতালের দেখা পান। তারা এক অপরিচিত ভাষায় কথা বলছে দেখে তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানতে পারলেন যে, তারা সাঁওতাল। সেই থেকে তিনি সাগ্রহে এই সরল মানুষদের মধ্যে কাজ করতে আগ্রহান্বিত হন আর সাঁওতালী ভাষাচর্চা শুরু করেন। এরপর তিনি সাঁওতাল গ্রামে ধর্মপ্রচারে গেলে ধীরে ধীরে জানতে পারেন যে, সাঁওতালীতে বহু মূল্যবান গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও লোককথা প্রচলিত আছে, কিন্তু হরফ না থাকায় সেগুলি তখনও লিপিবদ্ধ হয়নি। ফিলিপস্ সাহেব বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপি ভালই জানতেন। জলেশ্বরে যাবার পূর্বে তিনি মেদিনীপুরেই ছিলেন এবং সেই সময়ই তিনি বাংলা ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন। এই ভাষাজ্ঞানকে তিনি এবার কাজে লাগালেন। প্রচারের সময় তিনি সাঁওতালী গান ও ছড়া সংগ্রহ করতেন। এভাবে নিজের প্রচেষ্টায় ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলা হরফে সাঁওতালী গান ও ছড়ার বই প্রকাশ করলেন। পরে তিনি আবার ১৮৫০ সালে 'সাঁওতালী ভাষা শিক্ষা' এবং ১৮৫২ সালে 'An Introduction to the Santali Language' নামে দু'খানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে ব্যাকরণসহ পাঁচ হাজার সাঁওতালী শব্দ তালিকা পাওয়া যায়। বলতে গেলে সেই হল সাঁওতালী সাহিত্যের ভাষাচর্চার আদিতম প্রচেষ্টা।

রেভাঃ ই. পুক্স্লি এবং রেভাঃ ডব্লু. টি. স্টরস্

চার্চ মিশনারী সোসাইটি উত্তরবঙ্গে ১৮৬২ সালে কাজ শুরু করে। এই মিশনের দু'জন মিশনারী ই-এল পুক্সলি এবং উইলিয়াম টাউনসেণ্ড স্টরস্ সাঁওতাল গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাদের প্রচলিত গান, উপকথা ইত্যাদি শুনে সেগুলির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন। পুক্স্লি সাঁওতালী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করার জন্য সাঁওতালী শব্দসংগ্রহ শুরু করেন। ঐ সময়েই ১৮৬৩ সালে ডঃ বি. সি. আর লেপসাস সাঁওতালী ভাষার জন্য মানসম্মত হরফ বা রোমান লিপি তৈরী করেন। মিশনারী সাহেব পুক্সলি ঐ লিপিই তাঁর অভিধান তৈরীর কাজে ব্যবহার করেন। ১৮৬৮ সালে অভিধানটি প্রকাশিত হয়, নাম–'A vocabulary of the Santali Language'. এছাড়াও পুক্সলি কিছু সাঁওতালী গান এবং বাইবেলের বিষয় নিয়ে ছোট ছোট গল্প ও রচনা প্রকাশ করেন।

রেভাঃ স্টর্স ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি গির্জার নিয়মাবলী 'গির্জা ধারা' সাঁওতালীতে অনুবাদ করেছিলেন। এমন কি সাঁওতালীতে নিজেই গান রচনা করেন। তাঁর রচিত গানের একটা নমুনা এখানে দেওয়া হল। সাহেবের রচিত গানে সেই সময়কার সাঁওতালী ভাষার মান আমরা কিছুটা অন্তত অনুমান করতে পারব।

"আমেম দুলীড়েদিঞ কানতে
সারহাওএৎমে কানাঞ,
ইঞ দ বেঙ্গেৎআঞ্মে বাড়ে
আমরেন গুতি কানাঞ।"*

অর্থাৎ–

তুমি ভালবাস বলেই আমি তোমার জয়গান করি। আমার দিকে তাকাও, আমি তোমারই সেবক।

গানটিতে দেখা যায় বিশুদ্ধ শব্দ ছাড়া আর অন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত পর্যন্ত হয়নি। আর গানটিও কত সহজ সরল ভাষায় রচিত। ঐ সময়কার সাঁওতালী ভাষার মান বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য আর একটি গান তুলে ধরা হল ঃ

"পাঃরম্ গিরা সেটেরাকান আবন তালারে
বুঝাও রাকাপ্ আয়োগোঞ্ বুঝাও আঁড়গোকেৎ।
ওয়াখেপতাবন পেহো সানাম কাথা দ
হারেফারে তেগে কীই দ বীগিতাবন পে॥

ইঞ দ টুওয়ীর উতারগেয়াঞ সানাম পাড়াগে
ধীর্তি টুডাংরে দঞ্ হালা ঞুলাঃকান
আমদা শাসেত্ অতরেঞ ভুঞ্জাওএৎকান দ
অনা শাসেত্ খন দ যীশু পারমিঞ্মে বাড়ে।"**

অর্থাৎ–

'পার হবার ডাক এসেছে আমাদের, সেটা বুঝতে পারছি। তোমরা সমস্ত কথা, বুদ্ধিমানের মত চিন্তা কর, পাপ থেকে বিরত হও।

* সেরেঞ পুথি ঃ সেরেঞ নং–৪৭৭
** সেরেঞ পুথি ঃ সেরেঞ নং–২৮৮

আমি সব দিক থেকে অনাথ, এই পৃথিবীতে এসে হাবুডুবু খাচ্ছি। এই মাটিতে বহু কষ্ট ভোগ করছি, এই কষ্ট থেকে যীশু আমাকে উদ্ধার কর।'

বলাবাহুল্য এ সব গান খৃষ্টধর্মের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত।

এ গানটির রচয়িতা দুলা হেমব্রম এবং ১৮৭০ সালের পূর্বে 'মেদিনীপুর সেরেঞ পুথি' নামক গানের বইয়ে বাংলা হরফে গানটি মুদ্রিত হয়। এই গানের বইটির কথা ছটরায় দেশমাঁঝিও উল্লেখ করে গিয়েছেন। বেনাগাড়িয়া মিশনে যখন প্রথম কাজ শুরু হয় তখন স্ক্রেফস্রুড (কেরাপ) সাহেব মেদিনীপুর থেকে ঐ গানের বইটি এনে কাজ চালান। এতে তাঁর কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

জানা যায়, আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট্ মিশন মেদিনীপুর শহরের আশেপাশে সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করার সময়ে ঐ গানের বইটি প্রচার করতেন এবং যে সকল সাঁওতাল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করত, তাদের গানও ঐ গানের বইয়ে স্থান পায়। গানগুলি সবই খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত। যেমন–

"আঁজম তাবন পেহো আঁজম তাবনপে
জিয়েৎ ঈশ্বর চেৎএ মেনেৎ আঁজম তাবনপে।
ইঞ সামাংরে এটাঃ ঈশ্বর
আলগেকো তাহেনতাম মা......"

অর্থাৎ–

'শোন, শোন, শোন হে, জীবন্ত ঈশ্বর যা বলেছেন শোন। আমার সামনে তোমাদের অন্য ঈশ্বর যেন না থাকে.......। গানটি বাইবেলের দশ আজ্ঞা (Ten Commandments)-এর বিষয়বস্তু নিয়েই রচিত।

আবার–

"দে হে বেরেৎ পে সে
মা হো দুড়ুপপে
যীশু ঞুতুম চান্দো
সের্মা চটে খন
ডিগি মিগি দরে
সেটেরেনায় হো॥
বাথান টাণ্ডিরেন হো
ভিডি গুপি কো

দূত নাসাড়হেঁতে
দাঁভিদ নাঙ্গারতে,
যীশু চুমীড়কো রাকাপ
চালাঃকান।......."

অর্থাৎ–

'ওহে তোমরা ওঠ, তোমরা বস। স্বর্গ থেকে যীশু নামে ভগবান সানন্দে এসে পৌঁছেছেন। চরানি মাঠের মেষপালকরা দূতমুখে এ কথা জানতে পেরে দায়ুদ নগরীতে যীশুকে বরণ করতে যাচ্ছে।.......' গানটির রচয়িতা মধুসূদন মারাণ্ডি। মেদিনীপুর সেরেঞ পুথির গানগুলি সবই খৃষ্টধর্মবিষয়ক এবং গানগুলি বাংলা হরফে মুদ্রিত।

এবার যে গানটি তুলে ধরা হচ্ছে সেটি স্ক্রেফসরুড সাহেবের গুরু বিরাম হাঁসদার রচিত। এটাকে ঠিক গান বলে মনে হয় না, কবিতা বলেই মনে হয়। যতদূর সম্ভব সুর দিয়ে গানের বইয়ে স্থান করে দেওয়া হয়েছে। গান হিসেবেই সেটি উদ্ধৃত করলাম–

ঞেলঃকানা জত হড় ঠেন সের্মা,
ওরোমঃকানা মান্‌ওয়া ঠেন ধীর্তি।
সিঞ চান্দোয় জোলোঃকানা চটরে,
ঞিন্দী চান্দোয় জোলোঃকানা উসুলরে।
ইপিলকোকো লিপ লিপাউঃকানা,
বিজলী দ বিলিৎ বিলিদঃকান॥
সেরমা সেরমা লল সোতোংআঃ কান
সেরমা সেরমা রেয়াড় রাবাং কানা।
অক্তে অক্তে হিজুঃকানা হয়-দাঃ।
অক্তে অক্তে লীবিদঃকান হাসা।
সেরমা সেরমা হড়কো সিয়োঃকানা
সেরমা সেরমা হড়কো ইরঃ কানা।
দিন দিন ক জানামঃকান হড় দ
দিন দিন ক গুজুঃকানা হড় দ॥
পিড়হি পিড়হি হিজুঃকানা অত্‌তে
পিড়হি পিড়হি চালাকানা অত্‌রে।

ধীর্তিরে দ জত চাবাঃকানা।
ধীর্তিরে দ ভরসা বীনুঃ বয়হা
সের্মা লীগিৎ য়েরজংমে বয়হা।

অর্থাৎ–

সবার কাছেই আকাশ দেখা যায়
মানুষ পায় ধরার পরিচয়।
শূন্যে উঁচু সূর্যদেব জ্বলেন
ওপরে চাঁদ রাতের আকাশতলে।
মিটি মিটি তারা ঝকঝকে
আলোর ঝলকে বিদ্যুৎ চমকে।
বছর বছর ঝলসানো রোদ্দুরে
কনকনে শীত ফিরছে ফি বছরে॥
সময় মতন হাজির হয় ঝড় বৃষ্টি
সময় মতন নরম হচ্ছে মাটি।
বছর বছর দিচ্ছে লোকে লাঙ্গল
বছর বছর কাটছে লোকে ফসল।
দিনে দিনে মানব জন্ম নেয়।
দিনে দিনে মানুষ মারা যায়।
বংশক্রমে যাচ্ছে আবার মাটিতে।
ধরিত্রীতে বদলে যায় সব
শেষ হয়ে যায় সমস্ত কলরব।
ধরার বুকে ভরসা নেই রে ভাই
আকাশ পথের বীজ বুনে দাও তাই॥

এরকম বহু গান সেদিন বিভিন্ন গানের বইতে স্থান পায়। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, সাঁওতালী ভাষা লেখার জন্য যদিও প্রথমে বাংলা হরফ ব্যবহার হচ্ছিল, কিন্তু বিহারে নতুন কিছু মিশনারীর কাছে সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডঃ সি. আর লেপসাস রোমান হরফে কিছু বিশেষ চিহ্ন সংযোজন করে সাঁওতালী ভাষার জন্য মানানুগত হরফ তৈরী করেন এবং সেটাই এখন রোমান হরফ্ নামে অভিহিত। আর ই. এল. পুক্সলি প্রথম এই হরফ

ব্যবহার করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ গ্রাহাম এবং স্কটিস বেনাগাড়িয়া মিশনে ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং তারপর থেকে সাঁওতালী ভাষার জন্য ঐ রোমান লিপি নিয়মিত ব্যবহৃত হতে থাকে। মিশনারী এবং খৃষ্টধর্ম বিশ্বাসী সাঁওতালদের রচিত গানগুলিও রোমান লিপিতেই মুদ্রণ হয়। যাই হোক, মিশনারীদের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা ৪টি সাঁওতালী গানের বইয়ের সন্ধান পাই। প্রথমটি বাংলা লিপিতে আর বাকি তিনটি রোমান লিপিতে। এই ৪টি গানের বই সম্পর্কে কিছু তথ্যও এখানে দেওয়া হল ঃ

(১) মেদিনীপুর সেরেঞ পুথি–আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন সর্বপ্রথম এই গানের বইটি বাংলা লিপিতে প্রকাশ করেন। যতদূর সম্ভব মনে হয় ১৮৭০ সালের পূর্বেই গানের বইটি প্রকাশিত হয় আর ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ছয় বার মুদ্রিত হয়।

(২) বেনাগাড়িয়া সেরেঞ পুথি–১৮৭২ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ১২ বার মুদ্রিত হয়। রোমান লিপি বইটিতে ব্যবহৃত হয়। গানের বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন মাত্র ১৮টি গান স্থান পায়, পরে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৯ হয়। বইটি ১৮ হাজার কপি বিক্রি হয়–সাঁওতালদের মধ্যে তখনকার শিক্ষার মান অনুমান করলে এত অধিক বিক্রি অন্য কোন বই আজও হয়নি।

(৩) তালঝারি সেরেঞ পুথি–তালঝারি মিশনের ফ্রেডারিক থোমাস কোল ১৮৭৬ সালে প্রথম এই গানের বইটি প্রকাশ করেন এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মোট ১১ বার মুদ্রিত হয়। রোমান লিপিতে বইটি মুদ্রিত।

(৪) পোখুরিয়া সেরেঞ পুথি–এই গানের বইটি ১৮৮৩ সালে প্রথম এবং ১৯১৩ সালে শেষবার প্রকাশিত হয়। এই গানের বইয়ে রোমান লিপি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তীকালে আরো দুটি সাঁওতালী গানের বই প্রকাশিত হয়, সে দুটি হল ঃ

(১) সারেঙ্গা সেরেঞ পুথি–১৯৩৬ সালে বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা গ্রাম নিবাসী আর্নেস্ট সরেন এই গানের বইটি প্রকাশ করেন। এটি বাংলা হরফে মুদ্রিত এবং ১৪০টি সাঁওতালী গান বইটিতে স্থান পেয়েছে।

(২) হড় সেরেঞ–আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের রেভাঃ অগস্ট. এ. বার্গ বাঙ্গলা ও বিহারের প্রচলিত কিছু গান সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

ভীমপুর ও সাঁওতাল হাইস্কুলের প্রার্থনাসভায় মাঝে মাঝে এই গানের বই থেকে গান গাওয়া হত। রেভাঃ বার্গকে এই গানগুলি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন তাঁর মেমসাহেব। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করি। সেটা হল–সাহেবের থেকে মেমসাহেবই কিন্তু ভাল সাঁওতালী বলতে পারতেন। বহু সাঁওতাল মহিলার মুখে শুনেছি, মেমসাহেব গ্রামের সাঁওতাল মেয়েদের মতই সাঁওতালী বলতেন, আড়াল থেকে তাঁর কথা শুনলে বোঝা যেত না যে এক বিদেশিনী কথা বলছেন। মেয়েদের ভাষা রপ্ত করার একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে সেটাই এখানে তুলে ধরলাম।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৫ সালে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট্ মিশনের রেভাঃ ডব্লু. সি. অসগুড 'ধরম গিরী সেরেঞ পুথি' নামে আর একটি গানের বই প্রকাশ করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল মেদিনীপুর জেলার বেলদা অঞ্চল এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা। এ অঞ্চলের সংগৃহীত সাঁওতালী গানই ঐ গানের বইটিতে প্রধানত স্থান পায়।

বলাবাহুল্য, খৃষ্টধর্ম প্রচারই মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এই সব গানের বই প্রকাশে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান অস্বীকার করা যায় না। সাঁওতালী লিখিত সাহিত্যের বুনিয়াদ এভাবেই তৈরী হয় এবং যে সমস্ত কবি ও গীতিকারদের গান প্রকাশিত হয়, তাঁরা হলেন–দুলা হেমব্রম (মেদিনীপুর), মধুসূদন মারাণ্ডি (মেদিনীপুর), ডেডেম হাঁসদা (বেনাগাড়িয়া), কালু মারাণ্ডি (বেনাগাড়িয়া), নুকা মারাণ্ডি (বেনাগাড়িয়া), শিমোন বাস্কে (কায়রাবনী), শিবু বেসরা (মহুলপাহাড়ীর নিকট দুর্গাপুর গ্রাম), কালু কিস্কু (মহুলপাহাড়ীর নিকট কার্মাটাঁড় গ্রাম), এন. যোসেফ. হাঁসদা (পোখুরিয়া), খুদিয়া মারাণ্ডি (মহুলপাহাড়ী), সমায় মুরমু (বাঁশলই নদীর ধারে পাচওয়াড়া গ্রাম), চৈতন্য হেমব্রম কুমার (তালঝারি), নিমবাই মুরমু (রাজমহল অঞ্চলের বাঁশখোলা গ্রাম), জালপা সরেন (বাঁকিজোড়) যাকোব ও সরেন (বেনাগাড়িয়া), বেঞ্জামিন সরেন (পাডেরকোলা) বাবুরাম বেঞ্জামিন সরেন (হাজারীবাগে ডুমুরিয়া গ্রাম), বারিয়াড় সরেন (ঝুনকি), সূর্য্য মুরমু (ময়ূরাক্ষী নদীতীরে ধরমপুর গ্রাম), বৈজনাথ মুরমু (গোড্ডার নিকট ভাতোণ্ডা গ্রাম) এবং স্ক্রেফস্‌রুড সাহেবের গুরু বিরাম হাঁসদা।

এত বিপুল সংখ্যক সাঁওতাল গীতিকারদের নাম থেকেই সহজেই অনুমান করা যায় স্বল্পশিক্ষিত হলেও কবিত্বশক্তি তাঁদের মধ্যে মোটেই অল্প ছিল না।

এবার ঐ সময়ের দুটি পুরানো গানের নমুনা তুলে ধরা হল। প্রথম গানটি ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়, রচয়িতা শিবু সরেন।

উরসিঞ্‌ বার্‌সিঞ্‌ রেঙ্গেচ্‌ তেতাং
দুক বোন জমেৎ ধাঁর্তিরে,
হাজার হার্কেত শাসেত্‌তে দ
মান্‌ওয়া মনগে বিকলঃকান।

উরলুঙ গোবোন হেচ্‌আকান
উরলুঙ গেবো চালাঃআ।
রুয়া হাসো গুজুঃ গুরুঃ
মান্‌ওয়া সুক দ ঠলঠল দাঃ লেকা।

ধাঁর্তি দুক খন মারাং উতার
জিউয়ি রগগে মেনাঃআ,
মন দ কাঁইতে পেরেচ্‌গেয়া
অনা রগ্‌ দ মূড়হূচ্‌ জম লেকা॥

অর্থাৎ–

দু'একদিনের দুঃখ-কষ্ট এ পৃথিবীতে আমরা ভোগ করি। হাজার দুঃখ-কষ্টে মানুষের মন তো অস্থির।

উলঙ্গই আমরা এসেছি, উলঙ্গই ফিরে যাব। রোগ-ব্যাধি মৃত্যু আছে, মানুষের সুখ টলমল জলের মত।

এ জগতের লৌকিক দুঃখের থেকেও বড় মানসিক দুঃখ। মন পাপে পূর্ণ হলে সেটা কুষ্ঠ ব্যাধির মত।

দ্বিতীয় গানটি কালু কিস্কু রচিত–

মান্‌ওয়া জিয়ন দ দারে উমুল লেকা পারমঃকান
বাবন বাডায় অকা হিলোঃ
আচ্‌কাগে চালাঃ হোয়ো।
ধাঁর্তিরেগে হো ধরম সাঁদেশ দ কিরিঞ্‌জংপে
আরহঁ বাচো ঞামঃ সহর-বাজার
সের্মা জিয়ন দ পাসুড়ঃআ।

অর্থাৎ–

মানুষের জীবন গাছের ছায়ার মত, জানি না কখন কোন্‌দিকে হঠাৎ চলে যেতে হবে।

পৃথিবীতে ধর্মের সন্দেশ ক্রয় কর, শহরে-বাজারে এ সন্দেশ আর পাবে না, স্বর্গীয় জীবন হাতছাড়া হবে, অতএব সাবধান।

এ সময়ে দু'জন মহিলার রচিত গানও প্রকাশিত হয়, তাঁরা হলেন–দুমকার ধর্মপ্রচারক গুলু মুরমু'র স্ত্রী সোনা এবং সামিয়া টুডু। সামিয়া টুডু বেনাগাড়িয়া স্কুলে পড়াশুনা করেন, পরে স্ক্রেফস্‌রুড সাহেবের অফিসের কাজে বহাল হন।

১৯০১ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে আরো অনেকের গান প্রকাশিত হয়, এ ব্যাপারে মিশনারীরা সবসময় বিপুল উৎসাহ দিয়েছেন। যাদের গান এ সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁরা হলেন–বীরসিং হেমব্রম (সারেঙ্গা), আর্নেস্ট সরেন (সারেঙ্গা), জোনাস হাঁসদা (মুর্শিদাবাদ), লাচু হেমব্রম (বারোমাসিয়া), বার্‌সা যোয়েল হেমব্রম (হিরণপুর), স্টিফেন সি মুরমু (মধুপুর), মিঘু কিস্কু (সারেঙ্গা), গোবিন্দ মুরমু (মনাপাড়া, মেদিনীপুর), নিকোদম মাণ্ডি (মাহারাও) ও সুরাই মুরমু (জুবদি চিত্রাপাথর), রাজা মারাণ্ডি (জুবদি), শামুয়েল কিস্কু (বামদা), জেমস্ হপনা সরেন (নানকারের গামহার গ্রাম)।

রেভাঃ এল. ও. স্ক্রেফস্‌রুড

পুরা নাম রেভাঃ লারস্ ওলসেন স্ক্রেফস্‌রুড। সাঁওতালরা নাম রাখে 'কেরাপ সাহেব'। নদার্ন ইভানজেলিক্যাল চার্চের তিনিই প্রথম মিশনারী। জানা যায়, ব্যাপ্‌টিস্ট্ মিশনের আগ্রহে ১৮৬৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর* সাঁওতাল পরগণার বেনাগাড়িয়া গ্রামে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কাজে জনসন সাহেব, পাপা সাহেব আর স্ক্রেফস্‌রুড সাহেব উল্লেখযোগ্য ভুমিকা গ্রহণ করেন। জায়গা নির্বাচন ও বাড়ী-ঘর তৈরীর আয়োজন তাঁরাই করেন। মিশন স্থাপনের পরই স্ক্রেফস্‌রুড সাহেব সাঁওতালী ভাষা শেখার জন্য সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম শিক্ষক বারোমাসিয়া গ্রামের খুদু। খুদুর মৃত্যুর পর তিনি বিরাম হাঁসদাকে শিক্ষক মনোনীতি করেন। খুদু এবং বিরাম হাঁসদা দু'জনেই বেশ লেখাপড়া জানতেন

* ছটরায় দেশমাঁঞ্জহি রেয়াঃ কাথা, পৃ-২৭

এবং সাঁওতালী ভাষায় রীতিমত দক্ষ ছিলেন। মানুষ হিসাবেও তাঁরা ছিলেন খুব সরল প্রকৃতির। এরকম দু'জন ভাল শিক্ষক পেয়েছিলেন বলেই স্ক্রেফস্রুড সাহেব খুবই ভাল সাঁওতালী শিখতে পেরেছিলেন। তাঁর মত ভাল স্পষ্ট সাঁওতালী কথা কম সাহেবই বলতে পারতেন।

স্ক্রেফস্রুড সাহেবই সর্বপ্রথম সাঁওতালী ভাষায় লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি 'সানতালী পাঁহিল পুথি', 'সানতালী দসার পুথি', 'বুজ রাকাপ্ পুথি' ও 'সেরেঞ পুথি' প্রকাশ করেন। এরপর তিনি ১৮৭৩ সালে বারাণসী থেকে রোমান হরপে সাঁওতালী ভাষায় ব্যাকরণ 'A Grammar of the Santali Language' প্রকাশ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৮৭ সালে বেনাগাড়িয়া মিশন প্রেস থেকে সাঁওতালী ভাষায় এক অমূল্য গ্রন্থ "হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা" (সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের কথা) প্রকাশিত হয়। সাঁওতাল গুরু কলেয়ান হাড়াম ছিলেন সে সময় ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বয়স্ক পণ্ডিত। সাঁওতাল সমাজের রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। স্ক্রেফস্রুড সাহেব কলেয়ান গুরুর কাছ থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব, সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। স্ক্রেফস্রুড সাহেবের তাই বিরাট অবদান এবং বলা যায় সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের গোড়াপত্তন তিনিই করে গিয়েছেন। তাঁর এই অবদান আজও অমূল্য।

স্ক্রেফস্রুড সাহেব সাঁওতালী ভাষাচর্চার যেমন উৎসাহ দিতেন, নিজেও তেমনি চর্চা করতেন। বহু গান তিনি নিজে রচনা করেছেন, সেরেঞ পুথিতে সেগুলি পাওয়া যায় অবশ্য তাঁর অধিকাংশই গানই ধর্মপ্রচারমূলক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে সমাজ প্রথানুগত শিক্ষা পদ্ধতিতে পিছিয়ে, তাদের মধ্যে প্রচারের মোক্ষম পন্থা গীত রচনা করে তা গেয়ে প্রচার। তাঁর একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ-

সিঞাঃ মারসাল দানাংএন
ত্রিন্দী ঞুৎগে সেটেরেন
ঈশ্বর আমাঃ হির্লারে
দায়াকাতেম উমূললে।

কাঁমি দাড়েম এমাৎলে
জোহার তালে হাতাও মে

হামালতালেম রাওয়ালকেৎ
ঞুতুম তামলে মারাংকেৎ।

নিত্‌লে গিতিচ্‌ লাঁগিদঃ
সুলুক রেলে জিরাউকঃ
গাপা আমাঃ দায়াতে
বেরেৎ রুওয়াঁড় মালে।

অর্থাৎ–

দিনের আলো আড়াল হল, রাতের অন্ধকার নামল, ভগবান তোমার আশ্রয়ে কৃপা করে ঠাঁই দাও।

কর্মশক্তি তুমি দিয়েছে, প্রণাম তুমি গ্রহণ কর। আমাদের ভারী বোঝা তুমি হাল্কা করেছ, তোমার জয়গান গাই।

এখানে আমরা ঘুমাব, শান্তিতে বিশ্রাম করব, কাল তোমায় দয়ায় যেন আমরা আবার জেগে উঠতে পারি।

রেভাঃ এ. ক্যাম্পবেল

সাঁওতালী সাহিত্যচর্চার প্রথম যুগে কেরাপ সাহেবের পরই রেভাঃ এণ্ড্রু ক্যাম্পবেল-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি Free Church of Scotland এর হয়ে ভারতে আসেন এবং সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করেন (১৮৭৩-১৯১৯)। ক্যাম্পবেল সাহেব ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত পাচাম্বায় থাকেন এবং সাঁওতালী ভাষা ভালভাবেই রপ্ত করে নেন। এরপর তিনি মানভূম জেলার পোখোরিয়াতে এসে মিশনের কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে ১৮৯০ সালে একটি ছাপাখানার মেসিন বসান এবং সাঁওতালী ভাষায় ছাপার কাজ শুরু করেন। তিনি ঐ অঞ্চলের ৪০টি গ্রামে স্কুল স্থাপন করে সাঁওতালী ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। স্কুলের ছেলেদের জন্য পাঠ্যপুস্তক তিনি নিজেই রচনা করেন। সেগুলি হল–সান্তালী পাড়হাঃ পুথি (পাঁহিল হাঁটিঞ), সানতালী পাড়হাঃ পুথি, (দসার হাঁটিঞ) আর সানতালী পাড়হাঃ পুথি (তেসার হাঁটিঞ)। এ ছাড়াও তিনি ছেলেদের উপযোগী শিক্ষামূলক পুস্তক 'পাহা পোহো' 'পিয়াং পায়াং' 'থার চেতান থার' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) ও 'কুলি ও আঁচুর' প্রকাশ করেন।

সাঁওতালীতে বাইবেল অনুবাদ করার কাজে তাঁর অসামান্য অবদান আছে। এ সব কাজ ছাড়াও তিনি 'ঢারওয়াঃ' নামে একটি সাঁওতালী পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করতেন ; ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, ধাঁধাঁ, প্রবাদ এবং সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন সমস্যাদি প্রকাশিত হত। ১৮৯৯ সালে ক্যাম্পবেল সাহেবের সবচেয়ে মূল্যবান কাজ A Santali-English Dictionary প্রকাশিত হয়। এই সাঁওতালী অভিধান তৈরীর সময় বিশ্বড়ি গ্রামের মাঁঝি রাগদা হাঁসদা, বিসম বাস্কে এবং দেওয়া হাঁসদাঃ তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ক্যাম্পবেল সাহেবের আর একটি মূল্যবান কাজের কথা উল্লেখ করা হয়নি– সেটি হল 'পোখুরিয়া সেরেঞ পুথি' সংকলন। ১৮৮৩ সালে ২৬৬ পৃষ্ঠার এই গানের বইটি তিনি প্রকাশ করেন।

রেভাঃ এফ. টি. কোল

ঐ সময়ই একজন মিশনারী রেভাঃ ফ্রেডারিক থোমাস কোল (Rev. F. T Cole) সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে এসে শেষ পর্যন্ত তাদের ভাষা নিয়েই মূলত কাজ করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সাঁওতাল পরগনার তালঝারি গ্রাম। 'তালঝারি সেরেঞ পুথি' তিনিই প্রকাশ করেন। ঐ গান বইয়ের এক কপি চার্চ মিশনারী সোসাইটির লণ্ডন অফিসে রক্ষিত আছে।

কোল সাহেব ভাল অনুবাদক ছিলেন। তিনি 'Daniel and the Minor Prophet' পুস্তকটি সাঁওতালী ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়াও তিনি সাঁওতালদের মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য বাইবেলের বিভিন্ন বিষয় সাঁওতালীতে অনুবাদ করেন। আর একটি কথা–কোল সাহেব 'ঢারওয়াঃ' পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। তিনি সুযোগ পেলেই সাঁওতালী হেঁয়ালী 'কুদুম' সংগ্রহ করতেন এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাতেন।

রেভাঃ পি. ও. বোডিং

পুরা নাম পল ওলাফ বোডিং। সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য তিনি যা করে গেছেন, তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৮৯০ সালে তিনি এ দেশে আসেন। দীর্ঘ ৪৪ বছর সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রত থেকে বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের বদলে সাঁওতালী ভাষাচর্চা এবং তাদের শিল্প-সংস্কৃতির বহু নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করেন, সেগুলি নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটির গ্যালারিতে রক্ষিত আছে।

বোডিং সাহেব খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাঁওতালী ভাষা বেশ ভাল ভাবে রপ্ত করেন এবং তাঁর উদ্যোগে বোনাগাড়িয়া মিশন প্রেস থেকে 'হড় হপনরেন পেড়া' নামে একটি সাঁওতালী মাসিক পত্রিকা ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরে বাইবেল অনুবাদের কাজ শুরু করায় পত্রিকা চালানো তাঁর পক্ষে গুরুভার হয়ে পড়ে এবং ১৯০৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার ১৯২২ সাল থেকে 'পেড়া হড়' নামে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং আজ অবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

বোডিং সাহেব সাঁওতালী ভাষার্চচা এবং বাইবেল অনুবাদের জন্য একটি ছোট কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সিদোর নামই বিশেষভাবে স্মরণীয়। কমিটিতে তিনিই প্রধান পণ্ডিত ছিলেন এবং অনুবাদের কাজে তিনিই বোডিং সাহেবকে সবরকম সাহায্য করতেন। সিদো এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের যখন কাজ থাকত না, তখন তাঁরা সাঁওতালী শব্দ ও অর্থ লিখে রাখতেন। পরে বোডিং সাহেব তাঁদের সঙ্গে বসে সেগুলি শেষ বারের মত দেখে ও সংশোধন করে সমস্ত কাগজপত্র অস্‌লো ইউনির্ভাসিটিতে প্রফেসর ওলাফ কোলস্‌রুডের কাছে পাঠতেন। সাঁওতালী শব্দের সাঁওতালী ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আজও অস্‌লো ইউনির্ভাসিটিতে গচ্ছিত আছে। জানা যায়, কমিটিতে একজন পণ্ডিত খুবই তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন। বোডিং সাহেব নতুন কোন সাঁওতালী গল্প বা লোককথা পেলেই তাঁকে দিয়ে গল্পটি লিখে রাখতেন। কথক গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই পণ্ডিত তা লিখে নিতেন।

বোডিং সাহেব যে সমস্ত পুস্তক রচনা কিংবা অনুবাদ করে গেছেন ; সেগুলি হল ঃ

১) কুক্‌লি পুথি, ১৮৯৯

২) সেরেঞ পুথি, ১৯১২

৩) গির্জা ধারা, ১৯১৭

৪) হড় কাহ্‌নিকো, ১৯২৪

৫) বাইবেল, সাঁওতালী অনুবাদ (নতুন নিয়ম), ১৯০৬

৬) বাইবেল, সাঁওতালী অনুবাদ (পুরাতন নিয়ম), ১৯১৪

৭) A Santali Dictionary, Vol-I (১৯৩২), Vol-II (১৯৩৪), Vol-III (১৯৩৫), Vol-IV (১৯৩৫) & Vol-V (১৯৩৬).

৮) Materials for a Santali Grammar-I, ১৯২২.

৯) Materials for a Santali Grammar-II, ১৯২৯.

১০) A Santali Grammar for Beginners, ১৯২৯.

১১) Santali Folktales. Vol 1, 2 & 3.

১২) Studies in Santal Medicines and connected Folklore

এছাড়াও বোডিং সাহেব সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু সময়ের অভাবে সে সমস্ত তথ্য নিয়ে কাজ করে যেতে পারেননি। এ সমস্ত মূল্যবান তথ্য যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য তিনি দেশে ফিরে যাবার সময় সমস্ত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে যান এবং অস্‌লো ইউনির্ভাসিটিতে সমস্ত কাগজপত্র 'মাইক্রোফিল্ম' করে রাখার ব্যবস্থা করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিছুকাল আগে 'দি সানতালী লিটারারি অ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি'র উদ্যোগে ঐ মাইক্রোফিল্মের কয়েক কপি এ দেশে আনা হয়েছে, উদ্দেশ্য ঐ মূল্যবান তথ্যাবলী নিয়ে যেন গবেষণামূলক কাজ করা হয়।

রেভাঃ আর. রোজেনল্যাণ্ড

বোডিং সাহেবের সমসাময়িক আর একজন মিশনারী রেভাঃ রাসমুল রোজেনল্যাণ্ড সাহেবের নাম সাঁওতালী ভাষাচর্চার ইতিহাসে উল্লেখ না করলে কিছু ত্রুটি থেকে যায়। অন্যান্য মিশনারীদের মত তাঁর নাম তেমন শোনা যায় না। তিনি ডেনমার্ক থেকে এদেশে এসে কাজ করতে করতে সাঁওতালী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, সাঁওতালী ভাষা শিক্ষার গুরু হিসাবেও বোডিং সাহেবকে পান। রোজেনল্যাণ্ড সাহেব ১৯৪৮ সালে সাঁওতালীতে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'হড় রড় রেয়াঃ বেকরণ' (সাঁওতালী ভাষার ব্যাকরণ) প্রকাশ করেন।

রেভাঃ জে. গসডাল

এবার আর একজন মিশনারী সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেই সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে বেনাগাড়িয়া মিশনের মিশনারীদের ভূমিকা শেষ করব। এই মিশনারী হলেন রেভাঃ জে. গসডাল। পুরা নাম রেভাঃ যোহানেস গসডাল। দীর্ঘদিন তিনি 'পেড়া হড়' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন এবং ছোট গল্প, কবিতা, ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করে পত্রিকাটির

মান বাড়ান। তাঁর সময়ই আমার প্রথম লেখা 'পেড়া হড়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে গসডাল সাহেব তাঁর দেশে নরওয়েতে ফিরে যান।

গসডাল সাহেবের রচিত একটি গানের কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করা হল, মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তিনি এ গানটি রচনা করেন।

মারে জীতরেন হড়
আড়াঙতাবোন মিৎকাতে
আঁটবোন সেরেঞ মা
গেল্ বার্ পাঁরিসরেন
আল বোন হিড়িঞ্ মা
ধন মেনাঃ তাবোন।

অড়াঃ অড়াঃরে
হড়বোন সাঙ্গেয়েনতে
ছিরছাতুরেনা
মেনখান ধনতাবোন
বাঙতেৎগে আৎআকান
বাঞ্চাও মেনাঃগে।

সেদায় যুগ খনাঃ
আবোআং পাঁরসি দ
জানাম আঁইদারি
হড় রড় জীত তনল
গড়ম গ বাবাওয়াঃ
মেনাঃতাবোনা।

অর্থাৎ–

পুরানো দিনের মানুষ আমরা একই স্বরে জোরে জোরে গান গাইব। আমরা যে বারো গোষ্ঠী তা ভুলব না, আমাদের ওটিই সম্পদ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা ছিন্ন ভিন্ন হয়েছি। কিন্তু আমাদের সম্পদ হারিয়ে যায়নি, এখনও বেঁচে আছে।

বহুকাল থেকে আমাদের ভাষা আছে। সেটা জন্মগত অধিকার, সেটা সাঁওতালী ভাষা, জাতির মিলন সূত্র, মা-বাবা-ঠাকুরদাদাদের কাছ থেকে পাওয়া।

নর্দান ইভানজেলিক্যাল লুথারণ চার্চের মিশনারীদের সাঁওতালী ভাষাচর্চার ইতিহাস এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এবার আমেরিকান ব্যাপটিস্ট ফরেন মিশন সোসাইটি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট ফরেন মিশন সোসাইটি সর্বপ্রথম সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেছিল। তবে, বেনাগাড়িয়ায় মিশনারীরা যে রকম সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন, এ মিশনে সে রকম কোন কাজ হয়নি। এ মিশন সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজই চালিয়ে গেছে। দু'-একজন মিশনারীই শুধু সাঁওতালী ভাষা-সাহিত্য উন্নতির চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রেভাঃ জে. ফিলিপ্সের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর কথা আর বলছি না। আমি বরং রেভাঃ এল. সি কিচেনের কথা বলি। সাঁওতালরাও তাঁকে হাঁসদা গোষ্ঠীর 'চিলবিন্দা' গোত্রের একজন বলে 'ছাটিয়ার' (সমাজভুক্ত) করে নিয়েছিল।

কিচেন সাহেব সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভীমপুর হাইস্কুলে সাঁওতালী ভাষা পড়াবার প্রথম ব্যবস্থা করেন এবং যতদূর সম্ভব তাঁরই চেষ্টায় সাঁওতাল ছেলেরা ঐ স্কুলে থেকে সাঁওতালী ভাষা নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার প্রথম সুযোগ পায়। তিনি মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা কমিটির সদস্যও ছিলেন এবং 'Primary Education among Santals of Midnapore' নামক গ্রন্থটি লেখেন। এই গ্রন্থটিতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শিক্ষা-সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের রেভাঃ জে. ফিলিপ্সই ১৮৪৫ সালে জলেশ্বরে সর্বপ্রথম সাঁওতালদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন।* জলেশ্বর তখন বাঙ্গলার এলাকাধীন ও মেদিনীপুর জেলা কালেক্টর জলেশ্বরের রাজস্ব আদায় করতেন। শাহজাহনের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজার আমলেই জলেশ্বরকে উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙ্গলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে জলেশ্বর আবার উড়িষ্যাভুক্ত হয়।

ফিলিপস্ সাহেবের পরে এ মিশনের রেভাঃ ওটিস বেচলর ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় আরো কিছু স্কুল স্থাপন করেন। জানা যায় যে ১৮৬৭ সালে মিশনের ৩৩টি প্রাইমারী স্কুলে প্রায় ৪৫০ জন সাঁওতাল ছাত্র পড়াশুনা করত। ১৮৮১ সালের দিকে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ১৬০০। সেগুলির মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ২৫০।

* Santal School, The Christian Spectator, September, 1873 P-84

১৮৬৯ সালে স্ক্রেফসরুড সাহেব যখন বেনাগাড়িয়ায় মেয়েদের স্কুল ও হোস্টেল খোলেন তখন সাঁওতাল মেয়েরা প্রায়ই হোস্টেল থেকে বাড়ীতে পালিয়ে যেত ; সেজন্য স্ক্রেফসরুড সাহেব মেদিনীপুর মিশন থেকে ৪টি মেয়েকে নিয়ে যান এবং তাদের চেষ্টায় হোস্টেল চালাতে সুবিধা হয়।* এটা ছটরায় দেশমাঁঝিও স্বীকার করে তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন।

রেভাঃ অগস্ট বার্গ

এ মিশনের আর একজন মিশনারী হলেন অগস্ট. এ. বার্গ। সাঁওতালরা তাঁকে 'হড় সাহেব' বলত। তাঁর কর্মস্থান ছিল ঝাড়গ্রাম এবং সিংভূমের দামপাড়া অঞ্চ। তিনি সাঁওতালী ভাষা খুব ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন, এমন কি তাঁর মেম-সাহেবও খুব ভাল সাঁওতালী বলতে পারতেন এবং তাঁদের দুই ছেলে নাম 'হপন' ও 'টপন' রেখেছিলেন।

ঝাড়গ্রামে থাকার সময়ে বার্গ সাহেব সিংভূমের দামপাড়া অঞ্চল থেকে বহু সাঁওতালী গান সংগ্রহ করেন, পরে সে সব গান 'হড় সেরেঞ' নামে একটি গানের বইয়ে স্থান পায়। বার্গ সাহেবই এই গানের বইটি প্রকাশ করেন। গানের বইটি বাংলা হরপে মুদ্রিত হয়। মাঝে মাঝে ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুলের সকালবেলায় প্রার্থনা সভায় এই গানের বই থেকে সাঁওতালী গান গাওয়া হত।

আর একটা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করছই, এটা জানা দরকার প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা যেন তাদের নিজ মাতৃভাষায় লেখাপড়া করতে পারে তারই ব্যবস্থা দ্রুত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং সিংভূমের দামপাড়া অঞ্চলের প্রাইমারী স্কুলগুলোতে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরাই পড়াশুনা করত। কিন্তু সে সময়ে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে চাইত না। মাঠে-ঘাটে, পাখি শিকার, মাছধরা, খেলাধুলা করে সময় কাটাতে ভালবাসত। তাই কিভাবে ছেলেময়েরা লেখাপড়ার দিকে আকৃষ্ট করা যায়, সেজন্য প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সেইসব প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। বার্গ সাহেবই এই প্রশিক্ষণ দিতেন ! ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় যেন অনায়সে বর্ণপরিচয় হয়, সেজন্য তিনি শিক্ষকদের গানের সুরে শিখিয়ে দিতেন–

---

* OLAV HODNE :L.O. Skresfsrud Missionary and Social Reformer among the Santals of Santal Parganas P-300

"তোত্ড়া কড়া তাঁহেকান বায় বাডায় রড় দ
ইস্কুল রেগে সেঁড়েকেদায় বা-বি-বে-বো-বু
ইস্কুল রেগে সেঁড়াকেদায় কা-কি-কে-কো-কু...... ॥
দুন্‌ধি কুড়িয় তাঁহেকানা বায় বাডায় অল দ
ইস্কুল রেগে অলকেদায় দা-দি-দে-দো-দু
স্কুল রেগে অলকেদায় মা-মি-মে-মো-মু...... ॥"

অর্থাৎ–

তোত্‌লা ছেলে ছিল এক জানতো না সে কথা বলা,
ইস্কুলেতে শিখলো সে বা-বি-বে-বো-বু,
ইস্কুলেতে শিখলো সে কা-কি-কে-কো-কু...... ॥
বোকা মেয়ে ছিল এক জানতো না সে লেখা লিখি,
ইস্কুলেতে শিখলো সে দা-দি-দে-দো-দু
ইস্কুলেতে শিখলো সে মা-মি-মে-মো-মু...... ॥

এভাবে নানারকম ছড়া ও গানের মাধ্যমে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের চিহ্নগুলো শেখানো হত।

রেভাঃ বার্গ ছিলেন সুইডিস। এ দেশে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি তাঁর মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ পাননি। তাই সাঁওতালী ভাষা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যেমন একটা টান জন্মেছিল, তেমনি স্থানীয় সাঁওতালদের সঙ্গে একটা গভীর আত্মিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। নীচের চিঠিটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

আরবিয়ান সী
এপ্রিল ৩, ১৯৫০

দুলাঁড়িয়া পেড়াক,

পাঁহিল আঁলিঞাঃ দুলাঁড়িয়া জহার জত হড় হাতাও তালিঞপে। আশঃকানালিঞ আপে দ বেশগে মেনাপেয়া। নওয়া জাহাজতেলিঞ চালাঃ কানা ইংলণ্ড দিসম হাঁবিচ। আমদা হড় কানালে। জাহাজ দ আঁডি বোগেগে আর জমাক্, গিতিচ্ লাঁগিৎ জত সুবিদা। গাপা এডেনলে তিয়োগা। একেন পোন-মঁড়ে ঘণ্টালে তাহেনা। অণ্ডে খন পোর্ট সৈয়দ, ইজিপ্ট্ তেলে চালাঃআ।

আপেরেন পেড়া
রুথ আর অগস্ট বার্গ

(বাংলা)

আরব সাগর
এপ্রিল ৩, ১৯৫০

প্রিয় বন্ধুসব,

প্রথমে আপনারা সবাই আমাদের প্রীতি-নমস্কার নেবেন। আমরা আশা করছি, আপনারা সবাই ভাল আছেন। আমরা এই জাহাজে ইংলণ্ড পর্যন্ত যাচ্ছি। আমরা অনেকজন আছি। জাহাজটি খুব ভাল এবং খাওয়া-শোয়ার সবরকম সুবিধা আছে। আগামীকাল আমরা এডেনে পৌঁছবো। চার-পাঁচ ঘণ্টা ওখানে থাকব। সেখান থেকে আমরা পোর্ট সৈয়দ, ইজিপ্টে যাব।

আপনাদের বন্ধু
রুথ এবং অগস্ট বার্গ

এ মিশনের রেভাঃ ডব্লু. সি. অসগুড সাঁওতালী ভাষা জানতেন না, কিন্তু তিনিও সাঁওতালী গান সংগ্রহ করে 'ধরম গিরী সেরেঞ্ পুথি' নামে একটা গানের বই প্রকাশ করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল উড়িষ্যা, তিনি ঐ অঞ্চলেরই গান সংগ্রহ করেন।

আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট্ মিশনের পর 'মেথডিস্ট্ মিশনারী সোসাইটি'র নাম উল্লেখ করতে হয়। এ মিশন বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা অঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করত। জানা যায়, ১৮৭৯ সালে রেভাঃ জে. আর. ব্রডহেড প্রথম সাঁওতালদের মধ্যে কাজ শুরু করেন এবং তাঁর চেষ্টায় সারেঙ্গায় একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়।* পরে মিশনারীরা সারেঙ্গার আশেপাশে গাড়রা, খয়েরপাহাড়ী, গোবিন্দপুর, কুলডিহা, সামাডি, পলাশবনী, বাগডুবি, বারিকুল ইত্যাদি স্থানে বেশ কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

রেভাঃ এল. ই. ফক্‌লিংটন

মেথডিস্ট্ মিশনের সাহেবদের মধ্যে রেভাঃ এল. ই. ফক্‌লিংটনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি খুব ভাল সাঁওতালী বলতে পারতেন এবং ঐ অঞ্চলের সাঁওতালদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিজে মিশতেন, এমন কি স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে

* বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি (বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত) পৃ-৬৪

ফুটবলও খেলতেন। ক্যাম্পবেল সাঁওতালী-ইংরেজী ডিক্সনারী পুনর্মুদ্রণের সময়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন, বিশেষকরে সাঁওতালীতে পাখিদের নাম তিনিই সংগ্রহ করে দেন। এ ছাড়া, রেভাঃ ডব্লু. জে. কালসোকে 'Tribal Heritage' গ্রন্থটি লিখতে তিনি সাহায্য করেন।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮৫০* সালের প্রথম দিকে সাঁওতাল পরগনার উত্তরাংশে কাজ শুরু করে ; পরে আস্তে আস্তে মালদা ও দিনাজপুর জেলাতেও মিশন খোলা হয়। সাঁওতালী ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে ও মিশনের অবদান কম নয়। মিশনের মিশনারীদের উদ্যোগে ১৮৭৭ সালে 'বাইবেল'-এর মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত চারটি সুসমাচার (Gospel) সাঁওতালীতে অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। যতদূর সম্ভব 'বাইবেল'-এর সর্বপ্রথম আংশিক সাঁওতালী অনুবাদ এটি এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটি এ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। দু'বছর পর আরো কিছু অংশ 'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ' (The Acts of the Apostles) সাঁওতালীতে প্রকাশিত হয়। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করি–বাইবেলের সাঁওতালী অনুবাদ নিয়ে বেনাগাড়িয়া মিশনের সঙ্গে চার্চ মিশনারী সোসাইটির মতবিরোধ দেখা দেয়। C.M.S. মিশনের সাঁওতালী অনুবাদ স্ক্রেফসরুড সাহেবের পছন্দ না হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ জানান। পরে Calcutta Auxilliary Bible Society-র সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলে এবং ঠিক হয় যে, সমস্ত মিশন এবং চার্চের গ্রহণযোগ্য সাঁওতালী অনুবাদই প্রকাশিত হবে। ১৮৮৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি একটি কমিটি গঠন করা হয়, কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন রেভাঃ জে. ফিলিপ্স-এর ছেলে ড. জে. এল. ফিলিপ্স।** অন্যান্য সদস্যরা হলেন–এল. ও. স্ক্রেফসরুড, এ. ক্যাম্পবেল, জামতাড়া মিশনের এ. কর্ণেলিয়াস, বেথেল সানতাল মিশনের এ. আর. হায়গার্ট এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির তিনজন মিশনারী। কিন্তু কারণবশতঃ কাজ মাঝপথে আটকে থাকে। ১৯০৬ সালে রেভাঃ পি. ও. বোডিং বাইবেলের নতুন নিয়ম (New Testament) অনুবাদ করে শেষ করেন এবং স্ক্রেফস্রুড এবং বোডিং সেই অনুবাদ Calcutta Auxillary Bible Society-র কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান। ক্যাম্পবেল সাহেবের সুপারিশে বাইবেল সোসাইটি পি. ও. বোডিং-এঁর অনুবাদই প্রকাশ করে, অবশ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পরে একটি মিলিত অনুবাদ (union version) প্রকাশ করা হবে।***

---

* OLAV HODNE : The seed bore fruit

** OLAV HODNE : L. O. Skrefsrud Missionary and Social Reformer among the Santals of Santal Parganas.

*** Proceedings C.A.B.S. July 25, 1906, Calcutta.

এ পর্যন্ত যে সকল মিশনারীদের কথা উল্লেখ করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। সাঁওতালী অভিধান প্রণয়ন, ব্যাকরণ তৈরি, সাঁওতালী লোকসঙ্গীত, লোককথা সংগ্রহ ইত্যাদি মূল্যবান অবদান তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন, অবশ্য সাঁওতালদের সঙ্গে নিয়েই তাঁরা এ সব কাজ করে গেছেন। কিন্তু আরো কিছু মিশনারীর নাম পাওয়া যায় যাঁদের কাজ উল্লেখযোগ্য না হলেও সাঁওতালদের সাহিত্যচর্চায় যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত মিশনারী নিজেরা যেমন ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালী গান-কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি সাঁওতালদের গান-কবিতা রচনা করতে অবিরত উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদের সে সমস্ত গান-কবিতা 'পেড়া হড়', 'ঢারওয়াঃ' কিংবা বিভিন্ন গানের বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত মিশনারীদের কয়েকজনের নাম আমি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

রেভাঃ জন ব্লেইচ

জার্মান মিশনারী। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত চার্চ মিশনারী সোসাইটির হয়ে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করেন। সাঁওতালী ভাষা তিনি খুব ভালভাবে রপ্ত করেন। তাঁর রচিত বেশ কিছু গান 'সেরেঞ পুথি'তে মুদ্রিত আছে। জানা যায়, বাইবেলের নতুন নিয়ম (New Testament) খণ্ডটি সাঁওতালীতে অনুবাদ হওয়ার পর চার্চ মিশনারী সোসাইটির অনুবাদ এবং বেনাগাড়িয়া মিশনের অনুবাদ দুটি সংশোধন করে একটা নবরূপ দেওয়ার জন্য মুখ্য সংশোধনকারী (Chief Revisor) হিসাবে Calcutta Auxiliary Bible Society-তে তাঁর নামই প্রস্তাবিত হয়।*

রেভাঃ এডওয়ার্ড কর্ণেলিয়াস

সুইডেনের মিশনারী। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করেন। বহু সাঁওতালী গান তিনি রচনা করেন। বেনাগাড়িয়া মিশনে তিনি প্রথমে কাজ শুরু করেন, পরে তিনি জামতাড়ায় বদলী হন।

---

* Proceedings C.A.B.S. July 13, 1906

রেভাঃ জেমস ব্রাউন

ইংলণ্ডের মিশনারী। চার্চ মিশনারী সোসাইটিতে ১৮৬৮ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি সাঁওতালী ভাষা শেখেন এবং বেশ কিছু গানও রচনা করেন।

রেভাঃ ডেভিড মার্কাস ব্রাউন

ইংলণ্ডের মিশনারী। ইনিও চার্চ মিশনারী সোসাইটির হয়ে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করেন এবং সাঁওতালী ভাষা ভালভাবে রপ্ত করেন। তাঁর কিছু গান 'সেরেঞ পুঁথি'তে স্থান পেয়েছে।

রেভাঃ আলেকজাণ্ডার জেমস্ ডায়ার

স্কটল্যাণ্ডের মিশনারী। সাঁওতালদের মধ্যে তিনি ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। দীর্ঘ ৪৬ বছর সাঁওতালদের সংস্পর্শে থাকায় সাঁওতালী ভাষা তিনি ভালভাবে রপ্ত করেন। তাঁর রচিত একটা গানের চার লাইন এখানে তুলে ধরছি ঃ

রীস্কীঃ বাড়ে মারসাল
আকানা,
ঞিন্দী চাবায়েন বের্এ
রাকাপ্এনা।

অর্থাৎ–

'আনন্দ কর সকাল হয়েছে
রাত শেষ হল সূর্য উঠেছে।'

তিনি নিজেও যেমন বেশ কিছু রচনা করেছেন, সাঁওতালদেরও তেমন গান-কবিতা রচনা করার জন্য উৎসাহ দিতেন।

রেভাঃ এডওয়ার্ড সি. জনসন

ইংলণ্ডের মিশনারী এবং স্ক্রেফসরুড সাহেবের সমসাময়িক। ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি সিউড়ী, বেনাগাড়িয়া এবং জামতাড়ায় সাঁওতালদের

মধ্যে কাজ করেন। ব্যাপ্‌টিস্ট্‌ মিশন তাঁকে সিউড়ী অঞ্চলে কাজ করবার জন্য পাঠায় এবং সিউড়ীতে তিনি প্রথম কাজ শুরু করেন। পরে তাঁর সঙ্গে স্ক্রেফস্‌রুড সাহেবের পরিচয় হয় এবং তিনি বেনাগাড়িয়াতে আসেন। 'ছটরায় দেশমাঁঞ্জহি রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। একবার তিনি নাকি বাঘের মুখে পড়েন। তারপর জামতাড়া তাঁর কর্মস্থল হয়। তাঁর রচিত একটি নমুনা এখানে দিই ঃ

'আম বাড়্‌গেরে জুত বাহাক
মা যায়যুগ সাড় আকান
আর রিলামালা জিওয়েৎ দাঃ
আম রেগে আঁতুঃকান।'

অর্থাৎ–

'তোমার বাগানে সুন্দর ফুল
চিরদিনের জন্য ফুটেছে,
পরিষ্কার নির্মল জল
তোমার মধ্যে যে বয়ে চলেছে।'

রেভাঃ জেমস. এম. ম্যাক্‌ফায়েল

স্কটল্যাণ্ডের মিশনারী। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি বামদাতে ডাক্তারী করেন, সেই সূত্রে বহু সাঁওতালের সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং সাঁওতালী খুব ভাল বলতে পারতেন। অবসর সময়ে তিনি সাঁওতালী ভাষাচর্চা করতেন, তাঁর বেশ কিছু গান 'সেরেঞ পুথি'তে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হল ঃ

"সি কাতে মা বো য়েরেৎ
বেশ ইতা হাসারে
মেনখান ঈশ্বর এস্‌কারগে
অমন ওচোয়েদায় ;
উনি দাঃ আবোন কানায়
উনিআঃ ভর বেগরতে
সানাম আঁউড়িগেয়া।"

অর্থাৎ–

আমরা লাঙ্গল চালিয়ে বীজ বুনছি, কিন্তু ভগবান একাই অঙ্কুরিত করছেন, জল দিচ্ছেন রোদ দিচ্ছেন। তাঁর আশীর্বাদ না হলে সবই বৃথা।

রেভাঃ আলবার্ট রুডলফ আনের্স্ট হায়গার্ট

জার্মান মিশনারী। ১৮৭৩ সালে তিনি ব্যাপটিস্ট্ মিশনে যোগ দেন এবং সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করেন। জানা যায়, বাংলা হরফে তিনি একটি সাঁওতালী গানের বই প্রকাশ করেন। পরে তিনি বেথেল সানতাল মিশনে যোগ দেন। সাঁওতালী ভাষা তিনি ভাল বলতেন, তাঁর রচিত একটি গানের কয়েক লাইন নীচে দেওয়া হল ঃ

"আমাঃ দায়া দুলীড়রেগে
মনতিঞ খীতিরঃ,
নাসে পাঁতিয়াঁউ ওচোগ্ তিঞ মে
নেঁহরাম কানাঞ।

আম ঠেনগে এসকার আশঃকানাঞ
আমগে ভরসাতিঞ্
মনরে আঁডিঞ ভাবনাঃকানা
দে বাঞচাও ইঞ মে।"*

অর্থাৎ–

তোমার দয়া-ভালবাসায়
মন যে আমার ভরে যায়।
একটুখানি বিশ্বাস বাড়াও
করছি শুধু মিনতি॥

তোমার কাছে আশা করি
তুমিই শুধু ভরসা।
মন যে আমার খুবই ব্যাকুল
আমায় বাঁচাও সহসা॥

যাই হোক, আজ অস্বীকার করা যায় না যে, এই সমস্ত মিশনারী খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে এসে সাঁওতালী ভাষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং

* সেরেঞ পুথি, পৃ-৩১৬

তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় সাঁওতালী ভাষা-সাহিত্য চর্চাতেই ব্যয় করেছিলেন। তা না হলে হয়তো সাঁওতালী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করা বোধহয় আজও সম্ভব হত না।

সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মিশনারীদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হল। এ সকল মিশনারীদের কাজ সত্যিই প্রশংসনীয় ; বিশেষ করে রেভাঃ পি. ও. বোডিং যে বিপুল পরিমাণ কাজ করে গেছেন, তার পরিমাপ করাই সুকঠিন। ১৮৯০ সালে তিনি নরওয়ে থেকে ভারতে আসেন এবং ১৯৩৪ সালে স্বদেশে ফিরে যান। এই দীর্ঘ ৪৪ বছর তিনি সাঁওতালী ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-কলা, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণামূলক বহু মূল্যবান কাজ করেছেন। দুই খণ্ডে সাঁওতালী ব্যাকরণ, পাঁচ খণ্ডে সাঁওতালী অভিধান, তিন খণ্ডে ইংরাজী অনুবাদসহ সাঁওতালী লোককথা এবং সমগ্র বাইবেল সাঁওতালীতে অনুবাদ করে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

এমন কি, দেশে ফিরে গিয়েও তিনি এ কাজ বন্ধ করেন নি। তিনি তাঁর সংগৃহীত সমস্ত তথ্য, সাঁওতালদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নরওয়েতে নিয়ে যান সযত্নে অস্‌লো ইউনিভারসিটির সংগ্রহশালায় রেখে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তার পেছনে সময় ব্যয় করে গেছেন। তাঁর অপ্রকাশিত কাগজপত্র যেন নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য সেগুলি মাইক্রোফিল্‌ম্ করে রাখা আছে। কিছুদিন পূর্বে ডেনমার্কের ড. পিটার অ্যাণ্ডারসন সাঁওতালী ভাষা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন এবং নিজেই তিনি মেদিনীপুর এবং সাঁওতাল পরগণার গ্রামগুলিতে ঘোরাঘুরি করেন।

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি যে, তিনি সাঁওতালী ভাষা নিজের দেশেই শিখেছিলেন। ড. অ্যাণ্ডারসন ডেনমার্ক কোপেনহেগেন ইউনিভাসিটির অধ্যাপক এবং তিনি নরওয়ের অস্‌লো ইউনিভারসিটিতে সাঁওতালী ভাষা শিখেছিলেন। সাঁওতালী ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে সাঁওতাল ছেলে-মেয়েদের কেন আকৃষ্ট করতে পারছে না, সেই নিয়ে গবেষণার জন্যই তিনি এ দেশে এসেছিলেন।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে সাঁওতালী অভিধান ৩য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড ও ৫ম খণ্ড বোডিং সাহেব নরওয়েতে ফিরে গিয়ে সংকলন করেছেন। অবশ্য স্ক্রেফস্‌রুড সাহেব বোডিং সাহেবকে অভিধান সংকলনের ব্যাপারে বহুল ভাবে সাহায্য করেছেন, তিনি তাঁর সংগৃহীত ১৩০০০ শব্দতালিকা বোডিং সাহেবকে দেন। গভীর নিষ্ঠার

সঙ্গে তিনি এ কাজ করে গেছেন। সাঁওতালী ভাষা-সাহিত্যের জন্য তিনি যে পরিমাণ কাজ করে গেছেন সে পরিমাণ কাজ আর কোন মিশনারীই এ যাবৎ করতে পারেননি। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যবিকাশে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা।

বোডিং সাহেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল পাঁচ খণ্ডে সাঁওতালী অভিধান প্রণয়ন। এ কাজের জন্য তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্রতিটি শব্দের সঠিক অর্থ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সাঁওতালের সাহায্য নিতে হয়েছিল, এমন কি এক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত সাঁওতালদের সাহায্য নিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। এই ব্যক্তির নাম মঙ্গল হাঁসদা। তিনি 'তালে মঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন এবং সাঁওতালী ভাষার ওপর তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল।

সাঁওতাল মহিলাদের সাহায্যও তিনি নিয়েছিলেন। আমরা জানি, সাঁওতালী ভাষায় এমন কিছু কিছু শব্দ আছে, যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন–'দুড়ুপ্' (বাংলায়-বসা) শব্দটি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, পশু-পাখিদের ক্ষেত্রে এ শব্দটি মোটেই ব্যবহৃত হয় না, পশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'বুরুম' এবং পাখিদের ক্ষেত্রে 'আপ্' শব্দ। খাওয়ার ক্ষেত্রেও সে রকম পার্থক্য দেখা যায়। যেমন– তরল পদার্থ হলে 'ঞু' এবং শক্ত পদার্থ হলে 'জম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। সে রকম এমন কিছু কিছু শব্দ আছে যা মহিলাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বা মহিলারাই শব্দটি সাধারণত প্রয়োগ করে থাকে।

যেমন–'এগের' (বকুনি বা গালি দেওয়া) কথাটি মহিলাদের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। পুরুষের বেলায় 'রুহেৎ' কথাটি ব্যবহৃত হয়। সে রকম কাউকেও সম্বোধন করে কথা বলার সময় মেয়েরা 'না' কথাটি যুক্ত করে কথা বলে থাকে। যেমন- - 'এ না, চল সে পাতা ঞেল তেহেঞ দ।'

ছেলেরা এটি পারে না ; যেমন–"এ হো, অকা খনেম হিজুঃকানা ?" এজন্যই বোডিং সাহেব যোসেফ মুর্মুর মা সোনা মুর্মুর সাহায্য নিয়েছিলেন।

যাই হোক– বোডিং সাহেবের অভিধান প্রণয়নে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁরা হলেন–বিরাম হাঁসদা, মঙ্গল হাঁসদা (তালে মঙ্গল), সাগরাম মুর্মু, মোহন হেমব্রম, সিদো মুর্মু, গুনা হাঁসদা (বিরাম হাঁসদার পুত্র), চুনুহ হাঁসদা (তালে মঙ্গলের ভাই), গোপীনাথ কিস্কু, বারিয়াড় কিস্কু, জেঠা মুর্মু, কাঁদন সরেন, যোসেফ মুর্মু (টাইপিস্ট) আর সোনা মুর্মু (যোসেফ মুর্মুর মা)।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বচেষ্টায় লিখিত সাহিত্যের সূচনা

সর্বপ্রথম বিদেশী মিশনারীরাই সাঁওতালী ভাষাচর্চার বনিয়াদ স্থাপন করে যান। তাঁদের এ কাজ সাঁওতাল সমাজ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। যীশুখৃষ্টের বাণী প্রচারকল্পেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাতে ও মুদ্রণশিল্পেও তো তেমনই মিশনারীদের প্রচেষ্টা কেউ আজ অস্বীকার করতে সক্ষম নয়। তেমনই অনস্বীকৃত আদিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করাই ছিল মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যায় যে, সাঁওতালী ভাষা শিখতে গিয়ে মিশনারীদের কয়েকজন এ ভাষার, প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সাঁওতালী ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ অর্থাৎ এ ভাষায় প্রচলিত গান ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালী, লোককথা ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়ে তাঁরা এমনই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, ঐ সব মৌখিক সাহিত্য সাগ্রহে সংগ্রহ ও ভাষাচর্চাই তাঁদের কাছে বড় আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাঁরা যেন ধর্মপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য থেকে সাঁওতালী ভাষাচর্চার দিকেই বেশী মন দেন। এ কাজে মিশনারীদের মধ্যে রেভাঃ জে. ফিলিপস্, রেভাঃ এল. ও. স্ক্রেফসরুড, রেভাঃ ই. এল. পুক্স্‌লি, রেভাঃ এ. ক্যাম্পবেল এবং রেভাঃ পি. ও. বোডিং এর নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করতে হয়।

মিশনারীদের উৎসাহে বেশ কিছু সাঁওতাল ছেলে সেদিন সাঁওতালীতে গান, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। 'হড় হপনরেন পেড়া' নামক পত্রিকায় তাদের লেখা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাটি ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত বেনাগাড়িয়া মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে চৌদ্দ বছর প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় সেটা ক্ষোভের সঙ্গে জানাতে হয়। পরে ১৯২২ সাল থেকে আবার পত্রিকাটি 'পেড়া হড়' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং আজ অবধি পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 'হড় হপনরেন পেড়া' এবং 'পেড়া হড়' পত্রিকার প্রথমাবস্থায় যাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন–বেঞ্জামিন বাবুরাম সরেন (হাজারিবাগের ডুমুরিয়া গ্রামে জন্ম ১৮৬৪), নুকা মারাণ্ডি (বেনাগাড়িয়ায় জন্ম ১৮৬৬), বারিয়াড় সরেন (নানকারে ঝুনকি গ্রামে জন্ম ১৮৭১), জালপা সরেন (নানকারে বাংকিজোড় গ্রামে জন্ম ১৮৭৫), শিমোন বাস্কে (কায়রাবনী স্কুলের শিক্ষক, জন্ম ১৮৮৭), যাকোব সরেন

(বেনাগাড়িয়াতে জন্ম ১৮৩৯), শমূয়েল কিস্কু (বামদা মিশন কর্মচারী জন্ম ১৮৮৬), এবং যোসেফ হাঁসদা (পোখুরিয়া গ্রামে জন্ম ১৮৯৮)। এই সব লেখকের বহু লেখা 'হড় হপনরেন পেড়া' 'ঢারওয়াঃ' এবং 'পেড়া হড়' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

সাঁওতালী সাহিত্যসৃষ্টির সূচনা পর্বে লেখকদের মধ্যে বাবুরাম বেঞ্জামিন সরেন এবং যাকোব সরেনের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বাবুরাম সরেন ক্যাম্পবেল সাহেবের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সাঁওতালী গান, ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি নিজেও 'বুদ্গীরিয়া' ও 'দিলগীরিয়া' নামে দুটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক লেখেন। এ দুটি পুস্তকে তাঁর অনেকগুলি উন্নত মানের কবিতা স্থান পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে 'পরায়নি' 'বাড়ে দারে' 'সেতাক্ কয়জং' এবং 'গুপি কড়া'। বহু মূল্যবান প্রবন্ধও এই দুটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য--হয় মাঁইলাঃকান রেয়াঃ, আতো মাঁঝি, খবর কাগজ, ধাঁরতি রেয়াঃ রেয়াড় আর লল, চাষ-বাস, নাহাক্ যুগ রেয়াঃ আতো , জালাপুরি, ১৯১৭ সাল রেয়াঃ ডুবা ও পুথি পাড়হাও। এখানে একটা বিষয় ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য লাগবে যে, আজ আমরা যে পরিবেশ দূষণ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছি, তার সম্পর্কে ৭০/৮০ বছর পূর্বেই তিনি চিন্তা করে 'হয় মাঁইলাঃকান রেয়াঃ' (বায়ু দূষণ) প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৩০ সালে বেঞ্জামিন বাবুরাম সরেনের মৃত্যু হয়।

ঐ সময়ে একজন শিশু সাহিত্যিকের নাম আমরা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করছি, তিনি হলেন যাকোব ও. সরেন 'পেড়া হড়' পত্রিকায় তাঁর কবিতা, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হত। তিনি শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লেখেন, সেগুলি হল--বুজ রাকাপ (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড) আঁকিল দুওয়াঁর (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড), আঁকিল ডাহার (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হল--সেতাক্ পায়ার, বাহা, মাঃনাও, রহড় সাকাম, জীপুৎ দিন, সেতোং দিন, ইপিল, সিম সাঁড়ি, পুসি, দুলাঁড় গাতিঞ, শিখাউনা, আর চেহাও। আর ছোট গল্প হল--সেতা, সিম সাঁড়ি আর তোয়ো, হাঁড়ুআঃ বুদ, হুকুম বাতাও, কুলাই আর তোয়ো, হাড়গার আর ভিডি হপন, হাঁড়ু আর বার্য়া পুসি, শুকরি আর ধাচরি কুল, তওয়ারে চাডোলেন চুটিয়া, হড়, সাদম আর তোয়ো, বোগে গুপি কড়া, বেপারী আর তারুপ, বার্য়া গাতে কড়া আর বানা, স্যার ফিলিপ সিডনি, মিৎটেন কুড়িআঃ এঙ্গাত মায়া এবং মিৎটেন গিদরী আর বার্ আপা-হন। ছোট

ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী তিনি কতিপয় ঐ ধরনের প্রবন্ধও লেখেন, সেগুলির মধ্যে আছে–কাসকম সুতাম, হড়মো, লুমাম আঁসুল, রুক্-বিরিত্ আর চৌকিদার।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট্ ফরেন মিশন সোসাইটি ১৮৬৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলা হরপে 'মেদিনীপুর সেরেঞ পুঁথি' প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে শহরের আশেপাশে বিশেষ করে কুইকোঠা, কেরানীচটি, আবাসগড়, নীলডাঙ্গা ও ডাঙ্গরপাড়ায় বহু সাঁওতালের বাস ছিল। মিশনারীরা এ সমস্ত জায়গায় নিয়মিত ধর্ম প্রচার করতে যেতেন। মেদিনীপুরেই ছিল মিশনের প্রধান কার্যালয়। আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট্ মিশন যে সময়ে মেদিনীপুর জেলায় কাজ শুরু করেন, সে সময়ে কয়েকজন সুযোগ্য আদিবাসী দরদী মিশনারী এ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁরা হলেন–রেভাঃ জে. ফিলিপস্, রেভাঃ টি বারখোলডার, রেভাঃ মার্‌ফি, রেভাঃ জি. কেনান এবং রেভাঃ এল. সি. কিচেন। তাঁদের নাম আজও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। তাঁরা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকেই তাঁদের কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং সাঁওতালদের মধ্যেই মুখ্যত কাজ করেছিলেন। সাঁওতাল বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতে তাঁরা কোনরকম সঙ্কোচবোধ করতেন না। সে সময়ে ঐ সমস্ত অঞ্চল ছিল বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ, যাতায়াতের ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ঘোড়াই ছিল তাঁদের একমাত্র বাহন। যাতায়াতের তাদের যথেষ্ট অসুবিধা বেশ হচ্ছিল, তাই তাঁদের উদ্যোগে ভীমপুর গ্রামে মিশন স্থাপিত হয় ১৮৭০ সালে এবং সেখানে পরে সাঁওতাল ছেলেদের জন্য একটি হাইস্কুল এবং মেয়েদের জন্য এখটি এম. ই. স্কুল খোলা হয়। শুধু তাই নয়, সাঁওতাল ছেলে ও মেয়েদের থাকার জন্য হোস্টেলও তৈরী হয়।

অবিভক্ত বাঙ্গলায় একমাত্র এই হাইস্কুলেই নিয়মিত সাঁওতালী পড়ানো হত এবং ছেলেরা সাঁওতালী ভাষা নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারত। যে সমস্ত শিক্ষক সাঁওতালী পড়াতেন তাঁরা হলেন প্রিয়নাথ বাস্কে, পদ্মলোচন মাণ্ডি, পরাণচন্দ্র টুডু এবং রামচাঁদ মাণ্ডি। চল্লিশ দশকে যাঁরা ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুলে সাঁওতালী নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী জীবনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরি করেছেন কিংবা শিক্ষকতা করে গিয়েছেন তাঁদের কিছু নাম এখানে উল্লেখ করছি–ডাঃ চিনিবাস মুর্মু, অর্জুন বাস্কে, রমেশচন্দ্র হেমব্রম, দুখীরাম মুর্মু, জয়রাম টুডু, গোরাচাঁদ মুর্মু,

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, বিক্রম হাঁসদাঃ, কালাচাঁদ সরেন, কৈলাশচন্দ্র হাঁসদাঃ, দুলালচন্দ্র মুর্মু, বিনোদবিহারী মুর্মু, নৃপেন্দ্রনাথ বাস্কে, চিত্তরঞ্জন মুর্মু, দীনবন্ধু সরেন, কিশুন হেমব্রম প্রভৃতি। এ সঙ্গে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করতে হয়, ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুলের যে ম্যাগাজিন বের হত, তাতে সাঁওতাল ছেলেদের রচিত কবিতা ও ছোট গল্পও প্রকাশিত হত। এছাড়া স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাঁওতালী নাটক অভিনীত হত। শিলদা-বেলপাহাড়ী এবং সিংভূমের দামপাড়া অঞ্চলের সাঁওতাল ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের সাঁওতালী নৃত্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে দিত।

সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুলের বিরাট ভূমিকা যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাঁওতাল সমাজের অনেক সুসন্তান এই স্কুল থেকে বের হয়েছেন। অবশ্য তখন এই স্কুল হাইস্কুলে পরিণত হয়নি। এই স্কুলে শিক্ষালাভ করে যাঁরা সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তাঁরা হলেন–মনসারাম মাণ্ডি (কুঁড়চিবনী), সাধু রামচাঁদ মুর্মু, নবীন সরেন (কামারবান্দি), কার্মু হাঁসদা, নায়কে মঙ্গল চন্দ্র সরেন (শিলদা-বিনপুর অঞ্চল) রতন সরেন, যুগল হেমব্রম, গোবিন্দ মুর্মু (চৈনিশোল-নয়াগ্রাম অঞ্চল) লস্কর টুডু (গোয়ালতোড় অঞ্চল) এবং শ্যামচরণ মুর্মু, লক্ষ্মীরাম হেমব্রম, ক্ষুদিরাম মুর্মু, প্রিয়নাথ বাস্কে, বৈদ্যনাথ মাণ্ডি, সুশীল হাঁসদা (রামগড়-লালগড়) অঞ্চল। আমি এখানে শুধুমাত্র সাঁওতাল ছাত্রদের নামই উল্লেখ করলাম, সাঁওতাল ন'ন এমন ছাত্রদের নাম আর উল্লেখ করলাম না।

ভীমপুর মিশন স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজ, তাঁত বোনার কাজ, ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, প্রভৃতি নানারকম বৃত্তিমূলক কাজও শেখানো হত। উদ্দেশ্য যেন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে এই সব বৃত্তিশিক্ষা কাজে লাগে। কৃষিকাজ শেখানোর জন্য মিশনে ভাল ভাল গরু ছিল। সে সময়ে মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানীর দাপট ছিল খুব বেশি। অনেক সময়ে সুযোগ পেলেই জমিদার কোম্পানীর লোকজন মিশনের সেই সব পোষা গরু জোর করে ধরে নিয়ে যেত। পরে সে গরুর আর কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। এরকম ঘটনা নিয়ে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে জমিদার কোম্পানীর লোকজনের প্রায়ই মারপিট হত। সেদিনের মিশনারীরা কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে যীশুর প্রেমের বাণী আর অনুসরণ করতে বলতেন না। বরং তাঁরা ছেলেদের বলতেন–"তোমরা মার দিয়ে আসবে, কিন্তু কখনও মার খেয়ে ফিরবে না।"

সে সময়কার আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হয়। যদিও এখানে অপ্রাসংগিক বলে মনে হতে পারে, তবুও ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে উল্লেখ না করে থাকা যাচ্ছে না। ভীমপুরে মিশন প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ঘটনাটি ঘটে। ভীমপুরের পশ্চিমদিকে ছিল আরো গভীর জঙ্গল, সে জঙ্গল ছিল লালগড়-রামগড় পর্যন্ত। এ জঙ্গলের ভিতর দিয়েই মিশনারীরা হাঁড়োল, কাঁটাপাহাড়ী, লালগাড়িয়া-বনপুখুরিয়া গ্রাম পর্যন্ত প্রচার করতে যেতেন। এ অঞ্চলটাতেই সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বেশীর ভাগ বাস করত। রেভাঃ জর্জ কেনান নামক এক মিশনারী আসেন ভীমপুরে। তিনি শিকার করতে খুব ভালবাসতেন এবং অনেক সময়ে একাই শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। একবার শিকার করতে গিয়ে তিনি এক নেকড়ে বাঘিনী পালিতা ১২-১৩ বছরের মেয়েকে উদ্ধার করেন ; মেয়েটি ছিল হিংস্র এবং কথা বলতে পর্যন্ত পারত না। জন্তুদের মতই চার পায়ে হাঁটত, কাঁচা মাংস ছাড়া কিছু খেত না। তাই তাকে জ্যান্ত মুরগি ছুঁড়ে খাওয়ানো হত। মিশনারীরা কিছুতেই তাকে বশে আনতে পারেনি। সব সময়ে তাকে খাঁচার মধ্যে আটকে রাখা হত। মেয়েটিকে অবশ্য বাঁচানো যায়নি, মেয়েটি অকালেই মারা যায়।

যাই হোক, আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ভীমপুরে মিশন স্থাপিত হওয়ার পর মিশনারীরা সাঁওতালী গানের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী করে অনুভব করতে লাগলেন। সাঁওতালী গান শোনাতে পারলে অনায়াসে অল্প সময়ে বহু লোক জমায়েত করা যায়। তাই তাঁরা সাঁওতালী গানের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ঐ 'মেদিনীপুর সেরেঞ পুঁথি' বাংলা হরপেই মুদ্রিত হয়। যতদূর সম্ভব বাংলা হরপে মুদ্রিত সর্বপ্রথম সাঁওতালী গানের বই এটাই এবং বলতে বাধা নেই যে, সে সময়কার খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী অল্পশিক্ষিত সাঁওতালদের রচিত গানই এতে স্থান পেয়েছিল। দুটি মৌলিক কারণেই তা সম্ভব হয়েছিল।

প্রথমতঃ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় এই সাঁওতালরা সহজেই মিশনারীদের সুনজরে এসেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, মিশনারীরাও এই সব সাঁওতালদের গান রচনায় সবিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালে সাঁওতাল সমাজে শিক্ষিত জনের সংখ্যা ছিল না বললেই হয়। মিশনারীরা সবে তখন তাদের মধ্যে কাজ শুরু করেছেন আর ঐ সময়েই এই গানের বইটি প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এই গানের বইটির গুরুত্ব কম নয় ! যে সব গান এ সময়ে রচিত হয়েছিল সে সব গানের ছন্দ ও অন্ত্যমিল

কতখানি সফলতা অর্জন করেছিল তা ভাববার বিষয় হতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় রচিত সকল লোকসঙ্গীতের শব্দাবলীই কমবেশী গ্রাম্যতা দোষবিশিষ্ট আর তাইতো স্বাভাবিক। লোকচলিত বলেই সেগুলি লোক সঙ্গীত। তবে এটুকু বলা যায়, পরবর্তীকালে বিভিন্ন মিশনের সমবেত প্রচেষ্টায় যে সাঁওতালী গানের বই প্রকাশিত হয় তাতে 'মেদিনীপুর সেরেঞ পুঁথি' থেকে বেশ কিছু গান নেওয়া হয়।

এরপর ১৮৯৫ সালে মাঝি রামদাস টুডুর 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি' প্রকাশিত হয়। এটা একটা মূল্যবান পুস্তক এবং বাংলা হরফে মুদ্রিত। সাঁওতালরা এ সময় হয়তো 'খেরওয়াল' নামেই বেশী পরিচিত ছিল, তাই মাঝি রামদাস টুডু পুস্তকটির এরকম বিচিত্র নাম রাখেন। সাঁওতাল সমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতি তিনি এই পুস্তকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। এ পর্যন্ত পুস্তকটির তিনটি সংস্করণ বের হয়েছে, প্রথম সংস্করণ ১৮৯৫ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫১ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৮ সালে। প্রথম সংস্করণটি আমার দেখার সুযোগ হয়নি, তাই প্রথম সংস্করণে ছবি ছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। পুস্তকটি তখন ৬৮ পৃষ্ঠার ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন তাতে কিছু দেব-দেবী ও আচার-অনুষ্ঠানের ছবিও ছাপা হয়। তবে দেব-দেবী ছাড়া অন্য যে সব ছবি ছাপা হয়েছে সেগুলির সঙ্গে আদিবাসী আকৃতির বিশেষ মিল পাওয়া যায় না। এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, মাঝি রামদাস টুডু নিজের প্রচেষ্টায় এ রকম এক মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, যা সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। স্পষ্টত ছবিগুলি হয়তো সাঁওতালী সমাজের কেউ আঁকেন নি।

১৯১৭ সালে রেভাঃ পি. ও. বোডিং-এর প্রচেষ্টায় "ছটরায় দেশমাঁঞ্জহি রেয়াঃ কাথা" নামে একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি লেখেন রায়া সরেন এবং বিষয়বস্তু বলে যান ছটরায় দেশমাঁঞ্জহি। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাবলী এবং আসামে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের এটি এক মূল্যবান নিদর্শনী। ছটরায় বেনাগাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু বিদ্রোহের পরে তিনি আসামে চলে যান। আসামে সাঁওতাল কলোনী গড়ে ওঠার পর তিনি সেখানের দেশমাঁঝিরূপে বহাল হন। তাঁরই স্মৃতিকথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ। এই পুস্তকটি রোমান হরফে মুদ্রিত।

এরপর ১৯২৭ সালে 'বাহা সেরেঞ' নামে একটি গানের বই প্রকাশিত হয়। বাহা সাঁওতালদের ধর্মীয় উৎসব এবং এ সময়ে দেব-দেবী এবং প্রকৃতির

বন্দনা করে বলাবাহুল্য সুন্দর গান গাওয়া হয়। অবিভক্ত বাঙ্গলা দেশের বগুড়া জেলার চারুচন্দ্র সিদুপ সরেন সে সমস্ত গান সংগ্রহ করে এই গানের বইটি প্রকাশ করেন। এস সময়ে খৃষ্টান মিশনের মত হিন্দু মিশনও সাঁওতালদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই হিন্দু মিশনের প্রচেষ্টায় বাংলা হরফে এই 'বাহা সেরেঞ পুথি' প্রকাশিত হয়। খৃষ্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের খৃষ্টধর্মে সাদরে দীক্ষা দিচ্ছেন, এরই প্রতিবাদে সে যুগে হিন্দু মিশনও সাগ্রহে তাঁদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিলেন বল মনে হয়। যাই হোক, তাঁরাও বহু কাজ করেছেন। ঐ বছরই হিন্দু মিশন আবার 'গানের পুঁথি' নামে চারুচন্দ্র সিদুপ সরেনের আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। জানা যায়, চারুচন্দ্র সিদুপ সরেন 'বাহা রাসা' এবং 'পুরাণ কাহনি' নামে দুটি বই লেখেন কিন্তু এ দুটি বই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য না পাওয়ায় আর এ নিয়ে মন্তব্য করা গেল না।

এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারের উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। সম্পতি আদিবাসীদের জোর করে খৃষ্টান করা হয়েছিল বলে একটি অলীক যুক্তির অবতারণা করে 'হিন্দু মিশন' ও ঐ শ্রেণীর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পুনরায় ধর্মান্তরিত করতে ব্যগ্র হয়েছে। ধরে নেওয়া গেল তারা হিন্দু হল, কিন্তু জাতগোষ্ঠী কুলশীল বিচারে তাদের এখন স্থান হবে কোথায় ?

মনে রাখতে হবে খৃষ্টান মিশনারীরা সেদিন যদি তাদের হাত সাদর আলোক উজ্জ্বল, বাতাস সুশীতল প্রশস্ত জঙ্গলের জীর্ণ কুটির থেকে না নিয়ে আসতেন তাদের কি দশা হত ? একমাত্র মুসলমানরা যুগপৎ লোভ ও ভয় দেখিয়ে দলে দলে নিম্নবর্গীয় হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। কিন্তু কোনদিন কোন আদিবাসীকে সহজে মুসলমান করতে পারে নি। কই সেই ধর্মান্তরিত মুসলমানকে পুনরায় ধ্বজাধারীদের হিন্দুত্বে আনয়নের প্রচেষ্টা ? কুসংস্কারে অন্ধ আদিবাসীদের শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞানপ্রদীপে উজ্জ্বল করে মিশনারীরা সঠিক পথনির্দেশেই শুধুমাত্র করেছিলেন। জোর করে খৃষ্টান তাঁরা কোনদিনই বোধহয় করেননি। মনে রাখতে হবে মুসলমানদের মতো এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে নয়, সুসভ্য মিশনারীরা বাইবেল হাতে নয়, এক হাতে প্রদীপ ও অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে নয়, সুসভ্য মিশনারীরা বাইবেল হাতে নয়, এক হাতে প্রদীপ ও অন্য হাতে রোগ নিরাময়ের বাক্স নিয়ে তাঁরা তাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আর তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অহরহঃ অপমানের বদলে এই স্নেহাশিস সাদরে মাথায় তুলে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় সেদিন—

"সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥"

তবে আজ তারা সগর্বে সতেজে মস্তক উন্নত রেখে অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সেই জ্ঞানলোকের উজ্জ্বল ভাতিতে।

এইভাবে সরল সহজ আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস নিয়েই থাকত এবং বৃহৎ সমাজের একাংশ এখনও আছে। তারা কোনদিনই হিন্দু ধর্মের পরিধির মধ্যে ছিলও না। তারা মন্দিরে পূজোও করে না কিংবা ধর্ম ও দেবতার কাছে পূজো দেওয়া নিয়ে কখনও ব্যবসাও করে না। বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল পিছিয়ে পড়া বনজঙ্গলে বসতকারী তথাকথিত অসভ্যদের মধ্যে আজীবন কাজ করে তাদের সুসভ্য সংস্কৃতিসম্পন্ন মানবে পরিণত করেছেন ঐ তথাকথিত ধর্মান্তরকারী খৃষ্টান মিশনারীরা। যুগ যুগ ধরে ভারতের সভ্যতা দ্রুত অগ্রসর হলেও সেই সর্বপ্রকারে বঞ্চিত অনাদৃত আদিবাসীরা জঙ্গলেই পড়েছিল, তাদের জন্যে রাজকুল, সমাজবিদ কেউ তো কোনদিন এগিয়ে আসেনি। অবশ্য বিদ্যাসাগরের কথা স্বতন্ত্র ; শহরের শিক্ষিত ভদ্রসমাজের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে তিনি দূরে সাঁওতাল পরগণায় কার্মাটারে আদিবাসী সমাজেই আশ্রয় নিয়েছিলেন, চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের শেষদিন পর্যন্ত সেবা করে গিয়েছেন।

১৯৩০ সালে 'সানতাল পারগানা, সানতাল আর পাহাড়িয়াকোওয়া ইতিহাস' নামে আর একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়। এটি লেখেন সাঁওতাল পরগণার তালঝারি মিশনের এক পাদ্রী চৈতন্য হেমব্রম কুমার। সাঁওতাল পরগণার ভৌগোলিক পরিচয়, সাঁওতালী পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব, সাঁওতাল সমাজের জন্মানুষ্ঠান থেকে মৃত্যু ও সৎকার পর্যন্ত যাবতীয় কার্যকলাপ, রীতি-নীতি, সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনা এবং সিধু-কানুর সংগ্রাম, পাহাড়িয়াদের পরিচয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পুস্তিকাটি লেখা। বেনাগাড়িয়া মিশন প্রেসে রোমান হরফে পুস্তকটি মুদ্রিত হয়। এটিও একটি ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ।

চৈতন্য হেমব্রম কুমারের রচিত একটি গানও নীচে দেওয়া হল :

গুজুঃ দিন দ দারাকানা
সেটেরঃআ ডীকু লেকা
হায়রে হায়রে !

আমাঃ হড়মো নাসাওঃতামা
মঞ্জ্ মুঠান আদঃআ
হাসারেগে মিলাউঃআ
ধাঁর্তি বাঁউাই অনে বয়হা
মিছাগেয়া॥

অড়াঃ দুওয়াঁর দারা হারা
আচেল পাচেল মেনাঃতামা
হায়রে হায়রে !
গুজুঃ ঘুড়ি সেটেরঃআ
মায়া জালা ছাড়াওঃআ
সানামঃএম বাঁগিগে
ধাঁর্তি ধন দ অনে বয়হা
মিছাগেয়া॥

এঙ্গা আপা ভায়াদিকো
এরা-হপন পেড়াতামকো
হায়রে হায়রে !
আটেৎ বেড়হায় কাঁউয়া রাঁউয়া
মিছা তাঁপিএঃআকো
বাংগেম সঁগে তরাকো
ধাঁর্তি বয়হা অনে বয়হা
মিছাগেয়া॥

উনরে এঁংৎকো বেঙ্গেদগেয়া
মায়া জালাগেকো রাগা
হায়রে হায়রে !
হড়মো খাএচা নিগুনঃআ
জিউয়ি মিরুই উডাওঃআ
ধাঁর্তি খনে ফারকাওঃআ
ধাঁর্তি বয়হা অনে বয়হা
মিছাগেয়া॥

বাংলায় গানটির অনুবাদ—

শেষের দিন এগিয়ে আসে
আসে চোরের মত,
হায়রে হায় !
শরীর তোমার নষ্ট হবে,
সুঠাম চেহারা হারিয়ে যাবে,
মাটিতে দেহ মিলাবে,
জীবনের অহঙ্কার ঐ তো ভাই,
মিছাই শুধু !!
জমকালো বাড়ী-ঘর
এদিক-ওদিক আছে তোমার,
হায়রে হায় !
মৃত্যু ডাক হাজির হলে
মায়া ডোর কেটে যাবে,
সমস্ত কিছু হারাবে তখন
জাগতিক সম্পদ যে ভাই
মিছাই শুধু॥

মা-বাবা আত্মীয়স্বজন,
স্ত্রী-পুত্র কুটুম-বাটুম,
হায়রে হায় !
ঘেরা সীমানায় চেঁচামেচি,
মিছাই করো ঝগড়াঝাঁটি,
পারবে নাকো সাথে নিতে
পৃথিবীটা তাই তো ভাই,
মিছাই শুধু॥

অন্ধকার দেখে যখন
মায়ায় পড়ে কাঁদে তখন
হায়রে হায় !
শরীররূপী খাঁচা খালি হল
প্রাণপাখি যে উড়ে গেল,

পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল,
পৃথিবীটা তাই তো ভাই
মিছাই শুধু !!

১৯৩৫ সালে সাঁওতাল পরগণার পোখুরিয়া গ্রামের যোসেফ হাঁসদা তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় একটি গানের বই প্রকাশ করেন। এই গানের বইটির নাম 'গাতে দল'। তাঁর এ ধরণের কাজ রীতিমত প্রশংসনীয়।

এই তিরিশ দশকেই আর এক শক্তিশালী সাঁওতাল কবির আবির্ভাব ঘটে, তাঁর নাম পাউল জুঝীর সরেন। সাধারণত দেখা যায়, সাঁওতালদের গান ও কবিতার প্রতি আকর্ষণ যেন একটু বেশি, পথে যেতে যেতেই সাঁওতাল ছেলেমেয়ে গান রচনা করে যায়। সেটাকে কিন্তু আর পরে মনে রাখার চেষ্টাও করে না, ফলে অনেক সময় এগুলি স্বতই হারিয়ে যায়। কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। পাউল জুঝীর সর্বপ্রথম তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতা বইয়ের আকারে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন। তাঁর কবিতা গ্রন্থটির নাম 'বাহা ডালওয়াঃ'। ১৯৩৫ সালে রোমান লিপিতে এটি মুদ্রিত হয়। কবি হিসাবে তিনি সে সময় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর একটি কবিতার নমুনা নীচে দেওয়া হল ঃ

সেতাঃক্

কুক্‌ড়ুচুং ! দেসে বেরেৎ পে !
সাঁগ্তি সিম কলে খন কিসনি দারে খন
হঃহকান এ্যাএ্যামকান, দেসে বেরেৎ পে।
কুক্‌ড়ুচুং ! দেসে বেরেৎ পে !
সিঞ্‌ মা ভোর কাঁমিজং বারাঙে মা বারাঙ
দারায়কান সিঞরাজ দেসে বেরেৎ পে !
কুক্‌ড়ুচুং ! দেসে বেরেৎ পে !
চেঁড়ে মা হো চিপরুৎ, কাঁহু মা হো কুঁড়িৎ
পাসনাওয়েন চারিয়া কোণ্ড্ দেসে বেরেৎ পে।
কুক্‌ড়ুচুং ! দেসে বেরেৎ পে !
সিরজন মা চেঠায়েন দান্ধারে ধুরাউয়েন
কুড়হিয়া মন চেদাঃ হো ? দেসে বেরেৎ পে।
কুক্‌ড়ুচুং ! দেসে বেরেৎ পে !

বেরেৎপে ফারনাওঃ পে, কাঁমিজং এহবপে
আঁকিল হর পাঁজায়রে দেসে বেরেৎ পে।

কুক্‌ড়ুচুৎ ! দেসে বেরেৎ পে !
মান্‌ওয়া হো বাপে চেকাতে বুজ বাপে
লাহা স্যেচ্ মহগুাঃরে দেসে বেরেৎ পে॥

অর্থাৎ–

প্রভাত

কুকুর-কুক ! তোমরা সব এখন জেগে ওঠ। মোরগের ডাক ঐ গাঁদা গাছের ঝোপ থেকে শোনা যায়। তারা ডাক দিয়ে বলতে চাইছে তোমরা ওঠ। কুকুর-কুক তোমরা ওঠ। দিনভর কাজের জন্য উজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। তোমরা জেগে ওঠ॥

কুকুর-কুক ! তোমরা সব এখন ওঠ। পাখি-কাক-চিল প্রভৃতির ডাকে চারদিক ভরে গেছে। সৃষ্টিতে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, চিন্তা করে কাজে নেমে পড়। অলস মন নিয়ে কেন পড়ে আছে ? তোমরা জেগে ওঠ॥

কুকুর-কুক ! তোমরা সব এখন জেগে ওঠ। সুস্থ সুন্দর হয়ে ওঠ, কাজ শুরু করে দাও। জ্ঞানের পথ খুঁজে নাও। কুকুর-কুক ! তোমরা ওঠ। তোমরা তো মানব সন্তান, কেন বুঝছ না। সামনের দিকে এগিয়ে চল। তোমরা সবাই জেগে ওঠ॥

এই দশকেই আবার 'বাহা ডালওয়াঃ' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই উপন্যাসটি 'পেড়া হড়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত এবং এটি 'ফুলের সাজি' নামক বাংলা উপন্যাসের সাঁওতালী অনুবাদ।

এ সময়ে একটি নাটকের বইও প্রকাশিত হয়। নাটকটির নাম 'মার্থা মারাং দাই'। চৈতন্য হেমব্রম কুমার বাইবেলের কাহিনী অবলম্বন করে এ নাটকটি লেখেন। রোমান লিপিতে এটি মুদ্রিত হয়।

চল্লিশ দশকে বেশ কয়েকটি মূল্যবান সাঁওতালী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গোপাল গামালিয়েল সরেন এবং ডব্লু. জি. আর্চার সাঁওতাল পরগণার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সাঁওতালী গান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত গানের বই ১৯৪৩ সালে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটির নাম 'হড় সেরেঞ'। এতে ১৬৭৬টি

গান মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটির নাম 'দং সেরেঞ'। এটি ৪৩৫ পৃষ্ঠার গানের বই এবং ১৮২৪টি গান এতে সংগৃহীত হয়েছে। বিয়ের গান এবং কৃষিকাজের সময়ে ব্যবহৃত গানই দ্বিতীয় খণ্ডটিতে স্থান পেয়েছে। রোমান লিপিতে দুটি গানের বইই মুদ্রিত হয়।

১৯৪৪ সালে সলোমন সি. মুর্মুর 'গাম কাহনি' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে ১৩৮টি সাঁওতালী লোক-কথা সংগৃহীত হয়েছে, প্রত্যেকটি গল্প অতি সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে। সলোমন মুর্মু স্কুল শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু লেখক হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। জানা যায় যে, তিনি নিজের চেষ্টায় ঐ সব সাঁওতালী লোক-কথা সংগ্রহ করেন। তিনিই ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর আর একটি গ্রন্থের নাম 'হড় গিদরী এনেচ্'। এ গ্রন্থটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খেলাধুলা সম্পর্কে এই পুস্তকটি তিনি রচনা করেন। এটিকেও সাঁওতাল সমাজের অন্যতম দলিল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এরপর প্রকাশিত আর একটি মূল্যবান গ্রন্থের নাম 'হড় কুদুম'। গ্রন্থটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত। স্টিফেন হিকিম মুর্মু এবং ডব্লু. জি. আর্চার ১৯৪৩-৪৪ সালে সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু সাঁওতালী হেঁয়ালী সংগ্রহ করেন, পরে ১৯৪৪ সালে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। ১৯৬২ সালে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটিতে ৫২১টি হেঁয়ালি সংগৃহীত হয়েছে।

স্টিফেন মুর্মুর আর একটি গ্রন্থ 'কারাম আর চাচো ছাটিয়ার'। ১৯৪৫ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ঐ সালেই বাংলা হরপে একটি গানের বই প্রকাশিত হয়, নাম 'সেরেঞ ইতঁ'। রচয়িতা পঞ্চানন মাণ্ডি। ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন, ছাত্রাবস্থাকালে প্রচলিত সাঁওতালী গান তাঁকে খুব বেশী আকৃষ্ট করে তোলে। পরবর্তীকালে তিনি তাই একটি মূল্যবান গানের সংকলন 'সেরেঞ ইতঁ' (গানের বীজ) প্রকাশ করেন।

পরের বছর ১৯৪৬ সালে একটি মূল্যবান অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, গ্রন্থটির নাম 'হাড়মাওয়াঃ আতো'। এটি সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার আর কারস্টেয়ার্স-এঁর লেখা 'Harma's Village' গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ করেন রুবেন রুসেন কিস্কু রাপাজ। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি লেখা হয়।

ঐ বছরই রোমান ক্যাথলিক মিশনের উদ্যোগে নতুন একটি সাঁওতালী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম–'মার্সাল তাবোন'। পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার পড়ে সাঁওতাল পরগণার কাঞ্চননালা গ্রামের যোসেফ সরকার সরেনের উপর। 'মারসাল তাবোন' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে ঐ পত্রিকায় লেখা হয়–

"১৯৪৬ সাল রেয়াঃ জুন চান্দোরে মারসাল তাবোন রেয়াঃ পাহিল লেখা ওডোকেনতে আয়মা হড় দ নাওয়া পেড়া আতাঙ লেকা মারসাল তাবোন রাস্কীতেকো আতাঙকেদা আর উন খন সানাম স্যেচ্‌রেন পাড়হাও হড়কো নওয়া কাগজ সাকাম মাঙ্গাও কো এহপ্‌এনা।"

অর্থাৎ–

'১৯৪৬ সালের জুন মাসে 'মারসাল তাবোন'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়াতে বহু লোকই নতুন অতিথি বরণ করার মত সেটি গ্রহণ করল এবং চারদিকের পাঠকরা এই পত্রিকা চাইতে লাগল।'

সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে আর একটা তথ্য তুলে না ধরলে আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে একটা মূল্যবান দিক অজানা থেকে যায়। সেটা জানা দরকার। সেটা হল–খ্যাতনামা ম্যক্‌মিলান কোম্পানিও সেদিন সাঁওতালী পাহিল পুথি, দসার পুথি আর তেসার পুথি প্রকাশ করে সাঁওতালী ভাষার গুরুত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল। এই তিনটি পাঠ্যপুস্তকে মূলত প্রবন্ধ সাহিত্যই স্থান পেয়েছে।

স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত সাঁওতালীতে প্রকাশিত গ্রন্থাদির আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, চল্লিশ দশকেই বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিন্‌তী

বিন্‌তী সাঁওতাল সমাজের মূল্যবান মৌখিক সাহিত্য। যুগ যুগ ধরে এই সাহিত্যকে তারা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রেখেছে, তবে মুখে মুখে প্রচলিত থাকায় এই মূল্যবান সাহিত্যের আদিরূপ অবিকল পূর্বের মত আর ধরা পড়ে না। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত বিন্‌তীর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য হয়। সময়, কাল ও স্থানীয় অঞ্চলের প্রভাব পড়ায় এ সব বিন্‌তীর এখানে-ওখানে কিছু কিছু যোগ-বিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে, তবুও বলা যায় যে, মূল বিষয়টি আজও অপরিবর্তিতই আছে। এই মৌখিক সাহিত্য তাদের কাছে অতি প্রিয় এবং সমাজ জীবনে এর স্থান কম নয়।

স্পষ্টত মানব সমাজের লোকসংস্কৃতির ধারা প্রায় অভিন্ন। বাংলা ভাষায় যেমন কথাবার্তা ও চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারে শ্রোতাদের মনের কথা সবিস্তারে গানে ও বচনে প্রচারিত, বিনতীও অনেকটা সেই প্রকার। ধর্ম ও সাহিত্যের সমমিশ্রণ।

বিন্‌তি'তে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘটনা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় ইত্যাদি স্তব-স্তুতি সহকারে স্মরণ করা বা তুলে ধরা হয়। তুলে ধরেন বিন্‌তীকার বা বিন্‌তী গুরু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই মন দিয়ে তা শোনে। কারণ, এই শ্রুতিকথার মধ্যেই যেমন সাঁওতাল সমাজের আদি ইতিহাস আছে, তেমনি কাব্যরসও আছে। প্রয়োজন হলে বিন্‌তীকার বিন্‌তীটিকে শ্রোতাদের কাছে আরো উপভোগ্য করে তোলার জন্য কোন-কোন অংশ গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন এবং ব্যাখ্যা করেন।

সাঁওতালীতে চারটি বিন্‌তী শুনতে পাওয়া যায়–(১) জম সিম বিন্‌তী (২) ছাটিয়ার বিন্‌তী (৩) ভাণ্ডান বিন্‌তী এবং (৪) কারাম বিন্‌তী। এছাড়া, বিবাহ অনুষ্ঠানের আচার-বিধান সম্পর্কে যদিও এক সময়ে 'বাপ্লা বিন্‌তী' সমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেদিন নানা কাজকর্মের চাপে সময় হয় না বলে বর্তমানে তা আর শোনা যায় না। তার প্রচলনও তাই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিন্‌তী তাদের কাছে কিন্তু বানানো গল্প, কাহিনী নয়–এগুলোর সঙ্গে তাদের সমাজের সত্যিকারের ইতিহাস বিজড়িত। নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা কি ভাবে বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেছে, কিভাবে তাদের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন তৈরি হয়েছে এবং ক্রমে একটি জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তার আভাস এই বিন্‌তীগুলোর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। মোট কথা–সাঁওতাল সমাজের ঐতিহ্য এই বিন্‌তীগুলির সঙ্গে বিজড়িত। আমরা জানি, মানুষের জীবনে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শী সবাই এ সময়ে বিন্‌তীগুলিকে পরিবেশন করে সেগুলিকে পুনর্বার স্মরণে আনে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে।

বিন্‌তী বলার সময়ে বিন্‌তীকার বিভিন্নভাবে শ্রোতাদের সম্বোধন করে থাকেন। কারাম বিন্‌তী বলার সময় 'বাবা' বলে, ছাটিয়ার বিন্‌তীর সময় 'সাহেব' বলে এবং ভাণ্ডান বিন্‌তীর সময় 'বাপধন' বলে বিন্‌তীর আসরে বিন্‌তীকারক শ্রোতাদের সম্বোধন করে থাকেন। জম সিম বিন্‌তীর সময়ে কিন্তু তা দেখা যায় না। বলতে বাধা নেই এ সব বিন্‌তী সাঁওতাল সমাজে বাংলা মঙ্গলকাব্যের মতই সমাদর পায়। মনে হয়, ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারত পাঠের মতো এগুলি সশ্রদ্ধা সহকারে শুনতে হয়।

কারাম বিন্‌তী

কারাম (করম) বিন্‌তী সাঁওতাল সমাজের এক মূল্যবান শ্রুতিকথা। করম পূজার সময়ে কারাম গুরু গ্রামবাসীদের এই মূল্যবান শ্রুতিকথা সারারাত ধরে শোনান আর গ্রামবাসীরাও সবিশেষ আগ্রহ নিয়ে এই শ্রুতিকথা শোনে। মনে রাখা দরকার যে, সাঁওতালরা 'করম' বা 'করম পূজা' বলে না, সে জায়গায় তারা বলে 'কারাম' বা 'কারাম পূজা'। আমরা জানি সাঁওতালরা কৃষিজীবী সমাজের মানুষ। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপদেবতার কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তাদের এই কারাম পূজা। এছাড়া, মেয়েরা সন্তান কামনা ও ভাইদের মঙ্গল কামনাও এ সময়ে করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, কারাম দেবতাকে তুষ্ট করলে তিনি খুশি হয়ে সকল প্রকার অঘটন, অসুবিধা দূর করে প্রচুর ফসল দিয়ে 'শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা' করে দেবেন। কারাম পূজা সম্বন্ধে সাঁওতালী সমাজে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কারু ও ধারু বা কার্মু ও ধার্মুকে নিয়েই এ কাহিনী। এ কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, কর্মের দোষেই রোগ-শোক, বিপদ-আপদ সংসারে দেখা দেয়।

শেষে কারাম দেবতার পূজা করলেই সকল বিপদ-আপদ থেকে রেহাই পেয়ে সংসারে সুখ-শান্তি আসে। সেই থেকে সাঁওতাল সমাজে কারাম পূজার প্রচলন।

পূর্বেই বলেছি কারাম পূজা কৃষি উৎসব। কারাম উৎসবে দুটি করম গাছের ডাল পাশাপাশি পুঁতে পূজা করা হয়। অনেকে বলে থাকেন যে, এ হল করম রাজা ও করম রাণীর বিবাহ অনুষ্ঠান । করম রাজা সূর্য এবং করম রাণী পৃথিবীর প্রতীক। দুইয়ের পরিণয়ের মধ্য দিয়েই প্রচুর শস্য সম্ভাবনা হতে পারে। কারাম উৎসবের আচার-অনুষ্ঠানেও উপকরণগুলি দেখলে এ ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। আবার কারাম নাচের মধ্যেও এই শস্য কামনা ব্যক্ত হয়ে থাকে। কারাম নাচে শরীরের যে অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ পায় তাতে ধান্যরোপণের জন্য কাদা করা, ধান্য রোপন, ধান কাটা ইত্যাদির মুদ্রাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এখানে ওরাওঁ গোষ্ঠীর করম পূজার কথা উল্লেখ করতে হয়। তারা করম গাছের তিনটি ডাল পোঁতে ; তাদের চিন্তাভাবনায় এ তিনটি ডাল সূর্য, মাটি ও জলের প্রতীক।

সাঁওতাল সমাজের করম ডাল সংগ্রহের দৃশ্যটি খুবই আকর্ষণীয়। এ ডাল সংগ্রহের দায়িত্ব জগ্-মাঁঝির। তিনি নতুন কুলা বা ডালাতে প্রদীপ, ধান, দূর্বাঘাস, সিঁদুর, কাজল, একখণ্ড নতুন কাপড়, খাঁড়া, ঘটির জল সাজিয়ে এক কলসী মদ ডান হাতে ধরে করম গাছের তলায় যাবার জন্য প্রস্তুত হন। গ্রামবাসীদের উদ্দেশে তিনি গান করেন ঃ

উঠ সে হো গাঁয়ের মণ্ডল চল সে হো দশে পাঁচে
চল যাব করমে আনিজে বানিজ
চল সেহো দশে পাঁচে হামারিয়ো সঙ্গে হো
সবাই মিলিমিশি জো করমেকা ডাঁর কাটি আনিব।
চল সে হো কারমু ধারমু হামারিয়ো সঁগে
অরুণিকা বনে কিরি করমে জো কাটি আনিব।

গ্রামের লোকজন করম গাছের তলায় হাজির হয়। সকলে তখন একসঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গান ধরে–

'চেতে লাগিৎ হো কারমুম হেচ্আকানা হো ?
চেতে লাগিৎ হো কারমুম সেটেরাকানা ?
নাম লাগিৎ হো কারমুঞ হেচআকানা হো !
নাম লাগিৎ হো কারমুঞ সেটেরাকানা।

অর্থাৎ–

কারমু তুমি কি জন্য এসেছ, কি জন্য উপস্থিত হয়েছ ? কারমু আমি তোমার জন্যই এসেছি, তোমার জন্যই আমি উপস্থিত হয়েছি।

এরপর জগ্-মাঁঝি ঘটির জল নিয়ে নিজের পা ধোয় এবং করম গাছে জল ছিটিয়ে দেয়। গান হয় ঃ

না ছুঁওয়াই জগ্-মাঁঝি না ছুঁওয়াই জগ্-মাঁছি
আগে তো গড় ঘোওয়াওলে, তবে বাবা পানি ছিটাই দে।

অর্থাৎ–

জগ্-মাঁছি তুমি ছুঁয়ো না, জগ্-মাঁছি তুমি ছুঁয়ো না। আগে 'গড়' তৈরি কর, তারপর জল ছিটাবে। করম গাছের নীচে পূজা-অর্চনা সেরে গান করা হয় ঃ

দে কারমা দেলা কারমা দে বেরেৎ মে কারমা
দে কারমা দেলা কারমা দেলা তেঙ্গোনমে কারমা
দে কারমা দেলা কারমা দে তেঙ্গোন মে।

বীঞ চালাঃ হো কারমু বীঞ সেনঃ হো কারমু
দো রুওয়ীড় মে কারমু দো চালাঃমে।

আম মায়াতে কারমা গেল্ সেরমাঞ উপীসাকাৎ
আম দায়াতে কারমা নিসি সেরমাঞ তিরীসাকাদা।

আলম রাগা কারমা আলম হমরা কারমা
ইদি তেহঁঞ ইদিমেয়া তেহঁঞ সেটেরমেয়া
কলে রেগে কারমাঞ দহমেয়া।

দে কারমা হো কারমা হেঁও মিয়াঞ হো কারমা
দে কারমা হো কারমা হবর মিয়াঞ হো কারমা
তওয়াতেঞ উমমেয়া দাহেতেঞ নাড়কা মেয়া
কলে রেগে হো কারমাঞ দহমেয়া হো।

অর্থাৎ–

করম চল, চল ওঠো। চল করম উঠে দাঁড়াও। কারমু আমি যাব না, যাব না আমি কারমু। ফিরে যাও, কারমু তুমি ফিরে যাও।

করম আমি তোমার মায়ায় দশ বছর উপোস করেছি, বিশ বছর জলস্পর্শ পর্যন্ত করিনি।

করম তুমি কেঁদো না, তুমি বিলাপ কর না। যে কোন প্রকারেই হোক তোমাকে নিয়ে যাবই। তোমাকে নিয়ে পৌঁছবই।

করম তোমাকে কোলে নেব। করম এস, তোমাকে কোলে নিই। করম এস, তোমাকে কোলে বসাই। দুধ দিয়ে তোমাকে স্নান করাব। দই দিয়ে তোমাকে মাথা ঘষে পরিস্কার করব ; করম তোমাকে কোলে-কোলেই রাখব।

এরপর দুটি অবিবাহিত যুবক করম গাছের ডাল কাটার জন্য প্রস্তুত হয়। তারা গান ধরে–

তাঁহা রেতা নানা তারনা তাঁহা রেতা নানা হো
তাঁহা রেত্বা নানা তারনা না নানা হো।

পুরুব পছিম উতর দাখিন
চার কঁড়* জো আছে হো
কোন্ কোণের ডীর** বাবা কাটি আনিব ?

পুরুব পছিম উতর দাখিন
চার কঁড় জো আছে হো
উতর নাখা দুয়ো করম ডীরা জো
কাটি আনাই দে।

আবার কখনও বা এ রকম গায় ঃ

কোন ডাল যে দিবে কারমা ?
কোন ডাল যে রাখিবে
বাছি দেহো কারমা
করমেকা ডাল।
আগু ডাল যে বাড়িবে
তল ডাল যে রাখিবে
মধ্যে কা ডাল কারমা
বাছি লে হো।

* কঁড়-কোণ

** ডীর-ডাল

তখন যুবক দুটি করম গাছে উঠে ডালটিকে ধরে এবং জগ্-মাঁঝি কাটারি দিয়ে সেই ডালটি কেটে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই গাছের চারপাশ ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান করে ঃ

তাঁহারে রেতারে নানারে
তাঁহা রেতা নানা তারনা না নানা রে।

কারমা লো কারমা লো করম কাটি গেল
করম নাহি কাটি গেল ছাই কাটি গেল।

করম ডাল নিয়ে সবাই গ্রামে ফিরে আসে। আসার সময়ে সারা রাস্তা তারা করম দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভরে নানা ধরনের গান গায়। গ্রামে ফিরলে পর গ্রামের জগ্-মাঁছি, কারাম গুরু এবং সেই দুটি ছেলের পা ধুয়ে দেওয়া হয়। সবাই তখন গান ধরে ঃ

আনো সেরে জগ্-মাঁঝি সনেকিরি খন্তা
আনো সেরে জগ্-মাঁঝি রূপাকিরি খন্তা
ভুঁয়ো জো কড়ায়েতে গড়ায় দেহো
জগ্-মাঁঝি দুয়ো করম ডীর।

অর্থাৎ–

জগ্-মাঁঝি তুমি সোনার খুন্তি নিয়ে এস, জগ্-মাঁঝি তুমি রূপোর খুন্তি নিয়ে এস। মাটি খুঁড়ে দুটি করম ডাল পুঁতে দাও।

করম ডাল দুটি পূজার থানে স্থাপন হলে পর সবাই গান ধরে–

আনো আনো জগ্-মাঁঝি একা লাতি সুতা জো
গড়ায়লোমা জগ-মাঁঝি দুয়ো কারাম ডীর
বাঁধায় দেহো জগ-মাঁঝি দুয়ো কারাম ডীর।

অর্থাৎ–

জগ্-মাঁঝি তুমি এক লাতি সুতো নিয়ে এস, জগ্-মাঁঝি আমরা করম ডাল দুটিকে পুঁতেছি, তুমি করম ডাল দুটি সুতো দিয়ে জড়িয়ে দাও।

এরপর মেয়েরা ধান, দুর্বা, ধুপ-ধুনোর ডালা সাজিয়ে প্রদীপ জ্বেলে করম ডাল দুটি বরণ করে নেয় এবং সে সময়ে তারা গান গায় ঃ

চুমাই দেগো চুমাই দে, দুয়ো কারাম ডীর নায়ো
দেগো আয়ো চুমাই দে, দুয়ো কারাম ডীর।

অর্থাৎ—

'চুমু দাও মাগো, করম ডাল দুটিকে চুমু দাও ; মাগো চুমু দাও করম ডাল দুটিকে।'

করম দেবতাকে বরণ করে নতুন কাপড়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। সবাই ভক্তিভরে করম দেবতাকে স্মরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ভীমসার, লাটবালাং, গুঞ্জার, মাতোয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নাচ-গান। রাত একটু গভীর হলে কারাম গুরু তার দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন গ্রামবাসীদের কারাম বিন্‌তী শোনাবার জন্য। তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের শ্রুতিকথা দিয়ে কারাম বিন্‌তী শুরু করে বলেন ঃ

আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, আলো ছিল না, সর্বত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পৃথিবীর এই আদি পর্যায়ে অনন্ত জলরাশির উপর ঠাকুর ও ঠাকরাণ বিরাজ করতেন। ঠাকুরের বার্তাবাহক ছিলেন লিটা, তিনিই অন্যান্য দেবতাদের কাছে ঠাকুরের বার্তা পৌঁছে দিতেন। ঠাকুর ও ঠাকরাণ প্রতিদিন স্বর্গপুরী থেকে 'তোড়ে সুতো'তে করে জলাপুরীতে স্নান করতে নেমে আসতেন এবং ঠাকুর সে সময়ে কোন না কোন জলচর প্রাণী সৃষ্টি করতেন। এভাবে ঠাকুর জীউ একে একে রাঘব বোয়াড় হাকো (বোয়াল মাছ) হর-অ (কূর্ম), ধিরি কাটকম (পাথর কাঁকড়া), ল্যাণ্ডেৎ (কেঁচো), সলে ইচাঃ হাকো (চিংড়ি মাছ), তায়ান (কুম্ভীর), মাঙ্গাড় (মকর) প্রভৃতি জলচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন।

তারপর ঠাকুর জীউ মানুষ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি মাটি দিয়ে দুটি মূর্তি তৈরী করলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত, সে সময় 'সিঞ সাদম' বা সূর্য ঘোড়া এসে মূর্তি দুটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল। এতে ঠাকুর খুব দুঃখ পেলেন আর বললেন যে তিনি আর মানুষ তৈরী করবেন না। তিনি নিজের শরীরের ময়লা দিয়ে দুটি পাখি, একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী পাখি তৈরী করলেন ও পাখি দুটির নাম দিলে হাঁস ও হাঁসিল। তারপর তিনি ফুঁ দিয়ে তাদের জীবন দিলেন। পাখি দুটি প্রাণ পেয়ে উড়ে গেল এবং আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও বসবার জায়গা না পেয়ে শেষে ঠাকুরের হাতে এসে বসল। সে সময় স্বর্গপুরী থেকে সিঞ সাদম আবার জল খেতে পৃথিবীতে নেমে এল। জল খেতে খেতে তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হল এবং সেই ফেনা জলে ভাসতে লাগল। ঠাকুর তখন পাখি দুটিকে সেই ফেনার উপর আশ্রয় নিতে বললেন। পাখি দুটি ফেনার উপর আশ্রয় নিল এবং সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগল।

পাখি দুটি খাবার কিছু না পেয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হল। ঠাকুর তখন সৃষ্ট জীবগুলির মধ্যে বোয়াল মাছ, কুম্ভীর, চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়াকে জলমগ্ন পৃথিবী থেকে মাটি তুলবার আদেশ দিলেন ; কিন্তু কেউই মাটি তুলতে পারল না। মাটি তুলবার সময়ে সমস্ত মাটি জলে গলে গেল। শেষে ঠাকুর কেঁচোকে মাটি তুলবার আদেশ দিলেন। কেঁচো বলল যে, যদি কচ্ছপ জলের উপর ভেসে থাকে তবে সে জলের নীচ থেকে মাটি তুলতে পারবে। ঠাকুর কচ্ছপকে ডেকে জলের উপর স্থির হয়ে দাঁড়াতে বললেন। তার চারটে পায়ের তিনটি পা শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। কেঁচো তখন কচ্ছপের পিঠের ওপর লেজ রাখল এবং জলের নীচে গিয়ে মাটি খেতে লাগল এবং সেই মাটি কচ্ছপের পিঠে বের করে দিতে লাগল। এভাবে মাটি তুলতে তুলতে পৃথিবী ভরে গেল, তখন সে থামল।

ঠাকুর তখন মই দিয়ে মাটি সমান করে দিলেন। সমান করতে করতে যে অংশ উঁচু রইল তা পাহাড় হল। এরপর ঠাকুর শিরোম ঘাসের বীজ বুনলেন– তারপর ধুবি ঘাস ; পরে করম গাছ। তারপর শালগাছ, মহুয়া গাছ আর অন্যান্য গাছপালা সৃষ্টি করলেন। পাখি দুটি শিরোম ঘাসের বনে বাসা বাঁধল, ডিম পাড়ল। নির্দিষ্ট সময়ে সেই ডিম থেকে দুটি মানব জন্মলাভ করল–একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সাঁওতালদের মতে এরাই মানুষের আদি পিতা ও আদি মাতা, পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি।

হাঁস হাঁসিলের ডিম থেকে মানব শিশু দুটির জন্ম হলে পর তাদের কোথায় রাখবে, কি খাওয়াবে, এসব চিন্তা করে পাখি দুটি বিলাপসূচক গান ধরল–

হায় হায় ! জালাপুরীরে
হায় হায় ! নুকিন মান্ওয়া
হায় হায় ! বুসাঁড় আকানকিন
হায় হায় ! তোকারে দহকিন ?
হায় হায় ! দো সে লাইআয়বেন
হায় হায় ! মারাং ঠাকুর জীউ।
হায় হায় ! নুকিন মানওয়া
হায় হায় ! তোকারে দহকিন ?

অর্থাৎ–

হায় হায় ! মহাসাগর,
হায় হায় ! এই মানুষ দুটি

হায় হায় ! জন্মলাভ করেছে।
হায় হায় ! এ দুটিকে কোথায় রাখব ?
হায় হায় ! দাও বলে দাও
হায় হায় ! মহান ঠাকুর জীউ,
হায় হায় ! এই মানব শিশু দুটিকে
হায় হায় ! কোথায় এখন রাখব ?

সাঁওতালদের মতে এটাই আদিসঙ্গীত। দুঃখ থেকেই এই আদি সঙ্গীতের সৃষ্টি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বাল্মীকির রামায়ণ রচনার কাহিনীতেও পাখির দুঃখে মানুষের কণ্ঠ থেকে শোকোচ্ছ্বাস বেরিয়ে এসেছিল আর এখানে মানুষের দুঃখে পাখির কণ্ঠ থেকে শোকোচ্ছ্বাস বেরিয়ে আসছে।

এরপর ঠাকুর জীউর নির্দেশমত পাখি দুটি ঐ মানব শিশু দুটিকে হিহিড়ি-পিপিড়ি নামে এক জায়গায় রেখে কোথায় গেল তা আর জানা যায় না। আর তা জানবার দরকারই বা কি ?

মানব শিশু দুটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পড়ল লিটার ওপর। তারা সুমতুবুকুচ ঘাস ও শ্যামা ঘাসের দানা খেয়ে বড় হতে লাগল। দু'জনেই উলঙ্গ অবস্থায় থাকত, তাদের কোন লজ্জা 'শরম' ছিল না। লজ্জা নিবারণের কোন প্রয়োজনও তারা তখন অনুভব করেনি।

এরপর লিটা তাদের হাঁড়িয়া তৈরী করতে শেখালেন। এবং সেই সঙ্গে তাদের বললেন যে, হাঁড়িয়া তৈরীর পর তাঁকে সামান্য উৎসর্গ না করে যেন তারা তা স্পর্শ না করে। হাঁড়িয়া খেয়ে নেশাগ্রস্থ হয়ে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি রাত্রে একসঙ্গে ঘুমাল এবং পরস্পর দৈহিকভাবে প্রথম মিলিতও হল। পরের দিন সকালে লিটা এসে তাদের ডাকলেন, কিন্তু তারা লিটার সামনে আসতে রাজী হল না। তারা আড়াল থেকেই লিটাকে বলল–'দাদু, আমরা কি করে বেরুবো ? আমাদের বড়ই লজ্জা লাগছে, আমাদের শরীরে কোন আবরণ নেই। আর গতকাল হাঁড়িয়া খেয়ে আমরা খারাপ কাজ করেছি।'

তখন লিটা বললেন–'তাতে আর কি হয়েছে। ও তো ঠিক হয়েছে।'

তিনি তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য বটগাছের পাতা এনে দিলেন। তারা সেই পাতা সেলাই করে তা পরে লিটার সামনে উপস্থিত হল।

হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের বাইরে সেই আদিকাল তারা কি করে আদম-ইভের কাহিনীর অবিকল বর্ণনা করেছিল ভাবতে আশ্চর্য লাগল।

তারপর তাদের ছেলেমেয়ে হল। সাত ছেলে ও সাত মেয়ে। বড় ছেলের নাম সাণ্ড্রা, তারপর সানচম, তারপর চারে, তারপর মানে এবং সবচেয়ে ছোট আচারে দেলহ্। সে রকম বড় মেয়ের নাম ছিতা, তারপর কাপু তারপর হিসি, আর একজনের নাম ডুমনি। বাকি সকলের নাম বলা সম্ভব নয়। কারণ যে কোন কারণেই হোক সে নামগুলো কালক্রমে হারিয়ে গেছে।

ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে বড় হল। একদিন পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি আলোচনা করে ঠিক করল যে, ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হলে এক জায়গায় রাখা চলবে না। তাই তারা ছেলেমেয়েদের আলাদা আলাদা জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করল, যাতে তারা কেউ কারো মুখ দেখবার পর্যন্ত সুযোগ না পায়। পিলচু হাড়াম ছেলেদের নিয়ে শিকার করতে যেত, অন্যদিকে পিলচু বুড়হিও মেয়েদের সঙ্গে জঙ্গলে শাক-পাতা তুলতে যেত।

একদিন মেয়েরা শাক-পাতা তুলে ক্লান্ত হয়ে এক বটগাছের তলায় বিশ্রাম করছে, একটু পরে তারা বটের ঝুরি ধরে দোল খেতে খেতে গান ধরল–

'মুঃচ্‌কো মুঃচ্‌কো দকো দুঁগুৎ দুঁগুদঃ নায়ো
চাপাকিয়া বাড়ে লাতার ঊরতেকো দুঁগুৎ দুঁগুদঃ।'

অর্থাৎ–

পিপিলিকা পিপিলিকা করে কিলবিল মাগো,
চাপাকিয়া বটের ডালে কিলবিল করে।

সে সময় ছেলেরা একটা বৈ-বিন্দি হরিণ শিকার করে ফিরছিল। তারা গান শুনে হরিণটিকে ফেলে রেখে মেয়েদের কাছে গেল। এবং মেয়েদের সঙ্গে নাচগানে সমানে যোগ দিল। নাচগান করতে করতে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রেমে পড়ল। ছেলেরা এক-একটি মেয়েকে বেছে নিল-বড় ভাই পছন্দ করল সবচেয়ে বড় বোনকে, তেমনি ছোট ভাই পছন্দ করল সবচেয়ে ছোট বোনকে।

পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি ছেলেমেয়েদের প্রেম ভালবাসার কথা জেনে তাদের বিয়ে দেওয়া স্থির করল এবং সাত জনের সাতটি ঘর তৈরী করে দিল।

এরপর সকলের ছেলেপিলে হল। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি নাতি-নাতনীদের দেখে বেশ চিন্তার মধ্যে পড়ল। তারা বলল–একবার ভাই বোনের বিয়ে হয়েছে, এরপর থেকে আর ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে হবে না। আমরা ওদের বিভিন্ন গোত্রে নামকরণ করব। এই বলে ছেলেদের হাঁসদা, মুর্মু, কিস্কু, হেমব্রম, মারাণ্ডি, সরেন ও টুডু পদবী দেওয়া হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করে দেওয়া হল যে. একই গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর কখনও বিবাহ দেওয়া যাবে না। বিবাহ সবসময় দুটি আলাদা আলাদা গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে হবে। এভাবে সাঁওতাল সমাজ সর্বপ্রথম বিবাহ-বিধি তৈরী করা হল। হিন্দু সমাজেও একগোত্রে বিবাহ-নিষিদ্ধ। সেখানেও একগোত্রে বিবাহ মানে ভাই-বোনের পরিণয়।

সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী বলার পর কারাম গুরু কারাম বিন্‌তী শুরু করেন। তিনি বলেন–

বহুকাল পূর্বে কার্মু ও ধার্মু নামে দু'ভাই ছিল। কার্মু বড় ও ধার্মু ছোট। তাদের সময়ে একবার নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের আগে কোন শস্যেরই খোসা হত না, শুধু দানাই হত। কিন্তু দেখা যেত, মানুষ যত্ন সহকারে এ দানা সংগ্রহ করত না, খুসিমত সংগ্রহ করত আর নষ্ট করত। ভগবান চাঁদো বোঙ্গা তাঁর দেওয়া খাবার মানুষ এ ভাবে নষ্ট করে দেখে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন এবং তারপর থেকে সমস্ত শস্যেরই খোসা হতে থাকে। মানুষের দুর্দ্দশাও শুরু হয়। এক মুঠো আহারের জন্য সারাদিন মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়। এ সময়ে আবার ধরম গুরু এবং বুওয়াং গুরুর নির্দেশে পৃথিবীতে পঙ্গপালের দল নেমে সমস্ত ফসল খেয়ে শেষ করে যেত। নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। সে সময় আবার পঙ্গপালের দল সমস্ত শস্যক্ষেত বিনষ্ট করে দিয়ে যায়। ফলে, পোকা-মাকড়ের জন্ম হয়। একে তো ক্ষিদের জ্বালা, তার ওপর নানারকম রোগ-ব্যাধি। সে সময়ে মানুষ এই বলে কান্নাকাটি করে ঃ

হায়রে ! হায়রে ! তকয় গুরু নুরীলতে
লুগুবুরু পুহু দ ক আঁড়গোলেনারে ?
হায়রে ! হায়রে ! তকয় গুরু নুরীলতে
ঘাণ্টাবাড়ি পাকাড়ে ক ডিং ডাবুরকেৎ ?

হায়রে ! হায়রে ! ধরম গুরু নুরীলতে
লুগুবুরু পুহু দ ক আঁড়গোলেনারে ;

হায়রে ! হায়রে ! বুওয়াং গুরু নুরীলতে
ঘাণ্টাবাড়ি পাকাড়ে ক ডিং ডাবুরকেৎ।

অর্থাৎ—

হায় ! হায় ! কোন্ গুরুর প্ররোচনায়
লুগুবুরুতে পঙ্গপাল নেমেছে ?
হায় ! হায় ! কোন্ গুরুর প্ররোচনায়
ঘাণ্টাবাড়ি অঞ্চল সেঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে ?

হায় ! হায় ! ধরম গুরুর প্ররোচনায়
লুগুবুরুতে পঙ্গপাল নেমেছে।
হায় ! হায় ! বুওয়াং গুরুর প্ররোচনায়
ঘাণ্টাবাড়ি অঞ্চল সেঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে॥

মানুষের এক কান্না ভগবানের কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি মানুষের কষ্ট দেখে সবিশেষ দুঃখ পান এবং মানুষের এ কষ্ট লাঘবের জন্য করম দেবতাকে পৃথিবীতে পাঠান আর বলেন যে, তিনি নানা জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সে সব জীবজন্তু বনে জঙ্গলে থাকে। মানুষ ঐ সব জীবজন্তুকে পোষ মানিয়ে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে, তাহলে খাদ্যভাব, দুঃখ দূর হবে। মানুষকে পরিশ্রমী করে তুলতে হবে এবং সেই সঙ্গে সুখী করাই করম ঠাকুরের কাজ হবে এবং মানুষ তাহলে তাঁর পূজো করবে নিয়মিত।

এ একেবারে মঙ্গলকাব্যের ঘটনা। দেবতার অভিশাপে মানুষ অসহায় বোধ করে, দেবদেবীর পূজা করলেই আবার সব ফিরে পায়। এইভাবে মর্তে তাঁদের পূজার প্রচলন হয়।

করম ঠাকুর স্বর্গপুরী ছেড়ে পৃথিবীতে এলেন মানুষের পূজো পাবার জন্য। কয়েকদিন পরই তিনি স্বপ্নে কার্মুকে দেখা দিয়ে বললেন–'কার্মু, তুমি আমার সেবা কর, করম গাছের ডাল পুঁতে আমার পূজো করলে আমি তোমার সহায় হব, তোমার কোন অভাব রাখব না।'

কার্মু এ ধরণের স্বপ্ন বিশ্বাস করল না। সে ভাবল, অভাব হলে যে কেউ এ ধরণের স্বপ্ন দেখতেই পারে। তাই সে ঐ স্বপ্নের গুরুত্ব দিল না।

কার্মু স্বপ্নের গুরুত্ব দিল না দেখে করম ঠাকুর এবার ধার্মুকে স্বপ্নে দেখা

দিয়ে বললেন—'ধার্মু, তুমি তো ছাগল চরাও আর মাঠ থেকে ফিরে অনেক সময় খেতে পর্যন্ত পাও না। সেজন্য তুমি মাঠে ছাগল নিয়ে গেলে করম গাছের ডাল কেটে কোন এক জায়গায় পুঁতে ডালটিকে প্রণাম জানাবে এবং তারপর ডালটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচবে। পরে ডালটি কোন পুকুরের জলে বিসর্জন দেবে, প্রতিদিন বাড়ীতে ফিরে তুমি খেতে পাবে, আর কিছুদিনের মধ্যেই গরু-ছাগল, ধন-সম্পদে তোমার ঘর ভরে যাবে।'

প্রতি রাতে ধার্মু বারবার সেই একই স্বপ্ন দেখতে লাগল। পরদিন সকাল ধার্মু মাঠে ছাগল নিয়ে গিয়ে তাই করল আর বাড়ী ফিরে দেখল যে, হাঁড়ি ভর্তি ভাত রয়েছে, চাল-ডালও ঘরে যথেষ্ট আছে। এরপর থেকে প্রতিদিন ধার্মু করম দেবতার পূজো করে লাগল এবং তার আর অভাব থাকল না।

এদিকে ধার্মু মাঠে করম ডাল পুঁতে নাচতে শুরু করলে পর ছাগলগুলি আর মাঠে চরতে যেত না, তারা ধার্মুর দিকে তাকিয়ে থাকত। প্রতিদিন এরকম ঘটতে থাকায়, ছাগলগুলোর না খেয়ে চেহারা খারাপ হতে লাগল। কার্মু সেটা লক্ষ্য করে একদিন হঠাৎ মাঠে গিয়ে দেখে যে, ধার্মু একটি করম ডাল পুঁতে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে এবং ছাগলগুলো তাই দেখছে। এ দেখে কার্মু রেগে করম ডালটি উপড়ে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কার্মুকে এ কাজে করম ঠাকুর মানব সমাজের উপর নিদারুণ অসন্তুষ্ট হলেন আর কার্মু-ধার্মুকে অভিশাপ দিলেন যে, বেঁচে থাকার জন্য তাদের খুব কষ্ট করতে হবে। এই বলে তিনি সাত সমুদ্র পার হয়ে লংকার অশোক বনে চন্দন গাছের নীচে আস্তানা গড়লেন। সেদিন থেকে কার্মু-ধার্মুর কপাল পুড়ল। তাদের রোজগার কমে গেল। কাজ করার পর মালিকের কাছে যখন তারা খোরাক আনতে যেত, তখন তাদের ভাগে কিছু জুটত না। যখন তারা খেতে বসত তখন খাবার কমে যেত। আস্তে আস্তে গ্রামের লোকের অবস্থাও খারাপ হতে লাগল। গ্রামের লোক তখন ঠাকুর-দেবতার পূজা দিল ; ধরম গুরু, কামরু গুরু, বুওয়াং গুরু, রহড় গুরু, রঁড়ে গুরু, নরসিং গুরু প্রভৃতিকে স্মরণ করে জানতে পারল যে, করম দেবতাকে নিগ্রহ করাতেই গ্রামের এই অবস্থা হয়েছে। এদিকে সেদিন রাত্রে কার্মু-ধার্মু পূজোর থান অপবিত্র করতে গেল, কিন্তু পথে ধরম গুরু তাদের দেখা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলের জন্য করম ডাল আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তা উপড়ে ফেলে দিয়েছ তাই তোমাদের এই দুর্দশা।'

ধরম গুরু কথামত কার্মু ও ধার্মু বেরিয়ে পড়ল করম ডালের খোঁজে। রাস্তায় যেতে যেতে তাদের খুব ক্ষিদে পেল। রাস্তার ধারে একটি কুলগাছ দেখতে পেল, তাতে প্রচুর কুল পেকে রয়েছে। কিন্তু কুল খেতে গিয়ে তারা দেখল যে সব কুলে পোকা লেগেছে। কুলগাছও তাদের বলল–'ভাই, কর্ম দোষে আমার ফলে পোকা লেগেছে, কেউ আমার ফল খায় না।'

কার্মু তখন আক্ষেপের সুরে গেয়ে উঠল ঃ

তাঁহা রেতা নানা তারনা তাঁহা রেতা নানা হো
তাঁহা রেতা নানা তারনা তাঁহা রেতা নানা হো
তাঁহা রেতা না নানা হো।

কুল পাকা জো খাবার মন ছিল বাছা ঠাকুর জিও
কুল পাকা জো পোকা আছে হায় হায় রকম দশা
হায় হায় করমে দশা।

কুলগাছ কার্মুকে জিজ্ঞেস করল–'তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?' কার্মু উত্তর দিল-'কর্ম দোষে দোষে আমাদের কপাল পুড়েছে, তাই আমরা করম ঠাকুরকে আনতে যাচ্ছি।'

তখন কুলগাছ তার দুঃখের কথা করম ঠাকুরকে বলার জন্য অনুরোধ জানাল। কার্মু ও ধার্মু কুলগাছকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল।

যেতে যেতে কার্মু-ধার্মু আবার দেখল যে, এক কাঁঠাল গাছে গাছভর্তি কাঁঠাল ধরেছে। পাকা কাঁঠাল। ক্ষিদেও খুব পেয়েছে। কার্মু-ধার্মু দুটি কাঁঠাল পেড়ে খাবার আয়োজন করল, কিন্তু কাঁঠাল থেকে এত বেশী আঠা বের হতে লাগল যে, তাদের মুখ আর হাত আঠায় আটকে গেল। তাদের আর কাঁঠাল খাওয়া হল না। তারা কাঁদতে কাঁদতে আবার যাত্রা করল ? কাঁঠাল গাছও তাদের অনুরোধ করল করম ঠাকুরকে যেন তার দুর্দশার কথা বলে।

এবার রাস্তার ধারে তারা একটি ডুমুর গাছ দেখতে পেল। গাছে লাল লাল ডুমুর পেকে আছে। ডুমুর পাকা খাবে বলে তারা কোঁচা ভর্তি ডুমুর পাড়ল ; কিন্তু খাবার সময়ে দেখল যে, সব ডুমুরেই পোকা কিলবিল করছে। তাদের আর ডুমুর খাওয়া হল না। ডুমুর গাছ তাদের বলল যে, তার কর্মের দোষে সব পোকা লেগেছে, সেজন্য কেউ তার ফল খেতে পারে না। মনের দুঃখে কার্মু-ধার্মু গান গেয়ে বলল ঃ

তাঁহা রেতা নানা তারনা তাঁহা রেতা নানা হো,
তাঁহা রেতা নানা তারনা তাঁহা রেতা নানা হো,
তাঁহা রেতা না নানা হো।

ডুমুর পাকা জো খাবার মন ছিল বাছা ঠাকুর জিও
ডুমুর পাকা জো পোকা আছে হায় হায় করম দশা
হায় হায় করমে দশা।

এরপর কার্মু-ধার্মু করম ঠাকুরের কাছে যাচ্ছে শুনে ডুমুর গাছ তার দুঃখের কথা করম ঠাকুরকে বলতে বলল।

আবার তারা যাচ্ছে। পথে গরু-মহিষ-হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি জীব-জন্তুর সঙ্গে তাদের একে একে দেখা হল। কার্মু-ধার্মুর দুঃখের কথা শুনে তারাও বলল যে, ঝড়ে-বৃষ্টিতে, ঠাণ্ডায় তারা অবিরাম কষ্ট পায়। কারণ, তাদের কোন মালিক নেই। করম ঠাকুরের কাছে কার্মু-ধার্মু যেন তাদের কথাও পেশ করে।

কার্মু-ধার্মু তাদের আশা দিয়ে পথ চলা শুরু করল। শেষে কার্মু-ধার্মু নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল। কি ভাবে এই নদী তারা পার হবে ? তারা মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে করম ঠাকুরের উদ্দেশে গান শুরু করল ঃ

'দেলাসে দেলাসে কারমা গঁসায়
আম উইহীরতে লিঞ হেচ্‌আকান
আম উইহীরতে লিঞ সেটেরাকান দ।

দিসম খন লিঞ হেচ্‌আকান
মুলুক খন লিঞ সেটেরাকান
আম ইদিমে লীগিৎ গঁসায়–
লিঞ হেচ্‌আকান দ।

আম উইহীরতেগে কারমা
নওয়া দিসম লিঞ হেচ্‌আকান
আম উইহীরতেগে কারমা
নওয়া মুলুক লিঞ সীরি সেটেরেন।

আঁডি গঁসায় লিঞ শাসেত আকান
আঁডি গঁসায় লিঞ হার্কেত আকান

বায় দায়াওয়া লিঞ খান
জালাপুরিরে জিউয়ি লিঞ নাসাও দ।'

অর্থাৎ–

এস, এস, করম ঠাকুর, তোমাকে স্মরণ করে আমরা এসেছি। ঠাকুর, তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দেশ থেকে এসেছি। তোমাকে স্মরণ করে সত্যি সত্যিই আমরা এসেছি। ঠাকুর, আমরা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছি। তুমি দয়া না করলে আমরা এই সাগরে জীবন বিসর্জন দিব।

কার্মু-ধার্মুর কান্না করম ঠাকুর নদীর ওপাশ থেকে এসে কার্মুকে জিজ্ঞাসা করলেন–

চেতে লীগিৎ হো কার্মু হেচ্‌আকান হো কার্মু ?
চেতে লীগিৎ হো কার্মুম সেটেরাকানা ?

অর্থাৎ–

'কার্মু, তুমি কেন এসেছ ?
কার্মু কেন তুমি এখানে হাজির হয়েছ ?

কার্মু উত্তর দেয়–

আম লীগিৎগে কারমাঞ হেচ্‌আকানা হো কারমা,
আম লীগিৎগে কারমাঞ সেটেরাকানা হো কারমা,
আম লীগিৎগে কারমাঞ সেটেরাকানা।

অর্থাৎ–

তোমার জন্যই এসেছি আমরা, ওগো করম ঠাকুর,
তোমার জন্যই এসে উপস্থিত হয়েছি, ওগো করম ঠাকুর।
তোমার জন্যই তোমার দ্বারে দাঁড়িয়েছি।

কার্মুর কথা শুনে করম দেবতা বললেন–

বীঞ চালাঃ হো কার্মু বীঞ রুওয়াঁড়া,
আম তেগে চঙ কার্মু এদ্রেতেগে চঙ কার্মু ;
কাদরাওতেগে চঙ কার্মু সমায় সকড়া,
কেরো ডীড়িরেম চাড়ো গিড়ি কাদিঞ।
নাই নাইতেঞ আঁড়গোয়েনা,

সামুদুরী তালা দাঁরিয়াউরেঞ পায়রা বাড়ায়কান ;
নাঁই নাঁইতেঞ আড়গোয়েনা,
সামুদুরী তালা দাঁরিয়োউরেঞ চাপে বাড়ায়কান।

অর্থাৎ–

কার্মু, আমি যাব না, আমি ফিরে যাব না। তুমি রাগ করে আমাকে কেন ঝরণার জলে ফেলে দিয়েছো।

আমি নদীর জলে ভাসতে ভাসতে চলেছি, সমুদ্রের মাঝে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছি। নদীর জলে ভেসে ভেসে চলেছি, মধ্য সমুদ্রে আমি যে এখন ভাসছি।

করম ঠাকুরের এ কথা শুনে কার্মু অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল-

দে হিজুঃমে কারমা, দেলা রুওয়াঁড়মে কারমা,
আম মায়াতে কারমা গেল্ সেরমাঞ উপাঁসাকাৎ,
আম উইহাঁরতে কারমা ইসি সেরমাঞ তিরাঁসাকাদা॥

অর্থাৎ–

এস করম ঠাকুর, ফিরে চল করম ঠাকুর,
তোমার টানে আমি দশ বছর উপোস করেছি,
তোমার চিন্তায় আমি কুড়ি বছর জলস্পর্শ করিনি॥

করম ঠাকুর তবুও রাজি হলেন না দেখে কার্মুর মন ভেঙ্গে পড়ল ; চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাটিতে মাথা রেখে কাকুতি মিনতি করে কার্মু বলল ঃ

দে হিজুঃমে কারমা, দেলাঞ হবরমে কারমা
গামছারেঞ আতাঙদেয়া, নিদিমিয়াঞ হো কারমা
তওয়াতেঞ নুমমেয়া, দাহেতেঞ নাড়কামেয়া
কলেরেগে হো কারমাঞ দহমেয়া হো
কলেরেগে হো কারমাঞ দহমেয়া হো।

অর্থাৎ–

'ওগো করম ঠাকুর, তুমি এস। তোমাকে আমি কোলে নেব, গামছা পেতে দেব তোমার আসনের জন্য, তোমাকে নিয়ে যাব। দুধ দিয়ে তোমাকে স্নান করাব, দৈ দিয়ে মাথা ঘষে দেব, তোমাকে সব্ সময়ে কোলে নিয়ে রাখব।'

কার্মুর এ কথায় করম ঠাকুর আর সম্মত না হয়ে পারলেন না। তিনি তাদের সব কথা শুনলেন এবং বুঝলেন যে, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য সত্যিই অনুতপ্ত। তিনি তাদের দু'জনকে দুটি লেবু খেতে দিলেন। সেই লেবু খেয়ে তাদের সব দুঃখ-কষ্ট নিমিষে দূর হয়ে গেল।

করম ঠাকুর তখন তাদের বললেন–'আমি স্বর্গলোক থেকে এ পৃথিবীতে এসেছি মানুষের সেবার জন্য। মানুষকে প্রতিপালন করাই আমার কাজ। মানুষ যে যে-রকম কর্ম করবে সে সে-রকম ফল ভোগ করবে। আমি এখান থেকেই সব দেখতে পাই। তোমরা তোমাদের কর্মের জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছ আর এখন অনুতপ্ত হয়েছ বলে আমি তোমাদের ক্ষমা করলাম। তোমরা বাড়ী ফিরে যাও, তোমাদের আর কোন কষ্ট হবে না। ফিরে গিয়ে সমস্ত গ্রামবাসীদের বলবে যেন বছরে একটা দিন আমাকে নিশ্চিত স্মরণ করে। ঐ দিন কলাই, মুগ, মুসুর, ছোলা ইত্যাদি শস্যবীজ সমান্য অঙ্কুরিত করে আমার নামে উৎসর্গ করবে আর সন্ধ্যেবেলা জঙ্গল থেকে করম গাছের দুটি ডাল কেটে এনে গ্রামে পুঁতবে এবং দুর্বাঘাস, দুধ, তেল, সিঁদুর, ফুল ইত্যাদি দিয়ে আমার যথারীতি পূজো করবে। তা হলেই আমি খুশি হব। প্রতিদিন তোমরা এভাবে আমার পূজো করতে পারবে না, সেজন্য বছরে একদিন পূজো করলেই চলবে। এবার তোমরা খুশি মনেই বাড়ী ফিরে যাও।'

কার্মু-ধার্মু তখন করম ঠাকুরকে গরু-মহিষ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তুদের দুঃখের কথা জানাল। ডুমুর, কুল ও কাঁঠাল গাছের দুঃখের কথাও বলল।

এ কথা শুনে করম ঠাকুর বললেন–'এবার থেকে তোমরাই তাদের মালিক হবে। বাড়ী ফেরার সময় সে সমস্ত জীবজন্তুদের তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাবে।' ডুমুর, কুল ও কাঁঠাল গাছেরও পাপ তখন থেকে কেটে গেল। এরপর করম ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করল।

পথে গো-মহিষ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তুদের সঙ্গে তাদের দেখা হল এবং তারা তাদের করম ঠাকুরের বার্তা জানাল। জীবজন্তুদের সঙ্গে নিয়ে কার্মু-ধার্মু ডুমুর গাছের কাছে এলে পর ডুমুর গাছ খুশি হয়ে তাদের জানাল যে, তার দোষ কেটে গেছে, ডুমুরে আর পোকা লাগছে না। কার্মু-ধার্মু পেট ভরে ডুমুর পাকা খেল।

ডুমুর গাছের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার তারা পথ চলা শুরু করল। কাঁঠাল গাছ ও কুল গাছও কার্মু-ধার্মুকে অভ্যর্থনা জানাল, তাদের দোষ কেটে গেছে। কার্মু ও ধার্মু আনন্দে গান ধরল—

'তাঁহারে তারে নারে হো তাঁহারে তারে নারে হো
তাঁহা রেতা না হো।
করমে আনালোম সবায় হো
করম আনালোম ধরমে লাঁগিৎ ॥'

অর্থাৎ—

'সকলের মঙ্গল লাগি করম দেবতাকে নিয়ে এলাম।
করম দেবতাকে নিয়ে এলাম ধর্মের মান রাখার নিমিত্ত ॥'

কারাম গুরু এখানেই বিন্‌তী শেষ করে করম ঠাকুরের উদ্দেশে পরম ভক্তিভরে প্রণাম জানান।

ছাটিয়ার বিন্‌তী

চাচো ছাটিয়ার অনুষ্ঠানের সময়ে যে বিন্‌তী শোনা যায়, তাকেই 'ছাটিয়ার বিন্‌তী' বলা হয়। সাঁওতাল সমাজে এই চাচো ছাটিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠান হয় মুখ্যত পুত্র বা কন্যাকে সমাজভুক্ত করা উপলক্ষে। হিন্দু ব্রাহ্মণ ছেলেদের যেমন উপনয়ন দেওয়া হয়, কিংবা খৃষ্টানদের যেমন বাপ্তিস্ম করা হয়, তেমনি সাঁওতালী সমাজে 'চাচো ছাটিয়ার' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষা দেওয়া হয়। চাচো ছাটিয়ার অনেকটা সেই প্রকার অনুষ্ঠান, আর তা হয়ে থাকলে ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়ার কোন বাধা থাকে না। বিয়ের পর কন্যা সিঁদুর পরতে পারে, এবং মৃত্যু হলে পোড়ানো যায় কিংবা অস্থি বিসর্জন দেওয়া যায়। চাচো ছাটিয়ার না হয়ে থাকলে এসব কাজে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। সেজন্য এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিবাহের পূর্বে অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

যে বাড়ীতে চাচো ছাটিয়ার অনুষ্ঠানের হবে সে বাড়ীতে সকালবেলাতেই গ্রামের লোকজন নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়। মাঁঝি, জগ মাঁঝি, পারানিক, জগ পারনিক, নায়কে, গডেত কেউই বাদ যান না, এমন কি তাঁদের স্ত্রীরাও হাজির থাকেন। প্রথমে এক-এক জোড় দম্পতিকে তেল-হলুদ মাখিয়ে চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া হয়, পরে তাদের মধ্যে হাঁড়িয়া পরিবেশন করা হয়। সে সময়ে গান হয়—

তকয় মা রাচারে নিড়ি গেলে দ ?
তকয় মা বাটেরে নের্‌বা গেলে দ ?
আমকা মা রাচারে নিড়ি গেলে দ
আমকি মা বাটেরে নের্‌বা গেলে দ।
ঞেলজংগে সানাঞা নিড়ি গেলে দ
বাড়েজংগে সানাঞা নের্‌বা গেলে দ।

অর্থাৎ–

ওগো, কার উঠানে ইড়ির* শীষ ?
কার পথে এরবার** শীষ ?
অমুকের উঠানে ইড়ির শীষ,
অমুকের পথে এরবার শীষ।
দেখতে ইচ্ছা করে ইড়ি শীষ,
আমার ভাল লাগে এরবা শীষ।

আরো বেশ কিছু গান হয়, যেমন–

"নে তরা নেতে তরা মুরুম পাঞ্জা,
নে তরা নেতে সসাম পাঞ্জা।
পাঞ্জায়ে পাঞ্জায়ে মুরুম পাঞ্জা,
পেছায়ে পেছায়ে সসাম পাঞ্জা।
পোখোরি পিণ্ডীরে মুরুম পাঞ্জা,
নীদিয়া তিরেরে সসাম পাঞ্জা।
তলওয়ায়রে দ নায়ো সামানম ঘাঁণ্টি
নিয়ীড়োয়ায়রে দ নায়ো উরমাল পাঁয়গন।"

অর্থাৎ–

'এই যে এদিকে হরিণের পদচিহ্ন, হরিণীর পদচিহ্নও এই যে এদিকে। হরিণের পদচিহ্ন ধরে চলব, হরিণীর পেছনে পেছনে ধাওয়া করব। পুকুরের পাড়ে হরিণের পদচিহ্ন, নদীর তীরে হরিণীর পদচিহ্ন, বেঁধে দাও সোনার ঘণ্টা, পরিয়ে দাও নূপুর পায়ে।'

---

* ইড়ি–এক ধরণের বাজরা বা মিলেট জাতীয় শস্য।
** এরবা–এক ধরণের শস্য।

অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজকর্ম শেষ হলে পর সবাই ছাটিয়ার বিনতী শোনার জন্য বাড়ীর একপাশে সমবেত হয়। বিনতী গুরু সেখানে তাদের কাছে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপনের বিবরণী বর্ণনা করে যান। ভবিষ্যৎ বংশধররা সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জাতির ইতিহাস যেন ভুলে না যায়, সেজন্যই এ সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে বিনতী শোনানো হয়ে থাকে। এ অনেকটা পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা। বিনতী গুরু বলেন*–

'পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন ছিল। জল আর জল, শুধু জল। জলের নীচে ছিল মাটি। আকাশে বা স্বর্গলোক থাকতেন ঠাকুর ও ঠাকরাণ এবং অন্যান্য দেবতারা। তাঁরা একে অপরের হাত ধরে 'তোড়ে সুতো'তে করে এই জলাপুরীতে স্নান করতে আসতেন। ঠাকুর স্নান করতে এসে আস্তে আস্তে কাঁকড়া, কুমীর, চিংড়ি মাছ, রাঘব বোয়াল, কেঁচো, কাছিম প্রভৃতি জলচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এ সব সৃষ্টি করে ঠাকুর আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি মাটি দিয়ে দুটি মানবমূর্তি তৈরী করলেন আর তাদের প্রাণ দিতে গেলেন, এমন সময়ে আকাশ থেকে 'সিঞ সাদম' বা 'সূর্য ঘোড়া' এসে মূর্তি দুটিকে ভেঙ্গে দিয়ে গেল। এতে ঠাকুর খুব দুঃখ পেলেন। তিনি ঠিক করলেন যে, আর কখনও তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন না। এই বলে তিনি নিজের শরীরের ময়লা দিয়ে একটি হাঁস ও একটি হাঁসিল তৈরী করলেন। আর তাদের প্রাণ সঞ্চার করলেন। হাঁস-হাঁসিল দুটি তখন আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও তো বসবার জায়গা নেই, শেষে ঠাকুরের হাতে এসে বসল। সে সময়ে সিঞ সাদম নেমে এল জল খেতে। জল খেতে গিয়ে তার মুখের ফেনা জলে পড়ে ভাসতে লাগল। ঠাকুর তখন হাঁস-হাঁসিলকে ঐ ফেনার উপর বসতে আজ্ঞা দিলেন। তারা ফেনার উপর বসল। কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলবে ? একটা ভাল আশ্রয় তো চাই, সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্যে খাদ্যও চাই। তারা ঠাকুর জীউর কাছে খাদ্য ও আশ্রয় চাইল।

ঠাকুর জীউ তখন কুমীরকে ডেকে জলের নীচ থেকে মাটি আনতে বললেন। কুমীর মাটি নিয়ে আসার সময়ে সব মাটি জল গলে গেল। এরপর একে একে চিংড়ি মাছ, রাঘব বোয়াল, কাঁকড়া সবাই চেষ্টা করল কিন্তু কেউ আর মাটি তুলে আনতে পারল না।

---

* কারাম বিনতীর সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীর সঙ্গে ছাটিয়ার বিনতীর কাহিনীর মিল থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় অমিলও লক্ষ্য হয়।

ঠাকুর জীউ শেষে কেঁচোকে মাটি তুলে আনতে বললেন। কেঁচো বলল, কচ্ছপ যদি জলের উপর স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তাহলেই সে জলের নীচ থেকে মাটি আনতে পারবে। ঠাকুর জীউ তখন কচ্ছপকে ডেকে জলের উপর স্থির হয়ে থাকতে বললেন ; তার চার পা শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। কেঁচো তখন জলের তলায় মাটি খেয়ে লেজের দিক কচ্ছপের পিঠে রেখে সেই মাটি বের করে দিতে লাগল। এইভাবে প্রচুর মাটি তুলে কেঁচো থামাল। ঠাকুর তখন মই দিয়ে মাটি সমান করলেন। যে সব জায়গায় মাটির ঢিপি থেকে গেল সেগুলোই হল পাহাড়। এভাবে পৃথিবী তৈরি হল। ঠাকুর তখন মই দিয়ে মাটি সমান করলেন। যে সব জায়গায় মাটির ঢিপি থেকে গেল সেগুলোই হল পাহাড়। এভাবে পৃথিবী তৈরি হল। ঠাকুর সর্বপ্রথম শিরোম ঘাসের বীজ বুনলেন, তারপর দূর্বাঘাস, শেষে করম গাছ। কিছুদিন পর আস্তে আস্তে শাল গাছ, মহুয়া গাছ, কেন্দু গাছ ইত্যাদি গাছপালায় পৃথিবী ফুলে-ফলে বৃক্ষলতায় ভরে গেল।

একদিন শিরোম ঘাসের ঝোঁপে হাঁসিল দুটি ডিম পাড়ল, সেই ডিম থেকে জন্ম নিল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, পিলচু হাড়াম ও লিপচু বুড়হি। সাঁওতালী পুরাণ অনুসারে তারাই মানবজাতির আদি পিতামাতা। অর্থাৎ বাইবেলে উক্ত আদম আর ইভ। ঠাকুর জীউ শিশু দুটির দেখাশোনার ভার দিলেন লিটার ওপর। সে সময় বিন্‌তী গুরু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গান ধরেন–

"হায়রে ! শিরোম গেলে দ গেলেলেন দ,
বয়তে আমকি দ হোয় বুসাঁড়লেন দ
হায়রে ! মারাড় বাহা দ বাহালেন দ
বাবু আমকা দ হোয় জানামলেন দ।"

অর্থাৎ–

'হায়রে ! শিরোম ঘাসে শীষ দেখা দিয়েছিল,
ছোট্ট সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল
হায়রে ! মারাড় গাছে ফুল ফুটেছিল,
বাবু সোনা আমার ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।'

পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়হি বড় হল এবং তাদের সাত ছেলে ও সাত ময়ে হল। পৃথিবীতে তখন তারা ছাড়া আর কেউ নেই। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি সাত ছেলের সঙ্গে নিজেরই সাত মেয়ের বিবাহ দিলেন আর তাদের হাঁসদা, মুর্মু,

কিস্কু, হেমব্রম, মারাণ্ডি, সরেন ও টুডু সাত গোত্রে ভাগ করলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করলেন যে, একই গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর এবার থেকে বিবাহ দেওয়া চলবে না। বিবাহ সব সময় দুটি আলাদা আলাদা গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দিতে হবে।

দেখতে দেখতে তাদের বংশ বাড়তে লাগল। তারা তখন আর এক জায়গায় সবাই থাকতে পারল না, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। খজ-কামান হয়ে সাসাং বেড়াতে এল। সেখানে পুনরায় তাদের গোত্র বিভাজন হল, এবারে সাতটি পদবী ছাড়া আরো পাঁচটি পদবী যুক্ত হল। সেগুলি হল–বাস্‌কে, বেসরা, পাউরিয়া, চঁড়ে ও বেদেয়া। এ সম্পর্কে গানও বাঁধল তারা–

'হিহিড়ি-পিপিড়িরে বোন জানামলেন
খজ কামানরে বোন খজলেন
হারাতারে বোন হারালেন
সাসাং বেডারে বোন জাঁতএনা হো।'

হিহিড়ি-পিপিড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছে, খজ কামানে খোঁজ হয়েছে, হারাতাতে আমরা বেড়ে উঠেছি আর সাসাং বেডাতে জাতি বিভাজন হয়েছি।

এভাবে বিভিন্ন স্থান পরিক্রম করতে করতে তারা শেষে চায়-চাম্পাতে এসে উপস্থিত হয়। এখানে তারা বহু বছর পরম সুখে-শান্তিতে বাস করেছিল। কোন কিছুরই তাদের অভাব ছিল না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। কিস্কু গোষ্ঠী দেশ শাসনের ভার, হেমব্রম গোষ্ঠী শলা-পরামর্শ দেওয়ার ভার, মুর্মু গোষ্ঠী পূজা-অর্চনার ভার, মাণ্ডি গোষ্ঠী কৃষিকাজের ভার, সরেন গোষ্ঠী দেশরক্ষার ভার, বাস্কে গোষ্ঠী ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার আর টুডু গোষ্ঠী বিনোদেনের ভার পেয়েছিল। বিন্‌তী গুরু গান ধরেন–

'চায়-চাম্পা দিসম রেয়াঃ বিরিত্
হাঁটিঞলেদাক সানাম রিকিত
সরেন সিপাহি মুর্মু ঠাকুর
টুডু মাঁন্দাড়িয়া হেমব্রম কুঁয়ার॥

মাণ্ডি কিপিসাঁড় কিস্কু রাপাজ
সুলুক নিরাই রেয়াঃ রাজপাট
সেন্দ্‌রা কারকারেন শিকারিয়া
সেরেঞ রাহা ধাড় বাসকারিয়া॥'

অর্থাৎ–

'চায়-চাম্পা দেশের বৃত্তি
ভাগাভাগি করেছিল সবাই মিলে।
সরেন সিপাহী, মুর্মু ঠাকুর,
টুডু বাজনদার, হেমব্রম দেওয়ান॥

মাণ্ডি মহাজন, কিস্কু আনে,
সুখ-শান্তির রাজপাট আনে,
শিকার জঙ্গলের শিকারীরা
ধাড় অঞ্চলের সুরে গানে॥'

এরপর বিন্‌তী গুরু শিকারভূমের (শিখরভূম) ঘটনার উল্লেখ করে তার বর্ণনা শেষ করেন। শিকারভূমের প্রথম পারগানা (পরগণাইৎ) ছিলেন হিকিম পারগানা। ঐ অঞ্চলে তখন ছিল গভীর জঙ্গল–সিঞ বির ও মান বির হিকিম পারগানা তার লোকজনদের বলেন–'চল আমরা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতভূমি তৈরি করি। এই জঙ্গলে কেউ আর আমাদের জ্বালাতন করতে আসবে না। আমরা আবার নতুন করে চায়-চাম্পা গড়ে তুলি'। সবাই তাঁর কথা শুনেছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করে আবার নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিল, ইড়ি-এর্‌বা চাষ করেছিল। বহুদিন বিভিন্ন জায়গা ঘুরেতে ঘুরেতে তারা তাদের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন সবই কিন্তু ভুলে গিয়েছিল। সাঁত-শিকারভূমে আবার তারা সে সমস্ত চালু করল।

অকয়াঃ রাচারে নিম দ ?
হিপিড় হিপিড় নিম দ
নিম দারে দ।

ফালনাআং রাচারে নিম দ
হিপিড় হিপিড় নিম দ
নিম দারে দ।

অকয়ে যতনলেদা নিম দ ?
হিপিড় হিপিড় নিম দ
নিম দারে দ।

বাবায় রহয়লেদা নিম দ
হিপিড় হিপিড় নিম দ
নিম দারে দ।

নায়োয় যতনলেদা নিম দ
হিপিড় হিপিড় নিম দ।
নিম দারে দ।

অর্থাৎ–

কার উঠানে নিমগাছ ?
নিমগাছটি আন্দোলিত বাতাসে।

অমুকের উঠানে নিম গাছ ?
নিম গাছটি আন্দোলিত বাতাসে।

কে যত্ন করে নিমগাছ ?
নিম গাছটি আন্দোলিত বাতাসে।

বাবা রোপন করেছিল নিম গাছ,
নিমগাছটি আন্দোলিত বাতাসে।

মা যত্ন করেছিল নিমগাছ,
নিমগাছটি আন্দোলিত বাতাসে।

দলে দলে আরো খের্‌ওয়াল সমাজের মানুষ ঐ অঞ্চলে এসে বাড়ী-ঘর তৈরী করে আবার স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাত্রা শুরু করল। নতুন করে বসতি গড়ে ওঠার ফলে সিঞ্‌ বির ও মান বির বদলে গিয়ে হল 'সিংভূম' ও 'মানভূম'।

শেষে বিন্‌তী গুরু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন–"কাঁহু লেকালে তাঁহেকানা, বাঁক লেকালে পোণ্ডএনা, আদ আপে মঁড়ে হড়গে গোহা তাহেনপে।"

অর্থাৎ–আমরা কাকের মত ছিলাম, বকের মত সাদা হলাম, তোমরা পাঁচজন সাক্ষী।

এই বলে তিনি আসরের অবসান করান।

ভাণ্ডান বিন্‌তী

জন্মের, বিবাহের সঙ্গে মরণও অবশ্যম্ভাবী, আর তারও জন্যে অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট আছে। সাঁওতালীতে গান আছে–

নওয়া ধার্তি রেয়াঃ রাঁস্কা,
তিমিনা দিন চ তাঁহেনা রে ?
হয়গে জিউয়ি হাসাগে হড়মো
সারু সাকাম দাঃ লেকা টলমল
সেতাক্ রাতাং দাঃ লেকা বাং তাহেনা।

অর্থাৎ–

এ পৃথিবীর আনন্দ
কতদিন বা থাকবে ?
বাতাসই জীবন মাটির শরীর
কচু পাতার জলের মত টলমল
সকালের শিশিরের মত থাকে না।

মানুষের জীবন এ পৃথিবীতে কচু পাতার ওপর জলের মত ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়। ভগবানের মেপে দেওয়া পরমায়ু ফুরোলেই সবাইকে এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হয়। সাঁওতাল সমাজে মেয়েরা তখন বুক চাপড়ে, মাথা ঠুকে নানাভাবে মৃতের তুলনা করে রোদন করে। মা মারা গেল কাঁদে ঃ

হায়রে হায়রে, তওয়া দারে তিঞ দ
তওয়া দারে দগো গুরেন তিঞ দ।
তকা কণ্ড ইঞ দাঁড়ালেরে
তওয়া দারে রেয়াঃ রূপ এঞেল এঞামতায়া ?

হায়রে হায়রে, নিন দারা দ
সিম এঙ্গা লেকা গুঙ্গুৎলেৎ লেয়া।
তেহেঞ দ গ সিম হপন লেকা
তেহেঞ দ গম কটা বাঁগি ওটোওয়াৎ লেয়া।

হায়রে হায়রে, নিন দারা দ
জাঁহাঁ খনলে হিজুঃআ
ইঙ্গাঞ দ দুওয়াঁররে দুড়ুপ্‌কাতে
কিসনি হপন লেকায় চেরেচ দারামলেয়া।

অর্থাৎ–

হায় হায়, স্তন্যদাত্রী মা আমার মারা গেল। কোথায় গেল আবার আমার মায়ের মূর্তি দেখতে পাব ?

হায় হায়, মুরগীর মা যেমন বাচ্চাদের ডানার নীচে আগলে রাখে, এতদিন মা আমাদের তেমনভাবে আগলে রেখেছিল। আজ মুরগী বাচ্চার দশা আমাদের, মা আজ ছেড়ে চলে গেল।

হায় হায়, এতদিন যেখান থেকেই আসি না কেন, মা দুয়ারে বসে শালিক পাখির মত আদর করে কোলে নিত।

হায়, হায়, ! আজ আমাদের কে কোলে তুলে নেবে ?

বাবা মারা গেলে কাঁদে ঃ

হায়রে হায়রে, জানামদাতা তিঞ দ
জানাম দাতা দ তেহেঞ দয় বাঁগিয়াৎলেয়া।
তকা কণ্ড্ ইঞ দাঁড়ালেরে জানামদাতাওয়াঃ
রূপ দ বাবাঞ এ্রেল ঞামতায়া ?

অর্থাৎ–

হায় হায় ! আমার জন্মদাতা আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় খুঁজে বেড়ালে জন্মদাতার রূপ আবার দেখতে পাব ?

হায় হায়, পায়রা জোড়ার মত আমার স্বামী, আজ আমাদের জোড় ভেঙ্গে চলে গেল। কোথায় খুঁজে বেড়ালে আমার সেই সঙ্গীর রূপ দেখতে পাব ?

স্বামীর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী কাঁদে ঃ

হায়রে হায়রে, ছাতার উমুল তিঞ দ
ছাতার উমুল দগো অটাঙয়েন তিঞ দ।
তকা কণ্ড্ ইঞ দাঁড়ালেরে
ছাতার উমুল রেয়াঃ রূপ দঞ এ্রেল ঞামতায়া ?

হায়রে হায়রে, পার্ওয়া জুরীতিঞ দ
পার্ওয়া জুরী দলিঞ জড় ভাঙ্গাওয়েন।
তকা কণ্ড্ ইঞ দাঁড়ালেরে
পার্ওয়া জুরী রেয়াঃ রূপ দঞ এ্রেল ঞামতেয়া ?

অর্থাৎ–

হায় হায় ! আমার মাথায় ধরা আচ্ছাদানের ছায়া উড়িয়ে নিয়ে গেল ? কোথায় সন্ধান করলে আমার মাথার আচ্ছাদনের ছায়ার রূপ দেখতে পাব ?

ছেলেমেয়ে মারা গেলে মা কাঁদে :

হায়রে হায়রে, কুঁইডি মিরু তিঞ দ
কুঁইডি মিরু দ দয় ফারকাওয়েন তিঞা
তকা কণ্ড ইঞ দাঁড়ালেরে
কুঁইডি মিরু রেয়াঃ রূপ দঞ ঞেল ঞামতায়া ?

অর্থাৎ–

হায় হায়, আমার ছোট প্রাণপাখি, আমার প্রাণপাখি আজ উড়ে গেল। কোথায় খোঁজ করলে আমার প্রাণপাখির রূপ আবার দেখতে পাব ?

মেয়েরা এ রকম নানা কিছু বলে কান্নাকাটি করে। পরে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী যা যা করা উচিত অর্থাৎ মৃতদেহ সৎকার, অশৌচ পালন, তেল নাহান, অস্থি বিসর্জন ও শ্রাদ্ধ সমস্ত কিছু গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে করা হয়। ভাণ্ডান বা শ্রাদ্ধই মৃতের শেষকৃত্য। মৃত ব্যক্তি যেন পরলোকে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে সেই কামনায় এই শেষ কাজটুকু শ্রদ্ধাভরে করা হয়। অনুষ্ঠানের দিনে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের লোকজন শ্রাদ্ধবাড়ীতে উপস্থিত হয়। সন্ধ্যাবেলায় মৃত ব্যক্তি, পূর্বপুরুষ এবং মারাং বুরুকে স্মরণ করা হয়, আর হাঁড়িয়া উৎসর্গ করে বলা হয়–'জহার গঁসায়, আজকে মৃত মানুষের প্রাপ্য আমরা সম্প্রদান করছি, তোমরা মারাং বুরু ও পুরুধুল দেখেশুনে নাও।'

ঐ সময় যেভাবে মারাং বুরু, পুরুধুল ও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মন্ত্র (বাখেঁড়) পড়া হয়, তা হল :

"জহার গঁসায় মারাং বুরু, তেহেঞ দ নওয়া রাচারে ভাণ্ডান ঞুতুমতেলে এমামকান, চালাম কানলে, সুকতে সাঁওয়ারতে আতাঙকেয়া, তেলাকেয়াম। নাঁই পারম, গাডা পারম খন পেড়াক পাঁহড়াক, বালা ক, সাখা ক, ভাণ্ডান ঞুতুমতে ক হেচ্আকান, সেটেরকান ক, হেঁসেজগে সেঁকরেজগে, নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গঁসায়। নঃঅয় তেহেঞ দ সঃচ্ আকান বিন্দীড় আকানিচ্ বাঁটআঃ বাখ্রাওয়াঃলে এমকাতায়কানা, আবেন মারাং বুরু আর পুরুধুল দ ঞেলকাতায় আতেনকাতায়বেন।

জহার গঁসায় বঙ্গা তালাআকান হড়, তেহেঞ দ নওয়া রাচারে ভাণ্ডান ঞুতুমতে বাঁটআঃ, বাখ্‌রাওয়াঃ এমাম, চালাম কানালে, খুসিতে খুসীলতেমে আতাঙআ, নিয়ীগেম চেরেচকে মারাংকেয়া বাপু ঠাকুর তিঞ দ।

জহার তবে আম বঙ্গা তালাআকান হড় নে সেয়া মীনডি, সেয়া দাকা, এমাম, চালাম কানা, খুসিতে খুসীলতেমে আতাঙা, তেলায়া, নিয়ী বাড়ে সুককঃক, রেবেনকঃক্‌মে। আলে হঁ জম আলে, হাবালে লাচ্‌ হাসো, বহঃ হাসো আল অ সিরজীউ গাড়হাওঃমা, গঁসায় বাপু ঠাকুর তিঞ দ।"

অর্থাৎ–

'জহার গঁসায় মারাং বুরু, আজ এই আঙ্গিনায় শ্রাদ্ধের নামে আমরা তোমাকে দান দিচ্ছি, সম্প্রদান করছি, খুশি মনে গ্রহণ করো। নদীনালা পেরিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বেয়াই-বেয়ান শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এসে সবাই পৌঁচেছে গঁসায়, তাদের ভাল সুস্থ রাখ। আজ মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য আমরা সম্প্রদান করছি, তোমরা মারাং বুরু ও পুরুধুল দেখে নাও।

জহার হে পরলোকবাসী, আজ তোমার প্রাপ্য তোমাকে সম্প্রদান ও সমর্পণ করছি, খুশি মনে গ্রহণ কর। গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও, হে ঠাকুর।

জহার হে পরলোকবাসী, এই পচা মদ, পচা ভাত তোমায় সমর্পণ করছি, খুশি মনে এগুলো গ্রহণ কর। এতেই তুমি যেন সুখে-শান্তিতে থাক। আমরাও এ সব খাব, গলাধঃরণ করব, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, আমাদের যেন না হয় গঁসায়, আমার ঠাকুর গো।'

এরপর অনুষ্ঠানের অন্যান্য কাজকর্ম হয়ে গেলে পর সবাই ভাণ্ডান বিন্‌তী শোনার জন্য উঠানের একপাশে একত্রিত হয়। ভাণ্ডান বিন্‌তী যিনি বলবেন অর্থাৎ বিন্‌তীকার সেখানে এসে তখন শুরু করেন ভাণ্ডান বিন্‌তী এবং তা ব্যাখ্যা করে যান।

সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, পূর্ব-পুরুষদের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপনের বিবরণ, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিয়ম-কানুন প্রভৃতি বিষয় একের পর এক তিনি তাদের কাছে তুলে ধরেন। তার বর্ণনায় সঙ্গে সাঁওতাল গুরু কলেয়ান হাড়ামের বর্ণনার মিল দেখা যায় সাঁওতালদের চিতরিঘুটুতে বসবাসকাল পর্যন্ত। এতে বোঝা যায় চিতরিঘুটু পর্যন্ত তারা দলবদ্ধভাবেই বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ

করেছে এবং বসবাস করেছে। তারপরই তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কোন দল গেছে লখন মাঁঝির নেতৃত্বে, কোন দল মুদি মাঁঝির নেতৃত্বে, কোন দল হিকিম মাঁঝির নেতৃত্বে। এভাবে বিভিন্ন মাঁঝির নেতৃত্বে তারা নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছে, বসতি গড়ে তুলেছে, উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এখানে একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিই। বিভিন্ন সময়ে মাঁঝির আশ্রয়ে তাদের দিন কেটেছে, তাই তাদের ভাগুান বিন্‌তীও বিভিন্ন জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন রকম হয়ে গেছে। যাই হোক–এদেলঘুটুতে সাঁওতালরা একসময় বসতি স্থাপন করে। তাদের মাঁঝির নাম ছিল ধানো মাঁঝি। মাঁঝির এক ছেলে এবং তিন মেয়ে। ঘরে ধান-চালের অভাব নেই। জমি-জায়গা প্রচুর। সব সময়ে লোকজন কাজ করে।

সংসারে কোন চিন্তা নেই। মেয়েরাও বড় হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন গ্রামের শেষ প্রান্তে এক পুকুরে তারা স্নান করতে যায় আর ফেরার সময়ে কলসীতে জল ভরে নিয়ে আসে, সেই জলেই তাদের রান্না-বান্না হয়। এ ভাবেই তাদের দিন কাটছিল। কিন্তু সময় চিরদিন একরকম যায় না, কিছু মুসলমান ঐ গ্রামে এসে বসতি করল। এ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এ সব ঘটনা দীর্ঘদিন আগের নয়। মুসলমানরা এ দেশে এসেছে দ্বাদশ শতাব্দীতে, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের মধুর সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র সফল হলেও এখানে তারা একটি সাঁওতালকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারেনি। ধানো মাঁঝির মেয়েদের দিকে তাদের কুনজর পড়ল। মেয়েরা পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছে কিংবা স্নান করে ফিরছে দেখলেই তারা তাদের নানাভাবে উত্যক্ত জ্বালাতন করতে লাগল। বাধ্য হয়ে মেয়েরা তাদের মাকে সব কথা জানাল। জাতি-ধর্ম নাশ হওয়ার ভয়ে মাঁঝিগিন্নী অবিলম্বে ধানো মাঁঝিকে গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা বলল। গানে আছে ঃ

'দারে ধানো মাগ্‌মেসে
হুদাড় ধানো লাগ্‌মেসে
গেল্ বার্ ঝীল গাডি ধানো বেনাওমেসে !
চল ধানো জা চল ধানো জা
জাঁহাঁ মুলুক লাং উড়ুক ইদিকওয়া।'

অর্থাৎ–

ধানো তুমি গাছ কাট,
ধানো তুমি গাড়ির কাঠাম তৈরী কর,
বারো হাত লম্বা গাড়ি ধানো তৈরী কর,
ধানো চল ধানো চল,
যে কোন দেশে আমরা চলে যাই॥

মাঁঝিগিন্নী প্রতিদিনই ধানো মাঁঝির কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। উপায় নেই, মুসলমানদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত ধানো মাঁঝি গাড়ি তৈরীর কাজে হাত দিল। গাড়ি তৈরী হল। এবার কি ভাবে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে চুপি চুপি পালানো যায় ? দিনের বেলা পালানো যায় না, তাই এক অমাবস্যার দিন এক ঘুম দিয়ে ধানো মাঁঝি স্বপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করল।

সেই বিস্মৃতকালেও মুসলমানদের ভয়ে নির্বিরোধ সাঁওতাল পরিবারের গ্রাম ত্যাগ একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়।

গ্রাম ছেড়ে বহুদূর আসার পর মাঁঝিগিন্নী কাঁদতে কাঁদতে গাইতে লাগল–

তাঁহাঁ রেতা নানা তারনা
তাঁহাঁ রেতা নানারে
ঞুঁৎ ঞিন্দী খাড়াং খচাং
অকা হরতে অকা হরতে
গাডি ধানো জা চালাঃআ ?
লাগা লাগা লাগামেয়া
গাডি ধানো জা
বাঁইরীক সেটেরকে লাণ্ডা
এতমরে মা উসুল বুরু
কঁয়েরে মা সবরনাকা
অনা তালা তালাতে
গাডি ধানো জা লাগায়মে।

অর্থাৎ–

'রাতের অন্ধকারে খানা-খন্দ ভরা রাস্তায় গাড়ি কোন্ পথে যাবে ? ধানো, তুমি তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও, নতুবা শত্রুরা এসে পড়বে। বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়, ডান দিকে সুবর্ণরেখা নদী, তার মাঝ দিয়েই তুমি দ্রুত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাও।'

যেতে যেতে তারা রাস্তার ধারে এক ভাটিখানা দেখতে পেল। ধানো মাঁঝির দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্যই নাকি মারাং বুরু ঐ ভাটিখানা তৈরী করে রেখেছিলেন। ধানো মাঁঝি ভাটিখানার কাছে গিয়ে মালিককে জিজ্ঞাসা করল–আচ্ছা ভাই, এ রাস্তা কোথায় গেছে ?

ভাটিখানার মালিক এ কথার জবাব না দিয়ে উল্টে জিজ্ঞাসা করল–ধানো মাঁঝি, এত রাতেই-বা তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

ধানো মাঁঝি তখন তার দুঃখের কথা ভাটিখানার মালিককে জানালো। সব কথা শুনে ভাটিখানার মালিক একটি শূকর এবং এক বোতল মদ ধানো মাঁঝিকে দিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার যে জায়গা ভাল লাগবে, সেখানেই তুমি গাড়ি থামাবে আর মারাং বুরুর উদ্দেশে কয়েক ফোঁটা মদ ও শূকরটিকে উৎসর্গ করবে। এছাড়া, গরুদের গা ধুয়ে তাদের শিঙে তেল মাখিয়ে দেবে।'

ভাটিখানার মালিকের এ সব কথা শোনার পর ধানো মাঁঝি গাড়ি ছেড়ে দিল।

ওদিকে এদেলঘুটুর মুসলমানরা ধানো মাঁঝির গ্রাম ত্যাগের কথা জানতে পেরে খুঁঝতে বের হল এবং সেই ভাটিখানায় এসে মালিককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। মালিকও তাদের জানাল যে, কিছুক্ষণ আগে একটা গাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ কথা শুনে মুসলমান ক'জন আর দাঁড়াল না, তারা ধানো মাঁঝিদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুদূর যেতেই তাদের প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হল। যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে তারা ভাটিখানার মালিকের কাছে ফিরে এল এবং তারা কাতরভাবে এ বিপদে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। মারাং বুরু তাদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তাদের জন্যই ধানো মাঁঝি গ্রামছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। তবুও তিনি তাদের যন্ত্রণায় প্রতিবিধান করে দেন। তারপর থেকেই মুসলমান সমাজে মদ ও শূয়োর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়, তারা সৈয়দ, শেখ, মিঞা, মীর্জা ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কিন্তু মুসলমান সমাজে আজও জাতিভেদ নেই। ঘটনার ঐতিহাসিকতা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এক শ্রেণীর বহিরাগত মুসলমানের অত্যাচারে আদিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে স্থান ত্যাগ করতে যে বাধ্য হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরদিন সকালে ধানো মাঁঝির গাড়ি এক আদিবাসী গ্রামে এসে পৌঁছালো। গ্রামটি তাদের পছন্দ হল এবং ধানো মাঁঝি সে গ্রামের মাঁঝির কাছে গিয়ে বাড়ী-

ঘর তৈরীর জন্য কিছু জমি-জায়গা চাইলো। ঐ গ্রামের মাঁঝিও আপত্তি করল না। ধানো মাঁঝি সেখানে গরুদের গা ধুয়ে শিংয়ে তেল মাখালো। সেদিন অমাবস্যা ছিল এবং সাঁওতাল সমাজে এই অমাবস্যা তিথিকেই বেশী মানা হয়। সহরায় উৎসবের সময় অমাবস্যার রাতেই গরুদের জাগানো হয়, পরের দিন শুয়োর-মুরগি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়, মেয়ে-জামাইদের উৎসবে নেমতন্ন করে আনা হয়।

ধানো মাঁঝি সেই গ্রামেই বাড়ী-ঘর তৈরী করে বসবাস শুরু করল। আস্তে আস্তে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দিল। দেখতে দেখতে বহু বছর কেটে গেল এবং একদিন ধানো মাঁঝির মৃত্যু হল। ছেলে ধরম তখন ঐ গ্রামের মাঁঝির কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল–

"এ বাবা মাঁঞ্হি বাবা, উন দিন উমিন দিন দ
ইঞ বাবা দ সেতাঃ আঙ্গাআকান সে
লান্দাকাতেৎগে হহ রড় বাড়ায়া
তিহিঞ দ মাঁঞ্হি বাবা ইঞ বাবা দ
পারকম খনাঃ গে বায় বেরেৎকান।"

অর্থাৎ–

'ও মাঁঝি, বাবা এতদিন
আমার বাবা সকাল হলেই
হাসিমুখে ডাকতেন, কথা বলতেন,
আজ মাঁঝি বাবা, আমার বাবা
খাট ছেড়ে উঠছে না।'

গ্রামের মাঁঝি তখন আর পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ধানো মাঁঝির বাড়ীতে গেল এবং দেখল যে ধানো মাঁঝি মারা গিয়েছে। মাঁঝির কথামত গ্রামের বাইরে ধানো মাঁঝির মৃতদেহ দাহ করার ব্যবস্থা হল। মৃতদেহ দাহ করার সময়ে গ্রামের সবাই একখণ্ড করে কাঠ চিতার আগুনে দিল আর মৃতের উদ্দেশে বলল–"নে বাবা, মিমিৎ ডাঁর সাহানলে এমাৎমেয়া জত হড়তে, আদ আলম বিলমলেয়া, হয় লেকা চালাঃমে।" অর্থাৎ–'নাও বাবা, এক টুকরা করে কাঠ সবাই দিলাম, আর দেরী করো না, বাতাসের মত চলে যাও।'

মৃত্যুর পাঁচ দিন পর 'তেল-নাহান' বা ছোট শ্রাদ্ধ। ধরম মাঁঝি পিতার মৃত্যুসংবাদ বোনদের দিতে গেল। বোনরা তাকে আদর করে বসতে আসন দিল আর বলল–

"এ দাদা মারাং দাদা
নে মাচি নে গাণ্ডো, মা দুড়ুবমে"

উত্তর ধরম মাঁঝি বলল–

"বাঁঞ দুড়ুব বহিন বাঁঞ তিঙ্গুন
বাবা বহিন গো বাঁদে লাতার
মারাং খিজুর বুটারে
বাবা বহিন গো সার্‌দী সেঙ্গেল।"

অর্থাৎ–

'না বোন, বসব না দাঁড়াব না,
বাবা বাঁধের নীচে,
বড় খেজুর গাছের নীচে,
বাবাকে দাহ করা হয়েছে।'

বাপধন সব, ধরম মাঁঝি তার তিন বোনকেই জানিয়ে এল যে, তাদের বাবা রাতের বেলা কাউকে কিছু না বলেই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। পাঁচ দিন পরে তার আত্মার উদ্দেশে তর্পন করা হবে, তারা যেন সবাই সে সময়ে হাজির হয়। ঐ দিন ধরম মাঁঝির বোনরা সবাই কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত।

'বাবা রেয়াঃ জাঙ বাহা হঁ
মহর মেটাওএন,
বাবা রেনাঃ সারা কাট হঁ
ল তরচএন।

বাবা রেয়াঃ সসানরে
ধুবি ঘাঁস হঁ জানামএন,
টুওয়ীর এনাঞ মারাং দাদা
খবরাঞ কান।'

অর্থাৎ–

'বাবার অস্থি বিলুপ্ত হল,
বাবার চিতার কাঠ পুড়ে ছাই হল।

বাবার শ্মশানে দুর্বাঘাস জন্মাল,
বড় দাদা খবর দেওয়ায় অনাথ হলাম॥'

এ ধরনের আরো গান আছে এবং প্রত্যেকটি গানই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আর একটি গান উল্লেখ করি ঃ

'আয়ো-বাবা গুজুঃ বুরু
খবরাঞমে মারাং দাদা
উকুর দাদাম উকুর দাদাম খবরাদিঞ দ ?
আয়ো-বাবা জাঙ বাহা
হাসারে মিলাওএন, ধুবি ঘাঁস দ অমনএন
তালা দাদা তালা ঞিন্দীয় খবরাদিঞ দ।"

অর্থাৎ–

'মা-বাবার মৃত্যুর সময়
বড় দাদা আমাকে খবর দিও।
দাদা কই আমাকে তো খবর দিলে না ?
মা-বাবার অস্থি মাটিতে মিশে গেল
দুর্বাঘাসের জন্ম হল
মেজো দাদা মাঝরাতে আমাকে খবর দিল।'

তেল-নাহানের সময় তিনটি ছোট ছোট কাঠ, কেন্দু কাঠ, শাল কাঠ ও মহুয়া কাঠ আড়াআড়িভাবে চাঙ্গার মত একসঙ্গে বাঁধা হয় এবং বাড়ীর মেয়েরা মৃতের অস্থি মুঠো করে সেই কাঠের উপর ধরে আর গ্রামের সবাই একে একে হলুদ গোলা জল ঢেলে দেয়। এই অস্থি মৃতের স্ত্রী, ভাই ও বোনরা ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। পরে সেই অস্থি মাটির নতুন ভাঁড়ে ভরে মাটি দিয়ে ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তেল-নাহান অনুষ্ঠানের এটাই প্রধান কাজ।

তেল-নাহান অনুষ্ঠান হওয়ার ২১ দিন পর থেকে তিন বছরের মধ্যে যে কোন এক সময় নদীতে সেই অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় গান করা হয়–

নাইতেম ইদিঞমে দ বাবু তির্‌য়ো অরং মে,
নাইতেম ইদিঞরে দ বাবু তির্‌য়ো বাবু অরংমে
তালা নাই কাঁসাইরে দ বাবু
বহেল গিডি মে॥

নীইতেম আঁড়গোনরে দ বীবু
হরিবোল হরিবোল লীইয়াম বীবু
তালা নীই কাঁসাইরে দ জাঙ বাহা
বহেল গিডি মে॥

নীই খন রাকাবরে দ বীবু
মেঁৎদাঃ বাবু জরয়মে
তায়ম সেৎ দ আল বীবুম
কয়গ্ রুওয়ীড়া॥

অর্থাৎ–

'আমাকে নদীতে নিয়ে যাবার সময় বাবু বাঁশী বাজাবে,
আমাকে নদীতে নিয়ে যাবার সময় বাবু বাঁশী বাজাবে,
কাঁসাই নদীর মাঝখানে বাবু,
আমাকে ভাসিয়ে দেবে॥

নদীতে নামবার সময় বাবু
হরিবোল হরিবোল বলবে,
কাঁসাই নদীর মাঝখানে বাবু
আমার অস্থি ভাসিয়ে দেবে॥

নদী থেকে উঠবার সময় বাবু
চোখের জল ফেলবে,
পিছন ফিরে বাবু
আর তাকাবে না।'

এ ধরণের একাধিক গান এ সময়ে গাওয়া হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সাঁওতাল সমাজের প্রিয়জনের সৎকারবিধির প্রতিটি ঘটনা নিয়ে সহজ, সরল ভাষায় এ সব গান রচিত হলেও এগুলির সাহিত্যমূল্যও কম না। এই গানগুলির জন্যেই সাঁওতাল সংস্কৃতি আজও টিকে আছে। হরিবোল শব্দটি থেকে ও চিতা জ্বালানোর মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির নিশ্চিত নিদর্শন অক্লেশে পাওয়া যায়। মনে হয়, দীর্ঘদিন প্রতিবেশীরূপে বাস করার ফলে উভয় সংস্কৃতি মিশ্রিত মিলিত হয়ে গিয়েছিল এই অন্তিমযাত্রা উপলক্ষে।

জম সিম্ বিন্‌তী

'জম সিম বিন্‌তী'ই সাঁওতালদের সবচেয়ে প্রিয় বিন্‌তী। এ বিন্‌তী সব সময়ে শুনতে পাওয়া যায় না। গ্রামে-ঘরে ছাটিয়ার অনুষ্ঠান, ভাণ্ডান অনুষ্ঠান কিংবা কারাম উৎসব প্রায়ই হয়ে থাকে ; তাই ছাটিয়ার বিন্‌তী, ভাণ্ডান বিন্‌তী কিংবা কারাম বিন্‌তী শোনার সুযোগ অনেকেরই হয়, কিন্তু জম সিম বিন্‌তী কালে-ভদ্রে হয়ে থাকে, তাই এ বিন্‌তী শোনার সৌভাগ্য সবার হয়ে ওঠে না। কেবলমাত্র জম সিম বোঙ্গার পুজোর সময়ে এ বিন্‌তী গাওয়া হয়। এ সম্পর্কে ক্যাম্পবেল ডিক্সনারীতে ঐ কথাই বলা হয়েছে–

'A festival observed in honour of the sun. This festival is not observed at regular intervals, but each family strives to observe it once in a lifetime. Where the people are well-to-do and so inclined a period of five years is allowed to elapse between the celebrations. The jom sim is a family sacrifice, and not of the village or community.'

(Campbells, Santali-English Dictionary, P-363)

রেভাঃ পি. ও. বোডিং এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"The traditions of the Santals say that in olden times the ancestors sacrified to sing bonga, the Day-god, the sun, only. At the present time they have different jorn sim bongas (Ahan, Badha Ahan, Baran baran, Anhar, Panhar, Boerangi and Seoanai are some names given, besides several others). It is said that a man should perform this sacrifice once every five years, and at least once in his lifetime. It is a family festival-sacrifice. All relatives in the male line are invited, also sisters and their children, daughters with their husbands and children (co-parents-in-law must not be invited). It is a large and costly affair. As a curiosity it might be mentioned that a pregnant woman attending gets two

dishes, one for herself and one for the unborn child; this happens only at jom sim. The sacrifices are performed at sunrise, in some cases when the sun is just half above the horizon, the sacrificers being naked, except for a wet loin-strip (bhagwa), as they come from having bathed".

(A Santal Disctionary. Vol.-3. P-336-337)

ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার সিম বোঙ্গা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

'Sometimes they adore him as the sim-bonga, the god who eats chickens, and once in four or five years a feast in his honour is held.'

(The Annals of Rural Bengal, P-128)

এবার সাঁওতাল গুরু কলেয়ান হাড়াম কি বলেছেন তই দেখা যাক্। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঃ

"জম সিম দ সেরমা সেরমা বালে বোংগাঃআ, একেন জাঁহাতিস জাঁহাতিস। সিঞ্ বোংগা মিৎ মেরমলে বোংগাওয়ায়েআ, আর জম সিম বোংগা মিৎ মেরম স্যে ভেডালে বোংগায়েআ উনরে দ। বাঁখেড় দ জুদী বীনুঃআনেচ্ একেন মুচীৎরে সিঞ্ বোংগালে মেতায়েআ ঃ সেরমা সেরমা বালে দাড়েয়াঃকানা, অনাতে আলোম আগারক্ কারাড়ঃআ।

মারে হাপড়ামকো লীই ওটো আকাওয়াৎলেয়া বাংমা, জিউয়েৎরে মিৎ ধাও জাঁহাঁ লেকাতে সিঞ্ বোংগা বাড়ে বোংগাওয়াপে, রেঙ্গেচ্‌পে তাহেন রেহঁ, আর তাহেনতাপে খান মঁড়ে তুরুই সেরমা আঁটরে বাড়ে বোংগাওয়াপে, বাংখান হানা পুরিরে বোগে অহয় মেনলেপেয়া। আঁদরে দ সিঞ্ বোংগা এসকারকো বোংগাওয়ে কান তাঁহেকানা, জম সিম বোংগা দ তায়োমতেকো জুটুচ্ আকাদেয়া।"*

অর্থাৎ–

'জম সিম' আমরা প্রতি বছর করি না, শুধু মাঝে মাঝে। সিঞ্ বোঙ্গাকে একটি ছাগল পূজা দিই আর জম সিম দেবতাকে একটি ছাগল কিংবা

* হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, পৃ-২৪৮

ভেড়া উৎসর্গ করি সে সময়ে। পূজার মন্ত্র আলাদা আলাদা কিছু নেই, শুধু শেষে সিঞ্ বোঙ্গার কাছে প্রার্থনা করি ঃ প্রতি বছর তোমাকে স্মরণ করতে পারছি না, সেজন্য ক্ষমা করো।

পূর্বপুরুষেরা আমাদের বলে গেছেন যে, জীবনে অন্তত একবার যে কোন-রকমে সিঞ্ বোঙ্গার পূজো করবে গরীব হলেও, আর অবস্থা ভাল হলে পাঁচ-ছয় বছর অন্তর সে পূজো করবেই, তা না হলে পরলোকে মঙ্গল হবে না। আদিতে শুধুমাত্র সিঞ্ বোঙ্গারই পূজা করা হচ্ছিল, পরে জম সিম বোঙ্গাকেও যুক্ত করা হয়েছে।'

কলেয়ান গুরু আরও বলেছেন যে, পূর্বে সাঁওতালদের জম সিম বোঙ্গা ছিল না। সিঞ্ বোঙ্গার পূজার পর এক সাঁওতাল পূজার স্থানে ভুল করে টাঙ্গি* ফেলে আসে। রাস্তায় টাঙ্গির কথা মনে পড়ায় সে টাঙ্গি আনতে দৌড়ে ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে জম সিম বোঙ্গাকে দেখতে পায় ; দেবতা তখন তার ফেলে দেওয়া খাবার কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছেন আর খেতে খেতে বলছেন ঃ "আঃ এতক্ষণে খেতে পেলাম।"

লোকটিকে দেখেই দেবতা অদৃশ্য হলেন। লোকটিও টাঙ্গি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। কিন্তু দেবতার আবির্ভাবের কথা বাড়ীর লোককে আর জানায় না।

কিছুদিন পর বাড়ীর লোক একের পর এক জ্বর-অসুখে পড়তে লাগল, নানা বিপদও অবিরাম ঘটতে থাকল। বাড়ীর লোক ওঝার কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে জানতে পারল যে, এক নতুন দেবতা ঐ বাড়ীর পূজা চাইছেন। সেই লোকটির তখন পুরানো সব ঘটনা মনে পড়ল। ওঝা তখন তাদের জম সিম অনুষ্ঠান করে ঐ নতুন দেবতার নামে পূজা দিতে বলল। তারপর থেকেই সাঁওতাল সমাজে জমসিম বোঙ্গার পূজা প্রচলিত হয়।

বিভিন্ন গোত্রের জম সিম বোঙ্গাও আলাদা আলাদা। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থে পাওয়া যায়–

"জম সিম বোঙ্গা জুদী হঁকো জুদীগেতাকোওয়া। অকয়রেন দ পানহাড়, অকয় দ আনহড়, অকয়রেন দ বয়রাঙ্গি। অকয় দ সেওয়ানি অকয়রেন দ বারাং বারাং আর অকয় দ বাড়্হা আহাংকো মেতায়তাকোওয়া জম সিম বোঙ্গা দ।"**

---

* টাঙ্গি–এক জাতীয় ছোট কুঠার।

** হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, পৃ-২০৭

অর্থাৎ–

তাদের জম সিম বোঙ্গাও আলাদা আলাদা। কারো বা 'পানহাড়', কারো বা 'আনহড়' কারো 'বয়রাঙ্গি' কেউ বা 'সেওয়ানি' কারো বা 'বারাং বারাং' আবার কেউ-বা জম সিম বোঙ্গাকে 'বাড়হা আহাং' বলে থাকে।

এই জম সিম বোঙ্গার পূজার সময়েই বিন্‌তীকার জম সিম বিন্‌তী গ্রামবাসীদের শোনান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে–জম সিম বোঙ্গার পূজা প্রতি বছর কেন করা হয় না? পূজার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই কেন ? আর কি কারণেই বা জম সিম বোঙ্গার পূজা করা হয় ? পূজার উদ্দেশ্য কি ? এ পূজা কি খুশিমত করা চলে ? নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেন 'জম সিম বিন্‌তী'র লিখিত রূপ দিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনিও কোথাও এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাননি। আমি অনেকের কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করেছেন। যাই হোক, যেটুকু জানতে পেরেছি তা হল, বাড়ীতে যদি প্রায় জ্বর-জ্বালা হতে থাকে, তখন মনে করা হয় যে গোত্রের জম সিম বোঙ্গার নিশ্চিত ক্ষিদে পেয়েছে। তাই জম সিম বোঙ্গার পূজা করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ব্যবস্থা করা হয়। এ পূজাও বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ। পূজা করার সময় ঐ বংশের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের, যে যেখানেই থাকুক না কেন সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়, কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। ফলে, পূজার সময়ে অনেক অপরিচিত দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়।

জম সিম বিন্‌তী কথনের সময়ে বিন্‌তীকার যে সব বিষয় বর্ণনা করেন, সেগুলি হল ঃ

১। স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের কথা ;

২। ঠাকুর কর্তৃক গাছপালা, জীবজন্তু ও মানব সৃষ্টির বিবরণ ;

৩। 'হাঁড়িয়া' তৈরীর কথা ;

৪। তুলা চাষ ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরীর কাহিনী ;

৫। মানবজাতির পাপ ও ঠাকুরের দয়া ;

৬। কিস্কু ও মাণ্ডি গোষ্ঠীর বিবাদের কাহিনী ইত্যাদি।

কলেয়ান গুরুর পুরাণ কথা 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' এবং কারাম বিন্‌তী'তে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বিবরণী পাওয়া যায়, জম সিম বিন্‌তীতে কিন্তু অবিকল তা পাওয়া যায় না। সাঁওতালী পুরাণে আমরা পাই যে, আদিতে এ পৃথিবী জলমগ্ন ছিল এবং ঠাকুর জীউ সেই অনন্ত জলরাশির উপর বিরাজ

করতেন। কিন্তু জম সিম বিন্‌তীতে আমরা তা পাই না। সেখানে একটা কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরে বিন্‌তী আরম্ভ হয়েছে। এ পৃথিবী তখন জনহীন ছিল। স্বর্গলোকে থাকতেন ঠাকুর, ঠাকরাণ এবং অন্যান্য দেবতারা। তাঁরা কে কি কাজ করতেন তা জানা যায় না, তবে সাঁওতাল সমাজের গুরু লিটা ছিলেন ঠাকুরের বার্তাবাহক। লিটারা তিন ভাই বোন। জাহের বুড়িহি লিটার দিদি সবচেয়ে বড়, আর ছোট ভাইয়ের নাম ধরম। তারা তিনজনই ঠাকুরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করতেন। লিটার কথা তো পূর্বেই উল্লেখ করেছি, জাহের বুড়িহি ঠাকুরের ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন, এজন্য তাঁকে ঝাড়ু হাতে কল্পনা করা হয়েছে। আর ছোট ভাই ধরম ঠাকুরের খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কাজকর্ম দেখতেন।

স্বর্গলোকে প্রায়ই দেবতাদের সভা বসত। সেখানে ঠাকুর আরাম কেদারায় বসে অন্যান্য দেবতাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন এবং সমাধান করতেন। এ অনেকটা হিন্দু পুরাণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতিলিপি।

একদিন ঠাকুর লিটাকে বললেন—'লিটা, এই স্বর্গলোক থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সবকিছু একঘেয়ে লাগছে, ঠাকরাণও প্রায় এ কথাই বলে। তুমি একটা নতুন জায়গা খুঁজে বের কর, যেখানে আমরা কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিয়ে ফিরে আসতে পারি। তাহলে মনটা আমাদের আবার চাঙ্গা হবে।'

লিটা তখন এই মর্ত্যলোকে নেমে ঠাকুরের থাকার জন্য বাড়ী তৈরী শুরু করলেন, জাহের বুড়িহি লিটাকে কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। এ সম্পর্কে যে গানটি শোনা যায়, সেটি তারা প্রচলিত ডাহার গানের প্রথমে গায় ঃ

মা লিটা মাগ্‌মেসে
মারাং অড়াঃরে জালিম দ
সামনিরে ডিগিরে
ইপিল দুকিন রাকাপ্‌এনারে।
জলম বোয় জলমমে
মারাং অড়াঃরে জালিম দ
সামানিরে ডিগিরে
ইপিল দুকিন রাকাপ্‌এনারে।

অর্থাৎ—

জাহের বুড়হি লিটাকে বলছেন–'এ বাবু লিটা, বড় ঘরের চালের আড়া কাঠ তাড়াতাড়ি কাট, ঐ যে ঠাকুর ও ঠাকরাণ দেখার জন্য তারার মত আকাশে উঠেছেন।

সে সময় লিটাও বলছেন–ও দিদি, তুমিও বড় ঘরে মাটির প্রলেপ লাগাও, ঐ যে ঠাকুর ঠাকরাণ দেখার জন্য তারার মত আকাশে উঠেছেন।

গানটি অতি পুরানো এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সাঁওতালী শব্দ এ গানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। মারাং বুরু ও জাহের এরাকে স্মরণ ক'রে আজও তারা এ গানটি গেয়ে থাকে।

ঠাকুর ও ঠাকরাণ এই মর্ত্যলোকে নেমে এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য দেবতারাও। কিন্তু মর্ত্যলোকে জল নেই, অগত্যা স্বর্গলোকের 'তোড়ে পুখরি' এবং 'বাহা বাঁদেলা' থেকে তোড়ে সুতামে ঝুলিয়ে জল আনা হল। গানে আছে ঃ

"তোড়েগর পুখরি হো বাহাগর বাঁদেলারে
তোড়েগর সুতামতেহো ইনাতেবন
টুডাংআ হো ইনাতেবন গেমেঞ
আঁড়গোন হো।"

অর্থাৎ–

তোড়েগর পুকুর* বাহাগর বাঁদেলার** জল, তোড়ে সুতায়*** ঝুলিয়ে আমরা উঠানামা করব।

কিন্তু স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোক সুদূর, বহুদুর। ঠাকুর মর্ত্যলোকে আছেন, কাজেই দেবতারা প্রতিদিনই স্বর্গলোকে তেকে মর্ত্যলোকে উঠানামা করেন, সঙ্গে আবার নিত্য ব্যবহারের জন্য জল আনতে হয়। শেষে বিরক্ত হয়ে দেবতারা একদিন ঠাকুরকে বললেন 'ঠাকুর, এভাবে আমরা আর কতদিন কাটাব ? চলুন, আমরা আবার স্বর্গলোকে ফিরে যাই।'

ঠাকুর তাঁদের এ কথা শুনে বললেন–'স্বর্গলোকে তো আমাদের ফিরতেই হবে, কিন্তু মর্ত্যলোকের জল নেই বলে যদি আমরা চলে যাই, তাহলে আমাদের নামে কলঙ্ক চিরদিনের মত রয়ে যাবে। লিটাকে বলে কয়ে এখানে জলের একটা সুব্যবস্থা করে আমরা ফিরে যাব।'

---

* তোড়েগর পুকুর–বিদ্যুতের পুস্করিণী

** বাহাগর বাঁদেলা–ফুলের বাঁধ

*** তোড়ে সুতা–বিদ্যুতের তার

সন্ধ্যেবেলা স্বর্গে দেবতাদের সভা বসল। ঠাকুর সেখানে লিটাকে বললেন– 'লিটা তুমিই মর্ত্যলোক খুঁজে বের করেছ, কিন্তু মর্ত্যলোকে জল নেই। এখন জলকষ্টের জন্য যদি আমরা স্বর্গে ফিরে যাই তাহলে চিরদিনের মত আমাদের নামে কলঙ্ক থেকে যাবে। ওখানে জল কি ভাবে পাওয়া যায় তার তুমি একটা পথ খুঁজে বের কর।'

লিটা তখন কুয়ো খোঁড়ার প্রস্তাব দিলেন এবং দেবতারা সবাই কুঁয়ো খোঁড়ার কাজে লাগলেন

* * *

এদিকে মর্ত্যলোকে দিন যাপনের সময়ে ঠাকুর একদিন স্নান করতে গিয়ে শরীরের ময়লা দিয়ে দু'টি মানব শিশু তৈরী করলেন। তাদের চেহারা মুষলের মত; হাত নেই, পা নেই। ঠাকুর মানবশিশু দুটির নাম রাখলেন নিগাঁড়িয়া ও নিমুড়িয়া। এ যেন বাইবেলের আদি মানব আদম ও আদিমানবী ইভেরই কথা। ঠাকুর প্রতিদিন তাদের স্নান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে ও পরে ঘুম পাড়িয়ে স্বর্গলোকে বিচারসভায় আসতেন। এসব কাজ করতে গিয়ে তাঁর দেরী হয়ে যেত।

ঠাকুর প্রতিদিন দেরীতে সভায় আসছেন দেখে দেবতাদের মধ্যে নানারকম কানাঘুসা চলতে লাগল, কিন্তু কেউ আর ঠাকুরকে সে কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। একদিন তাঁরা সবাই লিটাকে এ ব্যাপারটার খোঁজ নেওয়ার জন্য বললেন।

লিটা সেদিনই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন–'ঠাকুর, পূর্বে আপনি প্রতিদিনই আগেভাগে সভাতে আসতেন, কিন্তু আজকাল আর আসেন না, দেরী করে আসেন। আপনি কি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন ?'

ঠাকুর বললেন–'না-না-না, লিটা তা নয়। আমি আমার পরিত্যক্ত খাবারটুকু খাওয়ার জন্য স্নানের সময় শরীরের ময়লা জমিয়ে দুটি মানবশিশু তৈরী করেছি। তাদের খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিচারসভায় আসতে হয়, এজন্যই আমার দেরী হয়ে যায়।'

সবাই তখন ঠাকুরকে সেই মানবশিশু দুটিকে দেখবার জন্য আবদার ধরল। অগত্যা ঠাকুর মানবশিশু দুটিকে নিয়ে এলেন। সবাই দেখল যে মানবশিশু দুটির হাত-পা নেই, তবুও তারা ঠাকুরের সৃষ্টির প্রশংসা করলেও খুঁতখুঁত করে বলল–

ঠাকুর, এ মানবশিশু দুটির তো হাত-পা নেই, তাহলে এরা কিভাবে চলাফেরা করবে ? কিভাবে খাওয়া-দাওয়া করবে ?

তখন ঠাকুর তাদের বললেন–তাহলে তোমরা এ মানবশিশু দুটির হাত-পা তৈরী করে দাও।

সেদিন থেকে মানবশিশু দুটি লিটার আশ্রয়ে বাড়তে লাগল, লিটাই হলেন তাদের অভিভাবক। লিটা দাতাকে ধরে তাদের হাত-পা বানিয়ে দিলেন তারা এবার বেশ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে লাগল।কিন্তু লিটাকে প্রায়ই ঠাকুরের প্রয়োজন এদিক-ওদিক যেতে হয়, একদিন তাঁর অনুপস্থিতিতে বিধাতা মানবশিশু দুটির হাত-পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন। লিটা ফিরে এসে তা দেখে মনে নিদারুণ কষ্ট পেলেন এবং পুনরায় নতুন করে হাত-পা বানিয়ে দিলেন।

আবার একদিন বিধাতা মানবশিশু দুটির হাত-পা ভাঙ্গতে এলেন, কিন্তু সেদিন লিটা ওত্ পেতে ছিলেন। বিধাতা লিটার হাতে ধরা পড়লেন। লিটা বিধাতাকে এ ধরণের কাজ করতে নিষেধ করলেন।

* * *

এদিকে মর্ত্যলোকে দেবতারা কুঁয়ো খুঁড়েই চলেছে। খুব শক্ত পাথরের স্তর পাওয়া গেছে কিন্তু তা আর কাটা যাচ্ছে না। বহু চেষ্টা করেও কিছু হচ্ছে না। সবাই আবার লিটার শরণাপন্ন হল। লিটা তখন তাদের কুঁয়োর মধ্যে ঠাকুরের 'বারছি' লাঠি সোজাভাবে রেখে ঠাকুরের গজমোতি হাতীকে দিয়ে মাড়াতে বললেন।

লিটার কথামত কুঁয়োর মধ্যে ঠাকুরের 'বারছি' লাঠি সোজাভাবে রাখা হল, গজমোতি হাতী আনতে গিয়ে দেবতারা দেখল যে, হাতী ঘুমিয়ে আছে। দেবতারা জোড়া জোড়া নুপুরের রমঝম আওয়াজ করে গজমোতি হাতীকে জাগাবার অবিরাম চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু জাগাতে পারল না। তখন তাঁরা কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে গজমোতি হাতীকে জাগিয়ে তুলল।

জড় লিপুর রমঝমতে
তালে টামাক রু-রুতে
গাডা মুডুরে সাডে দ তারকোয়েন
গজমোতি হাতি দ, হাতি দ লুতুর লাড়াওকেৎ।

জড় লিপুর রমঝমতে
তালে টামাক রু-রুতে
গাডা মুড়ুরে সাদে দ তারকোয়েন
গজমোতি হাতি দ, হাতি দয় জাঁপিৎ বেরেৎএন।

জড় লিপুর রমঝমতে
তালে টামাক রু-রুতে
গাডা মুড়ুরে সাড়ে দ তারকোয়েন
গজমোতি হাতি দ, হাতি দ গেমেঞ গেমেঞ।

অর্থাৎ–

জোড়া নুপুরের শব্দে রুমঝুম
নাকাড়ার আওয়াজে ঘুম কাড়ল,
মাঠে ঘাটে প্রতিধ্বনিত হয়ে
গজমোতি হাতীর কান নাড়ল॥

জোড়া নুপুরের শব্দে রিমঝিম
নাকড়ার আওয়াজে আকাশ মাতল
মাঠে ঘাটে ধ্বনিত হল,
গজমোতি হাতীর ঘুম ভাঙল॥

জোড়া নুপুরের রমঝম শব্দে
কাড়া নাকাড়ার আওয়াজে গুমগুম,
মাঠে ঘাটে প্রতিধ্বনি ধ্বনিত
গজমোতি হাতী চলে গজেন্দ্র গমনে॥

আমরা জানি, মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না। মর্ত্যলোকে মেঘ তখন হয়তো ছিল, কিন্তু হাতী শুয়ে থাকার মত দেখাত শীতকাল মেঘ যেমন দেখায় তেমনই। সেই মেঘকে নাড়া দেবার জন্য দেবতারা ধ্বনি গর্জন সৃষ্টি করল, সেই গর্জনের জোরে জমাট বাঁধা মেঘ সারা আকাশে নাড়া খেল, তার থেকে বিদ্যুৎ ঝলসাল, বিদ্যুৎ থেকে বজ্রের ধ্বনি, ঐ বজ্র কুয়োতে রাখা লোহার বার্‌ছি লাঠিতে শক্তি যোগাল, ফলে, শক্ত পাথরের স্তর বিদীর্ণ হয়ে মাটি থেকে জল ফোয়ারার মত বেরুতে লাগল। সে সময়ে আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টি নামল এবং ক্রমে জলে জলময় হয়ে এই মর্ত্যলোক ডুবে গেল। এই সমস্ত ব্যাপার পরিপুর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য, এই রূপকের ছলে সৃষ্টির সৃজন বর্ণনা।

মর্ত্যলোক জলমগ্ন হওয়ায় দেবতারা সবাই স্বর্গলোক ফিরে গেলেন, এদিকে মানবশিশু দুটিও জলের তোড়ে ভেসে গেল। সে সময়ে লিটা তাদের বর দেন যে, যেখানেই তোমরা আটকে যাবে সেটাই তোমাদের দেশ হবে। মানবশিশু দুটি পশ্চিমদিকে ভেসে যায় এবং তাদের বংশধররাই মানব জাতি।

আবার পূর্বের মত স্বর্গলোকে দেবতাদের সভা রীতিমত বসতে লাগল। সেখানে বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে মর্ত্যলোকের কথাও আলোচনা হত। একদিন লিটা ঠাকুরকে বললেন—"ঠাকুর, মর্ত্যপুরী তো জলপুরী হল, ওটাকে কি ভাবে সাজানো যায় ?"

তখন লিটার কথামত ঠাকুর নানারকম জলচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন কাঁকড়া, কুমীর, চিংড়ি মাছ, রাঘব বোয়াল, আরো কত রকমের মাছ ; শেষে কেঁচো আর কচ্ছপ। কুর্ম পৃষ্ঠে পৃথিবী ভেসে রইল। তারপর ঠাকুর একজোড়া হাঁস-হাঁসিল তৈরী কর তাদের প্রাণ দিলেন। প্রাণ পেয়ে হাঁস-হাঁসিল দুটি আকাশে উড়ে গেল। দশাবতার স্ত্রোত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উড়তে উড়তে যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন কোথাও তারা আর বসবার জায়গা পেল না। এই অবস্থায় ঠাকুরই তাদের বসবার জন্য জলের উপর পদ্মফুলের বৃন্ত সৃষ্টি করলেন। হাঁস-হাঁসিল দুটি আস্তে আস্তে বড় হল এবং সেই পদ্ম পাতায় ডিম পাড়ল। কিছুদিন পরে সেই ডিম থেকে দুটি মানব শিশুর জন্ম হল। এরপর হাঁস-হাঁসিল ও শিশু দুটির ভারে পদ্মপাতা ডুবে যাবার মত হল। তখন হাঁস-হাঁসিল দুটি মানব শিশু দুটিকে পিঠে নিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল। গানে আছে ঃ

হায় হায় ! জালাপুরিরে
হায় হায় ! জালাপুরিরে
হায় হায় ! পরায়নি সাকাম
হায় হায় ! উড়ুলে ডুবুলে
হায় হায় ! মানমি জালাপুরিরে !

অর্থাৎ—

হায় হায় ! মহাসমুদ্রে
হায় হায় ! মহাসমুদ্রে
হায় হায় ! পদ্ম পাতা
হায় হায় ! ডুবু ডুবু
হায় হায় ! মানব সন্তান মহাসমুদ্রে॥

ওদিকে নিগাঁড়িয়া নিমুড়িয়া মানব শিশু দুটি বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে একটা উঁচু জায়গায় আটকা পড়ল। সেখানেই তারা ঘর বাঁধল এবং আস্তে আস্তে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেল। সাঁওতালী পুরাণে আদম-ইভের জন্মের এ আর একটি রূপক কাহিনী।

লিটা একবার তাদের খবরা-খবর নিতে গেছেন, সে সময়ে এক মহিলা প্রসব যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল। সে বাড়ীর লোকেরা লিটাকে দেখতে পেয়ে বুদ্ধি-ভরসা নেওয়ার জন্য ডাকল। লিটা তাদের কথা এড়াতে পারলেন না, আর তিনি সে বাড়ীর উঠানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটির জন্ম হল। বাড়ীর লোক এতে খুব খুশী, তারা লিটাকে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। অগত্যা লিটা সন্ধ্যেবেলা সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে দেবলোকে ফিরলেন। আসার সময়ে ও বাড়ীর লোক লিটার দিদি জাহের বুড়হি এবং ভাই ধরমের জন্য কিছু খাবারও পাঠিয়ে দিল।

লিটা বাড়ী আসামাত্র দিদি জাহের বুড়হি দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। লিটা তখন সব কথা খুলে বললেন এবং তাঁদের জন্য আনা খাবারও তাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

লিটার কথা শুনে জাহের বুড়হি রীতিমত অসন্তুষ্ট, তার ওপর মানুষের হাতে রান্না খাবার, অশৌচ বাড়ী থেকে। রেগেমেগে তিনি বললেন—বাবু, আমরা হলাম দেবতা, মর্ত্যলোকের যে বাড়ীর অশৌচ কাটেনি সে বাড়ীর খাবার কি খেতে পারি? ঠাকুরজীউ এটা জানতে পারলে কি ভাল বলবেন ? আজ থেকে তুমি আর আমার কাছে থাকতে পারবে না, তোমার যেদিকে খুশী, তুমি চলে যাও।

জাহের বুড়হির এ ধরণের কথায় লিটার তীব্র মনঃকষ্ট হল, তাই লিটা দেবলোক ছেড়ে পাতালে গেলেন। পাতালের সমস্ত জলজন্তুরা লিটাকে পেয়ে খুব খুশী। তাদের রাজা নেই, তারা লিটাকেই পাতালের রাজা করল। লিটার সমস্ত দুঃখ দূর হল।

এদিকে লিটা না থাকায় দেবলোকেও আনন্দ নেই, ঠাকুরের বিচারসভা আর সেভাবে বসে না। সভায় হাজির হওয়ার জন্য কেই-বা খবর দিতে যাবে ? ঠাকুর বেশ অসুবিধায় পড়লেন। দেবলোকের সর্বত্র খোঁজ করেও তিনি লিটার সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি জাহের বুড়হি ও ধরম ঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন। জাহের

বুড়্হি ও ধরম ঠাকুর এলেন। ঠাকুর জীউ তখন জাহের বুড়্হিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও জাহের বুড়্হি, লিটা কোথায় ? আমার কাছে তো আজকাল আশে না, দেবতাদের বিচার সভায় আসা সে বন্ধ করল কেন ?"

জাহের বুড়্হি মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। বললেন—"কি জানি ঠাকুর, আমি তো জানি না। লিটা হল আপনার বার্তাবাহক, আমি তো ভাবছি লিটা আপনার কাজেই কোথাও গেছে, বাড়ীতে কয়েকদিন ধরেই সে নেই।"

এ কথা শুনে ঠাকুর বললেন, "জাহের বুড়্হি, আমি সমস্তই জানি। তুমি লিটাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাঁকে তুমি খুঁজে নিয়ে এস, নইলে দেবলোকে তোমাকে আর রাখা হবে না, তোমার জীবন শেষ করে দেওয়া হবে।"

জাহের বুড়্হি তখন সমস্ত ঘটনা ঠাকুরের কাছে খুলে বললেন এবং লিটাকে খুঁজে আনবেন বলে ঠাকুরকে কথা দিলেন।

ঠাকুর জাহের বুড়্হিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, লিটার এ কাজ তিনিও সমর্থন করেন না, তবে মেয়েদের এই অশৌচকে ঘৃণা করার অপরাধে জাহের বুড়্হির নাম অনাদৃত হয়েই থাকবে। এই অশৌচ বিধি না মানলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে পড়বে। সৃষ্টি আর থাকবে না, অশৌচ ঘৃণা করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে নারীর এই সন্তান জন্মদানের মধ্যে যে ঐশ্বরীয় বিভূতি তাকে কোন অবস্থাতেই অবজ্ঞা করা অবিধেয়।

এরপর জাহের বুড়্হি লিটার খোঁজে পাতালে গেলেন এবং দেখলেন যে, কুমীর, মকর, রাঘব বোয়ালরা সেখানের রাজপুরী পাহারা দিচ্ছেন। বহু অনুনয় বিনয় করার পর জাহের বুড়্হি রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন, লিটার সঙ্গে দেখাও হল। লিটাকে আবার দেবলোকে ফিরে যাওয়ার কথা বলাতে লিটা কিন্তু প্রথমে রাজী হলেন না, তখন জাহের বুড়্হি কাঁদতে কাঁদতে গান ধরলেন—

কীপি মা কীপি হো সামানম কীপি
তড়া মা তড়া হো রাঁগাইনি মা তড়া
অকয় মায় গঃকেৎ হো সামানম কীপি
অকয় মায় হবরকেৎ হো রাঁগাইনি মা তড়া ?

মারাং গুরু গঃকেৎ হো সামানম কীপি
জাহের এরায় হবরকেৎ হো রাঁগাইনি মা তড়া
গঃ তেহঁয় গঃকেৎ হো সামানম কীপি
হবর তেহঁয় হবরকেৎ হো রাঁগাইনি মা তড়া।

অর্থাৎ—

কুড়াল তো কুড়াল নয় সোনার কুড়াল,
তোড়া তো তোড়া নয় রাঁগাইনি তোড়া,
কে সোনার কুড়াল কাঁধে নিল ?
কে রাঁগাইনি তোড়া কোলে নিল ?

মারাং বুরু সোনার কুড়াল কাঁধে নিলেন
জাহের এরা রাঁগাইনি তোড়া কোলে নিলেন,
তিনিই সোনার কুড়াল কাঁধে নেন
তিনিই রাঁগাইনি তোড়া* কোলে নেন॥

এখানেই লিটা হলেন মারাং বুরু এবং জাহের বুড়হি হলেন জাহের এরা। দেবলোকে জাহের বুড়হি ছিলেন দিদি, লিটা ভাই ; কিন্তু এখানে তাঁরা রূপান্তরিত হলেন স্বামী-স্ত্রীতে। পূর্বে ঠাকুর জীউর কোটাল হিসাবে লিটার হাতে লাঠি থাকত, এখানে তিনি স্বর্ণকুঠার কাঁধে নিলেন। জাহের বুডহি ঠাকুর জিউর ঝি হিসাবে ঝাড়ু ধরতেন, এখানে তিনি রাঁগাইনি তোড়া কাঁখে নিলেন। জাহের বুড়হি হলেন ছিতা। আদম ইভের কাহিনীরই যেন পুনরাবৃত্তি।

বহু অনুনয় বিনয় করার পর লিটা দেবলোকে ফিরতে রাজী হলেন, কিন্তু এক শর্তে—পৃথিবীর মানুষ যদি তাঁদের নামে গো-বৎস উৎসর্গ করে, কিংবা ধরমের নামে সাদা বা বাদামী পাঁঠা উৎসর্গ করে তা গ্রহণ করতে হবে। উপায় নেই, ঠাকুরের নির্দেশ, লিটাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে, নইলে জাহের বুড়হিরও দেবলোকে স্থান হবে না। জাহের বুড়হি রাজী হলেন এবং লিটা দেবলোকে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এদিকে লিটা ফিরে যাচ্ছেন শুনে সমস্ত জলচর প্রাণীরা ঘোর চিন্তায় পড়ল. তারা লিটার কাছে এসে বলল—"মহারাজ, আমরা সবাই এতদিন আপনার ভরসায় ছিলাম। আপনি যদি চলে যান আমাদের অবস্থা কি হবে ? আমাদের কার হাতে দিয়ে যাচ্ছেন ?"

লিটা তাদের বুঝিয়ে বললেন—"তোমরা দুঃখ করো না। তোমরা যখনই আমাকে স্মরণ করবে তখনই আমি তোমাদের কাছে হাজির হব। আর আমি

* রাঁগাইনি তোড়া—রাঁগাইনি তোড়া বললে এই ক'টি জিনিস বোঝায় : ১। ঝাড়ু ২। ডালা ৩। আঁপাড়ি সার বা পাটন তীর ৪। শিকল ও ৫। ঘাঁটি বাঁধা ধনুক।

যখনই তোমাদের স্মরণ করব তখনই তোমরা আমার কাছে আসবে। এটাই তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর করে রাখবে।"

এই বলে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে লিটা দেবলোকে ফিরে এলেন। আসার সময় লিটা কৌপি কাঁধে নিয়ে, জাহের বুড়হি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে এবং ধরম তীর-ধনুক হাতে নিয়ে দেবলোকে প্রবেশ করলেন। তারপর থেকেই লিটা মারাং বুরু নামে, জাহের বুড়হি জাহের এরা নামে এবং ধরম সিঞ বোঙ্গা নামে অভিহিত হলেন।

লিটা দেবলোকে ফিরে আসার পর আবার ঠাকুরের বিচারসভা জমজম হয়ে উঠল। ঠাকুর একদিন লিটাকে জিজ্ঞাসা করলেন–"আচ্ছা লিটা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ? তুমি না থাকাতে আমরা কোন সমস্যাই সমাধান করতে পারছিলাম না।"

লিটা তখন সমস্ত ঘটনাই খুলে বললেন।

সব কথা শুনে ঠাকুর বললেন–"সত্যিই তো, আমরা দেবতারা অশুচি কিছু গ্রহণ করতে পারি না। অশৌচ কাটেনি এমন বাড়ীতে তুমি খাওয়াদাওয়া করেছিলে বলে তুমি শুধু একাই অশুচি হওনি, কিন্তু তোমরা সবাই অশুচি হয়েছিলে। সেজন্য আমি জাহের বুড়হি এবং ধরমকে তোমাকে খুঁজে আনার জন্য পাঠিয়েছিলাম। পাতাল থেকে তোমরা সবাই স্নান করে শুচি হয়ে ফিরে এসেছ, তোমাদের সমস্ত দোষ কেটে গেছে। তোমরা পবিত্র হয়েছ। ঠিক এরকম, যতদিন কোন বাড়ীতে অশৌচ্ চলবে ততদিন সে বাড়ীতে পূজা-অর্চনা কিংবা শুভকাজ করা উচিত হবে না, স্নান করে অশৌচ্ কাটানোর পর তা করা যাবে। আর আজ থেকে তোমার 'লিটা গোড়েত' নাম বদলে 'লিটা গঁসায়' হল। লিটা গঁসায় হিসাবে পৃথিবীর মানুষকে তুমি সমস্ত আচার-আচরণ শিক্ষা দেবে। এক বেলা তুমি মারাং বুরু নামে অভিহিত হবে। মৃত্যুর সময়ে মারাং বুরু নামে তুমি সমস্ত কিছু সামলাবে'। এ সব কথা বলার সময়ে আকাশে হাঁস-হাঁসিলের কান্না শোনা গেল।

এরপর থেকে কারাম বিন্তীতে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনী আছে বিন্তী গুরু তাই বর্ণনা করে যান। সে কাহিনী এখানে তার পুনরায় উল্লেখ করছি না।

সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী শেষ হলে পর বিন্তী গুরু একে একে নানা পুরানো ঘটনা ও জাতির ইতিহাস বর্ণনা করে যান। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করি– কারাম বিন্তীতে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির সাত পুত্র ও সাত কন্যার নাম আমরা পাই না, কিন্তু জম সিম বিন্তীতে তা আমরা পাই। পুত্রদের নাম–১। লিটা

কীতরি ২। লাও লাখান ৩। ভীম অরজুন ৪। কাপি কারান ৫। টেঁগচ্ সুরাই ৬। রতন পঁড়া ও ৭। হুদুড় দুর্গা।

মেয়েদের নাম–১। ছিতা ২। কীপরা ৩। দীনগী ৪। পুঁড়গী ৫। হিসি ৬। ডুমনী ও ৭। গুইরী।

হাঁড়িয়া তৈরীর কাহিনী

একদিন লিটা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির কাছে এসে বললেন–"নাতি, আমি তোমাদের দাদু হই, তোমাদের দেখতে এসেছি। তোমরা কেমন আছ ?"

তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে একসময় তিনি বললেন "তোমরা আনন্দ করতে জান না। কিভাবে আনন্দ করতে হয়, তা আজ আমি তোমাদের শিখিয়ে যাব। আমার সঙ্গে তোমরা জঙ্গলে চল, জঙ্গল থেকে আমরা রানু বা বাখর তৈরীর উপকরণ নিয়ে আসব আর তা দিয়ে হাঁড়িয়া তৈরী করা যাবে।"

তারা তিনজনই জঙ্গলে গেল। ঘুরতে ঘুরতে তারা এক ঝরণার কাছে এসে দেখল যে কয়েকটি বানর সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। তারা তাদের ঠেলা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল। বেশ কিছুক্ষণ পর বানরগুলির সামান্য হুঁশ হওয়াতে তারা জানাল যে, তারা আদৌ ঘুমায়নি, ঝরণার জল খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে তারা শুয়েছিলে। লিটা তখন অনুমান করলেন যে, ঝরণার ধারে কাছে কোথাও রানু তৈরীর লতাগাছ সব আছে আর ঐ সব গাছের শিকড় ঝরণার জলে ডুবে আছে বলেই ঐ জল মাদকে পরিণত হয়েছে। তিনি পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হিকে ঐ গাছ-গাছড়া দেখিয়ে দিলেন আর তারা ঐ গাছের মূল সংগ্রহ করে বাড়ী ফিরল। এবার ওগুলি গুঁড়ো করতে হবে। লিটা বললেন ঃ

এ নাতি পিলচু হাড়াম
এ বোয় পিলচু বুড়হি
ডকা দারে মাগবিন হো
উখুড় বন বেনাওআ হো॥
রানু রানু বন চাপাদা হো
রানু হো রানু সাঁবাড়া।

অর্থাৎ–

ও নাতি পিলচু হাড়াম,
ওগো পিলচু বুড়হি,
ডকা গাছ কাট তোমরা,
উদুখল তৈরী করব আমরা॥
রানু আমরা প্রস্তুত করব
রানুগো রানু তৈরী করব।

উদখুল তৈরী হল। সেই উদখুল জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন গাছের মূল গুঁড়ো করে তার সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে রানু প্রস্তুত হল। তারপর শ্যামা ঘাসের চালের ভাতের সঙ্গে সেই রানু মিশিয়ে হাঁড়িয়ার পরিণত হওয়ার জন্য হাঁড়িতে রাখা হল।

পাঁচদিন পরে হাঁড়িয়া খাওয়ার যোগ্য হল। লিটা তখন পিলচু হাড়ামকে তিনটি পাতার বাটি তৈরী করতে বললেন এবং একটিতে হাঁড়িয়া ঢেলে মারাং বুরুর নামে মাটিতে ফেলে উৎসর্গ করালেন। বাকি হাঁড়িয়া আর দুটি পাত্রে তারা যেন ঢেলে ঢেলে খায়–এই বলে লিটা সে জায়গা ছেড়ে চলে যান।

লিটার কথানুযায়ী তারা হাঁড়িয়া পান করল এবং তাদের বেশ ভাল নেশা হল। অনেক রাত পর্যন্ত তারা দু'জনেই খুব আনন্দ করল।

পরের দিন সকালে লিটা এসে তাদের ডাক দিলেন–"ও নাতি, ওঠো, ওঠো! তোমাদের যে এখনও ঘুম ভাঙ্গলো না ? অনেক বেলা যে হল।"

লিটার ডাকে তাদের ঘুম ভাঙ্গলো, কিন্তু ঘর থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। রাত্রে তারা একসঙ্গে শুয়েছিল সেটা স্মরণ হওয়ায় তারা অতীব লজ্জা পেল। তারা ঘরের ভিতর থেকেই বলল–'দাদু, আমরা কি করে বেরুবো ? আমাদের যে লজ্জা লাগছে, আমাদের দেহে কোন আবরণ নেই। গতকাল হাঁড়িয়া খেয়ে আমরা কু-কাজ করেছি, তাই আমাদের এখন লজ্জা লাগছে।'

তখন লিটা বললেন–"তাতে কি হয়েছে, ও কিছু নয়।" এই বলে তিনি তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য বড় বড় গাছের ছাল নিয়ে এলেন এবং সেই গাছের ছাল দিয়ে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি লজ্জা নিবারণ করল।

আবরণের কাহিনী

পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির কাপড় নেই, গাছের বাকল তারা পরে। তাই একদিন লিটা ঠাকুরের কাছে বললেন–"ঠাকুর, মানব সন্তান দুটির কাপড় নেই, এভাবে তারা আর কতদিন কাটাবে ?"

এ কথা শুনে ঠাকুর বললেন–'লিটা তুমি তুলোর বীজ সংগ্রহ কর আর পিলচু হাড়ামকে দিয়ে ডাহি-ডুংরী চাষ করে তুলোর বীজ বুনবার ব্যবস্থা কর।'

লিটা তখন পিলচু হাড়ামের কাছে এসে বলল ঃ

এ নাতি পিলচু হাড়াম
ডাহি-ডুংরী মাগ্ মে হো
কাসকম বন চাষ আ হো
লুগড়ি বন তেঞ হচয়া।
এ নাতি পিলচু হাড়াম
ডাহি-ডাংরী মাঃ কাতে
কাসকম বন চাষ কাতে
গেল্ মকা গেল্‌বার মকা
লুগড়ি বন তেঞ হচয়া।

অর্থাৎ–

ও নাতি পিলচু হাড়াম, ডাহি-ডুংরীর মাটি কাট। আমরা তুলো চাষ করে কাপড় বুনব।

ও নাতি পিলচু হাড়াম, ডাহি-ডুংরীর মাটি কেটে তুলো চাষ করে আমরা দশ-বারো হাত কাপড় বুনব।

লিটার কথানুযায়ী পিলচু হাড়াম জমি চাষ করল। লিটা তুলোর বীজ এনে পিলচু হাড়ামকে দিলেন আর পিলচু হাড়াম সেই বীজ জমিতে বুনল। তুলো গাছ হল। তুলোও সংগ্রহ হল। লিটা এবার চরখা তৈরী করে দিলেন, সেই চরখায় সুতো কাটা হল। লিটা তখন পুনরায় ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন–'ঠাকুর, সুতো তো কাটা হল, এখন কাপড় কে বুনবে ?'

ঠাকুর এই সময় পান খাচ্ছিলেন। তিনি পানের পিচ ফেললেন আর সেই পানের পিচ থেকে এখ জোড়া মানব-মানবীর জন্ম হল। তারাই পান তাঁতি, তাদের জন্য চন্দন গাছের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

এরপর লিটা সেই সুতো এনে পান তাঁতিকে দিলেন আর বললেন–'ওগো তাঁতি, তোমরা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির জন্য কাপড় বুনে দাও।'

পুরানো গানে আছে ঃ

তাঁন্‌তি তাঁন্‌তি লুগড়ি তেঞ্‌ তাঁনতি,
ইঞাঃ রুয়ে সুতাঁম তেঞ্‌ কাতিঞ্‌ মে।
ইঞাঃ রুয়ে সুতাঁম তেঞ্‌ কাতিঞ্‌ মে।
আঞ্‌চাররে বাঁড় বাহা ফুটাও আতিঞ মে।

অর্থাৎ–

ওগো তাঁতি, আমায় এই সুতোয় তুমি কাপড় বুনে দাও। আমি সুতো কেটে এনেছি। কাপড় তুমি এমনভাবে বুনবে যেন কাপড়ের আঁচলে বট গাছের ফুল আঁকা হয়।

সেই তাঁতি তখন পিলচু হাড়ামের জন্য দশ হাত এবং পিলচু বুড়হির জন্য বারো হাত কাপড় বুনল।

কয়েকদিন পরে লিটা পিলচু হাড়ামকে বললেন–ও নাতি, আজ দেবলোকে বিবাহ অনুষ্ঠান হচ্ছে। তোমাদেরও আজ বিবাহ দেওয়া হবে। এই বলে তিনি পিলচু বুড়হিকে হলুদ বাঁটতে বললেন। হলুদ বাঁটা হল, সেই হলুদে কাপড় দুটি রাঙানো হল।

পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি সেই রাঙানো পরল এবং লিটার কথানুযায়ী মারাং বুরু, জাহের এরা এবং সিঞ বোঙ্গার নামে হলুদ উৎসর্গ করল। পরে অবশিষ্ট হলুদ তারা গায়ে মাখল। পিলচু হাড়াম পূর্বদিকে মুখ করে এবং পিলচু বুড়হি পশ্চিমদিকে মুখ করে সামনাসামনি দাঁড়াল, আর পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়হির সিঁথিতে তিনবার সিঁদুর পরিয়ে দিল। সে সময় লিটা পিছন থেকে তিনবার 'হরিবোল' ধ্বনি দিলেন।

কৃষিকাজের প্রচলন

পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির বংশবৃদ্ধি হচ্ছে দেখে তারা ভবিষ্যতে একদিন কি খাবে, তা ঠাকুর ভাবতে শুরু করলেন। শুধু ফল-মূল খেয়ে তো থাকা যায় না! কৃষিকাজের কথাই তিনি ভাবলেন, তাই লাঙ্গল তৈরী করার জন্য তিনি জঙ্গলে গেলেন এবং একটি গাছ কেটে লাঙ্গল তৈরী করতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই লাঙ্গল তৈরী করতে পারলেন না।

এদিকে ঠাকরাণ রান্না-বান্না করে ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করছেন—কখন ঠাকুর আসেন ? সন্ধ্যে হতে চলল, তবুও ঠাকুরের দেখা নেই। শেষে তিনি সিংহকে বললেন—"বাছা, তোমার বাবা জঙ্গলে লাঙ্গল তৈরী করতে গেছেন, এখনও তিনি ফিরে এলেন না। তুমি একবার জঙ্গলে গিয়ে তাঁকে ভয় দেখাও তো। তাহলে যদি তিনি বাড়ি ফেরেন।"

সিংহ জঙ্গলে গিয়ে ঠাকুর যেখানে লাঙ্গল তৈরী করছিলেন, সেখানে গর্জন করতে লাগল।

ঠাকুর সবই বুঝতে পারলেন, কিন্তু লাঙ্গল তৈরী করতে না পারায় তাঁর মন-মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। কাছেই একটা আগুন ধরা চেলাকাঠ পড়েছিল, সেটা তিনি ধরেই 'ধর-কুয়া' বলেই সিংহের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে চেলাকাটটি জংলী কুকুর হয়ে সিংহকে তাড়া করল। সিংহ কোন প্রকারে পালিয়ে ঠাকরাণের আসনের নীচে আশ্রয় নিল।

জংলী কুকুর এসে ঠাকরাণকে জিজ্ঞাসা করল—'ও মা, এদিকে কি সিংহ এসেছে ?'

ঠাকরাণ বললেন—'কই বাছা, এদিকে তো কোন সিংহ আসেনি। জংলী কুকুর তখন বনের দিকে ফিরে গেল। এদিকে ঠাকুরও সম্পূর্ণ একটা লাঙ্গলের ফলা, লাঙ্গল-দণ্ড এবং লাঙ্গলের বোঁটা তৈরী করতে না পেরে রেগেমেগে বাড়ীতে এসে শুয়ে পড়লেন।

সেই সময়ে ঠাকরাণ একটি লাঙ্গল তৈরী করে ঠাকুর যেখানে শুয়েছিলেন তারই কাছে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঠাকুর যেন ঘুম থেকে উঠেই লাঙ্গলটি দেখতে পান। কিছুক্ষণ পরে ঠাকরাণ ঠাকুরকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন আর বললেন—"কি রকম বা শুয়ে আছে লাঙ্গলের মত !"

ঠাকুর উঠেই লাঙ্গলটি দেখতে পেলেন এবং সবই বুঝলেন। পরে বললেন- "তোমরা মেয়েরাই জিতলে, তবে মেয়েদের তৈরী এ লাঙ্গল তোমরা কোনদিন ধরো না।"

সেই থেকে আজ অবধি সাঁওতাল মেয়েরা কখনও লাঙ্গল স্পর্শ করে না।

কিস্কু ও মার্‌ডি গোষ্ঠীর বিবাদের কাহিনী

এক সময়ে কিস্কু গোষ্ঠীরাই দেশের রাজা ছিল এবং সে সময়ে মারডি গোষ্ঠীর লোক কৃষিকাজ করত। পরে কিস্কু গোষ্ঠী গরীব হয়ে পড়ে, অন্যদিকে মারডিরা ধনী হয়। মারডিরা তখন কিস্কু গোষ্ঠীর রাজ্য দখলের জন্য লড়াই শুরু করে। গঙ্গা নদী তীরে উভয়পক্ষের লড়াই হয়, আবার সরস্বতী নদীতীরেও হয়। এই গোষ্ঠী বিবাদ নিয়ে তাদের অতি প্রাচীন গানে পাওয়া যায় ঃ-

অকয় জা ক তুপুঞকানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে*।
অকয় জা ক মাপাঃকানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে।
কঁয়ড়া ক তুপুঞ কানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে।
বাদোলি ক মাপাঃকানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে।
চেতে তে ক তুপুঞকানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে।
ইচাঃ বাহা সার তে ক তুপুঞকানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে।
মুরুৎ বাহা কাঁপিত ক মাপাঃকানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে।
চেতে লাগিৎ তুপুঞকানা গাঙ নাইরে
গাঙ নাইরে মানা সুড়া নাইরে।
চেতে লাগিৎ মাপাঃকানা গাঙ নাইরে

* সুড়া নাই–কোন কোন অঞ্চলে 'সোড়া' নামে অভিহিত। সাঁওতালরা ময়ুরাক্ষী নদীকে যেমন 'মোর গাডা' বলে তেমনি হয়তো সরস্বতী নদীকে 'সুড়া নাই' বলত।

গাঙ নীইরে মানা সুড়া নীইরে।
সীমা লীগিৎ তুপুঞ্‌কানা গাঙ নীইরে
গাঙ নীইরে মানা সুড়া নীইরে।
সাড়ে লীগিৎ মাপাঃকানা গাঙ নীইরে
গাঙ নীইরে মানা সুড়া নীইরে।
আল জাপে তুপুঞ্‌আনা গাঙ নীইরে
গাঙ নীইরে মানা সুড়া নীইরে।
আলে জাপে মাপাঃআনা গাঙ নীইরে
গাঙ নীইরে মানা সুড়া নীইরে।
বিতা বাতা হীটিঞপে জা গঁসায়
মকা মকা সড়ায়পে জা গঁসায়
কঁয়ড়া ক সারিল'রে রিলো।
হো বাদোলি ক আপীড়ি গঁসায়
কঁয়ড়া ক সারিল'রে রিলো।

কঁয়ড়া (কিস্কু) ও বাদোলি (মারডি) গোষ্ঠী গঙ্গা সরস্বতী নদীতীরে সীমানার জন্য লড়াই করে। এ লড়াইয়ে বাদোলি অর্থাৎ মারডি গোষ্ঠী হেরে যায় এবং কঁয়ড়া গোষ্ঠী জয়লাভ করে। লড়াইয়ের পরিণাম যেন গৃহবিবাদে পরিণাম না হয়, সেজন্য গানে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে তোমরা আর যুদ্ধ করো না, এক এক হাত করে জমি ভাগ করে নাও।

লড়াইয়ের দৃশ্য বর্ণনা করে আর একটি গান আছে ঃ-

রিমিল রিমিল সাডেকান গঁসায়,
চেৎগো রিমিল সাডেকান মিরগি হো ?
কঁয়ড়া ক সারিলো রে রিলো,
বাদোলি ক সারিলো রে রিলো।
ইচাঃ বাহা সারতে ক তুপুঞ্‌কান গঁসায়,
মুরুৎ বাহা কীপিতে ক মাপাঃকান মিরগি হো।
কঁয়ড়া ক সারিলো'রে রিলো,
সার সার ক তুপুঞ্‌কান গঁসায়,
কীপি কীপি ক মাপাঃকান মিরগি হো।
কঁয়ড়া ক সারিলো'রে রিলো,
বাদোলি ক সারিলো'রে রিলো।

হাটাঃতে ক আরেচ্ লেকা সার দ,
গানারিতে গারি লেকা গুলি দ।
কঁয়ডা ক সারিলো'রে রিলো,
বাদোলি ক সারিলো'রে রিলো।

অর্থাৎ–

ওগো গোঁসাই, মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ওগো মিরগি, মেঘের গর্জন কেন ? কঁয়ডা ও বাদোলিয়া নিশ্চয় লড়াইয়ে নেমেছে। তারা ধাতকি ফুলের মত তীরে ও পলাশ ফুলের মত টাঙ্গিতে লড়াই করছে। তীরে তীরে সংঘর্ষণ হচ্ছে, টাঙ্গিতে টাঙ্গিতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। কুলো দিয়ে কুড়ানোর মত তীর পড়েছে, টানা জাল দিয়ে টেনে তোলার মত গুলি পড়েছে। কঁয়ডা ও বাদোলিরা নিশ্চিত লড়াই করছে।

এ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কিস্কু গোষ্ঠীরাই জয়লাভ করে।

মারাং বুরুর অনুশাসন

মারাং বুরুর অনুশাসনে ভাই-বোনের বিবাহ চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ রকম বিবাহ হলে বৃষ্টি আর হবে না। যদি কোথাও কখনও এরকম ঘটে, তবে চৌদোলা বের করতে হবে। মাটির ভাঁড়ে জল আর সেই জলে আম ডাল রেখে চৌদোলা সাজাতে হবে এবং সেই চৌদোলা নিয়ে আশপাশের গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হবে। ছেলেমেয়ের নামে গান রচনা করে গাওয়া হবে। পরে গ্রামের শেষে চৌমাথায় একটি বাদামী রঙের পাঁঠা ধরমের নামে উৎসর্গ করা হবে। ঘি-ধুপ-ধুনো দিয়ে পূজো এবং তিনবার 'হরিবোল' ধ্বনি দিতে হবে, তবেই দোষ খণ্ডন হবে।

এ রকম ঘটনাও ঘটে। রামগড় রাজার পুত্রদের নাম ইন্দান সিং, মাদান সিং, তালে সিং, নুলে সিং। তাদের একটি মাত্র বোন। বোনটি বড় হওয়ার পর ইন্দান সিং মাদান সিং-এর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বোনকে নিয়েই ইন্দান সিং মাদান সিং ঘর বাঁধে এবং তা জানাজানি হয়। এদিকে টানা দু'বছর বৃষ্টি নেই। দেশবাসী তখন চৌদোলা বের করল এবং নানারকম অশ্লীল উক্তি করে গান গেয়েছিল ঃ

হেন্দা জা হেন্দা জা বাবু কড়া,
দিসমরে দ কুড়ি দ বাম ঞামলেৎকোওয়া ?
নিজের মিসেরাম বাঁহুকেদেয়া॥
হেন্দা না হেন্দা না বোয় কুড়ি,
দিসমরে দ জাঁওয়ায় বাঙ এম ঞামলেৎকোওয়া ?
নিজের দাদাম ঠেনেম জাঁওয়ায়এনা॥

অর্থাৎ–

ওরে ওরে বাবু ছেলে
দেশে তুমি মেয়ে পেলে না
নিজের বোনকে বৌ করলে ?
হ্যাঁগো, হ্যাঁগো মেয়ে,
দেশে তুমি বর পেলে না ?
নিজের দাদাকে বিয়ে করলে ?

গ্রামের চৌমাথায় সবাই হাজির হয়ে ইন্দান সিং মাদান সিং-এর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করল এবং ধরমের নামে পূজো দিল। তারপরই দেখা গেল বৃষ্টি হল।

কিন্তু এ রকম প্রায় ঘটত থাকায় সমস্যা দেখা দিল। দেশবাসী তখন সমবেত হয়ে অন্য সমাজের মেয়ে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। দিসম নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেনের কথায়–"আয়মা আতো হড়কো জাওরায়েনা, আদ ক মেনকেদা নংকাতে বাং গানঃআ, আঁড়ি হড়গে বন বাড়িজঃআ। মা, এটাঃ এটাঃ জাতি হপনেরা বন পাঁজাকমা, ওনকো গেবন বাপ্লাকোওয়া।" অর্থাৎ–'বহু গ্রামের লোক সমবেত হল এবং বলল, এভাবে হবে না, বংশের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করতে হবে। অন্যজাতির মেয়েদের আমরা খোঁজ করি, তাদেরই আমরা বিবাহ করব।'

কিস্কু ও মাণ্ডি বংশের কথা

সাঁওতাল সমাজে কিস্কু বংশের সঙ্গে মাণ্ডি বংশের এবং টুডু বংশের সঙ্গে বেস্‌রা বংশের বিবাহ নিষিদ্ধ। জম সিম বিন্‌তী কথনের সময়ে এই নিষিদ্ধ বিবাহ সম্পর্কে অতীতের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। বিন্‌তী গুরু বলেন ঃ

এক কিস্কু রাজার এক বিবাহযোগ্য কন্যা ছিল। কিন্তু দেশে সেরকম সঙ্গতিসম্পন্ন পাত্র না থাকায় কেউ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কিস্কু রাজার কাছে আসেনি। সবাই রাজকুমারীর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। সে সময়ে দেশে কৃষিকাজের ভার ছিল মাণ্ডি বংশের ওপর, তারাই ছিল দেশের জমিদার। মাণ্ডি বংশের একটি মাত্র ছেলে, বিবাহ করার মত বয়সও হয়েছিল। কিন্তু চেহারা মোটেই ভাল ছিল না, আর পায়ে ছিল মস্ত গোদ। তবে তার মাথার চুল ছিল খুব লম্বা আর ঘন কালো।

একদিন নদীতে স্নান করার সময়ে মাণ্ডি ছেলেটির মাথার একটা চুল জলে পড়ল। সে তখন ভাবল, তার এই লম্বা চুলটি যদি জলে ভেসে যায়, তাহলে চুলে জড়িয়ে বহু মাছ মরতে পারে। এই অকারণ প্রাণীহত্যার দায় এড়াবার জন্য সে তখন চুলটি একটি পাতার মধ্যে মুড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল।

নদীর নীচের দিকে ঘাটে কিস্কু রাজকুমারী তার বান্ধবীদের নিয়ে স্নান করছিল। হঠাৎ নদীর জলে পাতার ঐ পুঁটলিটা ভেসে যাচ্ছে দেখে সখীকে পুঁটলিটি তুলতে বলল। রাজকুমারী পাতার মোড়ক খুলে দেখল যে, একটি ঘন কালো বারো হাত লম্বা চুল তার মধ্যে রয়েছে। এত বড় আর এত সুন্দর চুল দেখে রাজকুমারী তখন বলল–"সই, এই চুল যদি কোন মেয়ের হয় তবে তার সঙ্গে 'ফুল' পাতাব আর যদি কোন ছেলের হয় তবে তাকেই আমি বিয়ে করব।"

ঘরে ফিরে রাজকন্যা তার বাবা-মায়ের কাছে এ কথা বলল। রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হল এবং শেষে মাণ্ডি বংশের ছেলেটির সন্ধান মিলল। কিস্কু রাজা সাঁওতাল রীতি অনুযায়ী রায়বার অর্থাৎ ঘটক নিয়োগ করলেন, উভয় পক্ষের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। ছেলের বাড়ীর অবস্থা দেখে কিস্কুরাজ খুসি, ছেলের পায়ের দিকে কেউ আর তাকাল না।

বিয়ের দিন ধার্য হল এবং কিস্কু রাজকন্যার সঙ্গে মাণ্ডি ছেলের বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু ছেলের পা ধোয়াবার সময় সব জানাজানি হয়ে গেল। মেয়ের মা-বাবা তখন মেয়েকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে রাজী হলেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাণ্ডিদের সঙ্গে কিস্কুদের বিবাদ শুরু হল এবং তা চলতে লাগল।

একদিন কিস্কুরা ঘোড়া নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেছে। ঘোড়াটিকে নদীর পাড়ে রেখে তারা নদীতে মাছ ধরতে নেমেছে এমন সময়ে মাণ্ডিরা চুপি চুপি

ঘোড়াটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। কিস্কুরা মাঝ ধরা শেষ করে পাড়ে উঠে দেখে যে তাদের ঘোড়া নেই। হঠাৎ সে সময়ে আকাশে শঙ্খচিলের ডাক শোনা গেল। শঙ্খচিলের ডাক অনেকটা ঘোড়ার ডাকের মতই। তাই যেদিক থেকে ডাক শোনা যাচ্ছিল তারা সেদিকেই ছুটল। শেষ পর্যন্ত তারা এসে হাজির হল মাণ্ডি গাড়ে। কিন্তু ঘোড়ার সন্ধান পেলে না। তবে তারা নিশ্চিত হল যে এ কাজ মাণ্ডিরাই করেছে এবং ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে। এ ঘটনার পরই মাণ্ডিদের সঙ্গে কিস্কুদের চিরকালের মত বিচ্ছেদ ঘটল আর তারা মাণ্ডি বংশের সঙ্গে কিস্কু বংশের বিবাহ চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল।

টুডু ও বেস্‌রা বংশের কথা

কিস্কু ও মাণ্ডি বংশের মত টুডু ও বেস্‌রা বংশের মধ্যে বিবাহ হয় না। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, তা হল ঃ

এক সময়ে কোন এক ছোট নদীর একদিকে ছিল টুডুদের গ্রাম, অন্যদিকে ছিল বেস্‌রাদের গ্রাম। টুডু বংশের ছেলেরা ছিল অত্যন্ত রসিক আর ধামসা, মাদল, ঝাঁই, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র খুব ভাল বাজাতে পারত। নদীর ওপাশে বেস্‌রা মেয়েরা নাচ, গান খুব ভালবাসত, কিন্তু তাদের গ্রামে সে রকম দক্ষ বাজনদার ছিল না। টুডুদের গ্রামের এক যুবক প্রতিদিন নদী পেরিয়ে বেস্‌রাদের গ্রামে হাজির হত এবং বেস্‌রা মেয়েদের নিয়ে নাচগান ও রসিকতা করত। বেস্‌রা মেয়েরাও এই টুডু ছেলেটিকে খুব ভালবাসত। টুডু ছেলেটির নাম ছিল বাড়িয়া লখন। বেস্‌রা গোষ্ঠীর একটি ছেলে কিন্তু এটা মোটেই পছন্দ করত না। বর্ষাকালে নদীতে বন্যা হলে বেস্‌রা ছেলেটি ভাবত যে, ছেলেটি আসবে না। কিন্তু টুডু ছেলেটির নাচের আখড়ায় আসা বন্ধ হত না।

বেস্‌রা ছেলেটি খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, নদীর ওপাশ থেকে এপাশ পর্যন্ত এক লতানো গাছ আছে, সেই লতার সাহায্যেই ছেলেটি নদী পার হয়। তাই একদিন বেস্‌রা ছেলেটি সেই লতার নীচের অংশ এমনভাবে কেটে রাখল যে, বন্যার সময়ে নদী পার হতে গেলে নদীতে পড়ে বন্যার জলে টুডু ছেলেটি ভেসে যাবে।

কয়েকদিন পরে নদীতে ভয়াবহ বন্যা হল। কিন্তু টুডু ছেলেটি অন্য দিনের মতই মাদল, বাঁশী, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বেস্‌রাদের সেই নাচের আখড়ায় যোগ দেওয়ার জন্য। নদীর ধারে এসে লতা ধরে ধরে সে নদীও পার হতে লাগল। মাঝনদীতে সে এসে পড়েছে এমন সময় লতাটি ছিঁড়ে পড়ল, আর সে নদীর জলে পড়ে ভেসে চলল। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র সব, তাই সাঁতার কেটে নদীর পাড়ে ওঠাও সম্ভব হল না। ভাসতে ভাসতে মৃতপ্রায় অবস্থায় সে বেস্‌রাদের নদীর ঘাটেই এসে আটকা পড়ল।

এদিকে সেদিন টুড়ু ছেলের অবর্তমানে বেস্‌রা মেয়েদের নাচগান মোটেই জমলো না, তাড়াতাড়িই নাচের আখড়া ভাঙ্গলো। পরদিন খুব সকালে মেয়েরা নদীতে জল আনতে গিয়ে দেখল যে, টুডু ছেলেটি ঘাটের কাছে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তারা তখন তাড়াতাড়ি তাকে জল থেকে তুলল এবং আগুন জ্বেলে গরম সেঁক দিতে লাগল। আগুনের তাপ পেয়ে টুডু ছেলের জ্ঞান ফিরল এবং চোখ মেলল। বেস্‌রা মেয়েরা তখন তার মাদলটিও আগুনের সেঁক দিয়ে শুকনো করল।

এদিকে টুড়ু ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠে বেস্‌রা মেয়েদের দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল এবং সেই নদীর ঘাটেই মাদল বাজিয়ে বেস্‌রা মেয়েদের নিয়ে নাচগান শুরু করে দিল। বেস্‌রা ছেলেটি তখন বুঝলে যে, সে এভাবে টুডু ছেলেটির সঙ্গে পারবে না। রসিক শিল্পীকে হারানো কঠিন। টুডুরা রসিক লোক। তাই সে জনমত সৃষ্টি করে টুডু বংশের সঙ্গে বেস্‌রা বংশের বিবাহ নিষিদ্ধ করল এবং আজও তাই চলে আসছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্তবগান

বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে সাঁওতালীতে স্তবগান শোনা যায় এগুলিকে তারা 'বাখেঁড়' বলে। ভাষা না জানলে এ সমস্ত স্তবগানের প্রকৃত মূল্যায়ন করা সুকঠিন। এগুলি সাঁওতালী সাহিত্যের অতি মূল্যবান সম্পদ। সাঁওতাল সমাজ এজন্য অবশ্যই গর্ব করতে পারে। সাঁওতাল সমাজে যখন 'বাখেঁড় স্তুতি' গাওয়া হয়, তখন স্বরের রেশ কখনও উচ্চ সপ্তকে, কখনও নিম্ন নিখাদে, আবার কখনও বা কোমলভাবে ধ্বনিত হয়। বলতে বাধা নেই যে, এ সব বাখেঁড় তাদের কাছে বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। এগুলি কি রকম শ্রুতি মধুর এবং উচ্চারণের টান কি রকম, তা বোঝাবার জন্য নীচে সামান্য নমুনা দেওয়া হল ঃ

জ০হার তবে জা০হের এরা, বীঁ০পু ঠাকুর তিঞ০০ দ, সহ্‌রায় ঞু০তুমতে এ০০মাম চা০০লাম কা০না, নিয়ীঁ০০গে খু০০সিতে খু০সাল০০তেম আতাং০০আম তেলা০০আম, নিয়ীঁ০০গেম সুক০০কঃক্ রে০বেন০০কঃক্‌মে আ০লে দ০০ ছুঁ০০০নড়্ কুড়ি ছুঁ০০০নড়্ কড়া বা০০লে বাডা০০য়েয়া ওর০০মা, গে০গেচ্‌০০রে গু০গুগু০০রিচ্‌রে, নেঁও০০রে নিচা০০রে অকা০০ক০রে দো০গোক্‌০০আ দিঙগিজক্‌০০আ, আ০লে দ০০ বা০০লে বাডা০০য়া ওর০০মা, সা০হাও০০কে লাহা০০ও ক০পে ; সে০দা০০য় মারে হাপ০ড়াম০০কো দ০০ চে০০ৎ লেকা০০তে চে০০ৎ ল০মীঁ০০ম লু০গড়ি সিন্‌০দু০র শা০০ড়ি০০তে আ০তং০০লেৎ, তেলা০০ লেৎ০০ পেয়া০০ক বীঁ০পু ঠাকুর তি০০ঞ দ০। ডি০রে ডীন০ডি০০রে লা০০চ্ হা০সো, বহ০০ক্ হা০সো, আল০০পে ব০ল ও০চো স০ড়ওচো০০য়া, পে০ড়া০০ক গু০তিয়া০০ক নীঁ০০ই পা০রম গা০ডা পা০রম নেওয়া আ০কাৎ০০ক বার্‌০০তে আকাৎ০০কো০য়া০লে, দেও০০কো ভাগিন০০কো না০তি০০কো নাট০কা০০র কো এ০নেচ্‌০০জং সু০লাং০০ জ০০ আ০০কো, জিন০ঠি০০ আ০ল পীঁ০০থরি আ০ল না০সা আ০ল বি০না০০শ আ০ল, নে০য়াঁ০০ও আ০ল ঝ০০গড় আ০ল রীঁ০সকীঁ০০কা০তে এ০নেচ্‌০০ জং০০মা০কো গঁসায় ঠা০কুর তিঞ০০ দ।

* '০' একটি থাকলে এক মাত্রা এবং দুটি থাকলে দুমাত্রা টান দিয়ে বাখেঁড় উচ্চারিত হয়।

তেল নাহানের সময়

সাঁওতালী–"জহার গঁসায় মারাঙ বুরু, তেহেঞ দ নওয়া অড়াঃ রাচারে গঃচ্ আকান, সঃচ্ আকান হড়াঃ তেল নাহান ঞুতুমতেলে এমাম কান, চালাম কানালে, সুকতে সাঁওয়ারতে আতাঙকেয়া, তেলা কেয়াম। নীই পারম গাডা পারম খন পেড়া ক পাঁহড়াক হেচ্ আকান সেটের আকান ক লাঃচ্ হাসো বহঃক্ হাসো আলম হাঁকরাওকে, বিড়ুরাওকে। নায় বাড়ে, নাপায় বাড়ে গঁসায়।"

বাংলা–"প্রণাম গঁসায় মারাঙ বুরু, আজ এই বাড়ীর উঠোনে মৃত, পরলোকগত ব্যক্তির তেল-নাহানে তোমাকে স্মরণ করছি, সম্প্রদান করছি, খুশি মনে গ্রহণ কর, স্বীকার কর। নদী পার হয়ে, খাল পার হয়ে আত্মীয়রা, নিমন্ত্রিতরা এসে পৌঁচেছে, পেট ব্যাথা, মাথা ব্যথা তাদের যেন না হয়। গঁসায় সবকিছুর ভাল হোক।"

সাঁওতালী–'নে তবে আম গঃচ্ আকান গুর আকান বিন্দীড় আকান হড়, তেহেঞ দ তেল নাহান ঞুতুমতেলে এমাম কান, চালাম কানালে, সুকতে সাঁওয়ারতে আতাঙকেয়া তেলাকেয়াম। তেহেঞ দ তালা অড়াঃ আসন তেলে ঔগুকেৎমে, টাট্কা ভিলকি ক আলম উদুগা। আলম বতর হচকওয়া। নীই পারম গাডা পারম খন পেড়াক পাঁহড়াক হেচ্ আকান সেটেরকান ক লাঃচ্ হাসো হাঁকরাওকে, বিড়ুরাওকো। নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গঁসায়।"

বাংলা–'হে মৃত, পরলোকবাসী, আজ তেল-নাহান উপলক্ষে তোমাকে স্মরণ করছি, সম্প্রদান করছি, খুশি মনে গ্রহণ কর, স্বীকার কর। আজ বাড়ীর মাঝ ঘরের আসনে তোমাকে আনা হল, হঠাৎ কোন ভেলকি দেখিও না। ভয় দেখিও না। নদী পার হয়ে, খাল পার হয়ে আত্মীয়রা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসে পৌঁচেছে, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা তাদের যেন না হয়। গঁসায় সব কিছু ভাল হোক, শুভ হোক।'

সাঁওতালী–'নে তবে আম গঃচ্ আকান গুর আকানিচ্, তেহেঞ দ তেল নাহান ঞুতুমতে উমকান নাড়কান কানালে, আম হঁ উমকঃ নাড়কাকঃমে।'

বাংলা–'হে পরলোকবাসী, আজ আমরা তেল নাহানের নামে স্নান করে মাথা পরিষ্কার করছি, তুমিও স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও।'

সাঁওতালী–'নে তবে পিলচু হাড়াম, তেল নাহান এ্ঞতুমতে উমকান নাড়কান কানালে, আবেন হঁ উমকঃ নাড়কাঃ কঃবেন ; তবে নঃঅয় গঃচ্ আকান গুর আকানিচ্ হঁ অর সাঁওহা তিয়াঁঃ সাঁওহায়বেন, উনি সাতে উয়াঁই কুড়ীম আলবেন দহয়েয়া।'

বাংলা–'হে পিলচু হাড়াম, আমরা তেল নাহানের নামে স্নান করছি, মাথা পরিষ্কার করছি, তুমিও স্নান কর, মাথা ধোও। তবে এই মৃত ব্যক্তিকেও সঙ্গে নাও, হাত ধরে কাছে নিয়ে যাও, এর ছাঁচতলা ওর ছাঁচতলায় রাখবে না।'

সাঁওতালী–'নে মারাং বুরু তেল নাহান এ্ঞতুমতে উমকান নাড়কান কানালে; আম হঁ উমকঃ নাড়কাকঃমে ; মেন তবে উনি গঃচ্ আকান বিন্দীড় আকানিচ্ হঁ অর সাঁওহায়েম।'

বাংলা–'হে মারাং বুরু আমরা তেল নাহানের নামে স্নান করছি, মাথা পরিষ্কার করছি, তুমিও মাথা ঘষে স্নান কর আর এই মৃত পরলোকগত মানুষটিকে কাছে টেনে নাও।'

নদীতে অস্থি বিসর্জনের সময়

সাঁওতালী–'নে তবে পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়হি, ইএ্ঞ দএ্ঞ উমেন নাড়কায়েনা, আবেন হঁ উমকঃ নাড়কাকঃবেন ; সঃচ্ আকান বিন্দীড় আকানিচ্ গায়াকেদে গঙ্গাকেদেয়াএ্ঞ, আদ অর সাঁওহা তিয়াঁঃ সাঁওহায়েবেন তেহেএ্ঞ খন দ।'

বাংলা–ওগো পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়হি, আমি স্নান করে মাথা ধুয়ে শুদ্ধ হলাম, তোমরাও স্নান কর, মাথা ধোও, যিনি মারা গেছেন তাঁকে উৎসর্গ করলাম; এখন তাঁকে কাছে টেনে নাও, হাত ধরে টেনে নাও আজ থেকে।

শ্রাদ্ধের সময়

সাঁওতালী–'জহার গঁসায় মারাং বুরু, তেহেএ্ঞ দ নওয়া অড়াঃ রাচারে ভাণ্ডান এ্ঞতুমতেলে এমাম কান, চালাম কানলে, সুকতে সাঁওয়ারতে আতাং কেয়া তেলাকেয়াম। নাঁই পারম, গাডা পারম খন পেড়াক পাঁহড়াক, বালা ক সাকাক,

ভাগুান ঞুতুমতে ক হেচ্ আকান, সেটের আকান ক হেঁসেজেগে নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গঁসায়। নঃঅয় তেহেঞ দ সঃচ্ আকান বিন্দীড় আকানিচ্ বাঁটআঃ বাখরাওয়াঃলে এমকাতায় কানা, আবেন মারাং বুরু আর পোরোধল দ ঞেলকাতায় আতেন কাতায়বেন।'

বংলা–জহার গঁসায় মারাং বুরু, আজ এ বাড়ীর উঠোনে শ্রাদ্ধের দান তোমাকে দিচ্ছি, সম্প্রদান করছি, খুশি মনে গ্রহণ কর, স্বীকার কর। নদী পেরিয়ে, খাল পেরিয়ে আত্মীয়রা, নিমন্ত্রিতরা, বেয়াই-বেয়ানরা শ্রাদ্ধে এসেছেন হাসি-খুশি ভালভাবে হাজির হয়েছেন গঁসায়। আজ মৃত, পরলোকগত ব্যক্তির প্রাপ্য আমরা সম্প্রদান করছি, তোমরা মারাং বুরু ও পুরুধুল দেখেশুনে নাও।

সাঁওতালী–'জহার গঁসায় বঙ্গা তালআকান হড়, তেহেঞ দ নওয়া রাচারে ভাগুান ঞুতুমতে বাঁটআঃ বাখরাওয়াঃ এমাম চালাম কানালে খুসিতে খুসীলতেম আতাঙা তেলায়াম নিয়াঁগে, চেরেচ্কে মারাংকেয়া বাপু ঠাকুর তিঞ দ।'

বাংলা–জহার হে মৃত ব্যক্তি, আজ এই উঠানে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে তোমার প্রাপ্য তোমাকে সম্প্রদান ও সমর্পন করছি, খুশি মনে গ্রহণ কর, গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও, হে ঠাকুর।

সাঁওতালী–'জহার তবে আম বঙ্গা তালা আকান হড়, নে সেয়া মীনডি সেয়া দাকা এমাম চালাম কানা, খুসিতে খুসীলতেম আতাঙা তেলায়া, নিয়াঁ বাড়ে সুককঃক্ রেবেনকঃক্মে। আলে হঁ জম হাবালে লাঃচ্ হাসো বহঃ হাসো আল সিরজাঁউ গাড়হাওঃ মা গঁসায় বাপু ঠাকুর তিঞ দ।'

বাংলা–জহার হে মৃত ব্যক্তি, নাও পচা মাড় পচা ভাত তোমাকে দিচ্ছি, সমর্পণ করছি, খুশি মনে এগুলো গ্রহণ কর। এতেই তুমি সুখে শান্তিতে থাক। আমরাও খাব, গলাধঃকরণ করব, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা আমাদের যেন না হয় গোঁসাই, ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর।

পরিশিষ্ট

স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এখানে আলোচনা করা হল। এই অতি প্রাচীন অস্ট্রিক ভাষাটি আজও মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে, হারিয়ে যায়নি। পুরুষানুক্রমে মুখে মুখেই ভাষাটি তার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। আমরা সবাই জানি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এক দেহে লীন হয়ে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন॥'

সত্যিই তো ! কত যে অনার্য আদিবাসী গোষ্ঠী হারিয়ে গেছে কিংবা তাদের ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে তা বলা দুরুহ। সাঁওতালদের ক্ষেত্রে সে রকম সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি ; তবে তাদেরও বেশ কিছু ভাষা, শব্দাবলী, গোষ্ঠী ও পরিচিতি হারিয়ে গেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাদের হাঁসদা, মুরমু, কিস্কু, সরেন প্রভৃতি বারোটি গোত্রের মধ্যে একটি 'বেদেয়া' গোত্রটি হারিয়েই গেছে। সাঁওতালদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমি আবার এমন কিছু মানুষের কথা উল্লেখ করছি, যারা সাঁওতালী ভাষায় কথা বলছে, অথচ তারা জানে না যে তারা নিজেরাই সাঁওতাল। চৈতন্য হেমব্রম কুমারের 'সানতাল পারগানা, সানতাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃ ইতিহাস' গ্রন্থে এ ধরণের ঘটনা উল্লেখ আছে, আবার মঙ্গলচন্দ্র সরেনও তাঁর 'সাঁওতালজাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক, ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালী ভাষা যে খুবই সমৃদ্ধ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন এই ভাষাটি আজও হারিয়ে যায়নি, তার মুলে আছে দুটি বিষয় ; একটি হল–

সাঁওতালীতে কথা বলার ধরণটা কিছু আলাদা রকমের। কথা বলার সময়ে একাত্মকরণের এক আশ্চর্য রকমের অভিব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ পায়। যেমন–'মা দুড়ুপতাবন পে' অর্থাৎ বাংলায় 'আপনারা বসুন।' সাঁওতালীতে 'মা দুড়ুপ' কিংবা 'মা দুডুপ পে বাড়ে' বললেও কোন ভুল হয় না, তাও ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু তারা এ কথা খুব কমই বলে। তফাৎ এই–পরের বাক্য দুটিতে একটা অনুজ্ঞার ভাব থাকে, প্রথম বাক্যটিতে তা থাকে না, বরং একাত্ম করে নেওয়ার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। বক্তা নিজেকও ঐ কথার সঙ্গে যুক্ত করে নেন। কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল–'আসুন, আপনারা আমরা বসি।' ঠিক এ রকম আবার–'ভুল ক দ পাড়হাও সোজ্‌হে তাবন পে।' অর্থাৎ–'ভুলগুলি আপনারা আমরা সঠিকভাবে পড়ি।'

দ্বিতীয়তঃ, সাঁওতালরা সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে যতখানি সংরক্ষণশীল (conservative) ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু তার থেকে আরো বেশী সংরক্ষণশীল। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, তারা অন্যের অর্থাৎ হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ও মেলায় সমানে যোগ দেয়, আনন্দে উল্লসিত হয়ে নাচগান করে। কোনরকম দ্বিধাবোধ করে না, এমন কি হিন্দুদের দেবদেবীর কাছে মানত জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু কথাবার্তা বা বাক্যলাপের সময়ে তারা মাতৃভাষার ব্যবহার বেশী পছন্দ করে। কোন মেলায় কিংবা হাটে-বাটে অচেনা সাঁওতাল ছেলেমেয়ে কিভাবে পরস্পর প্রথমে বাক্যলাপ শুরু করে তা একটু দেখা যাক। অচেনা ছেলেমেয়ে বাক্যলাপের সময়ে বলে–'এ পেড়া দাদা' কিংবা 'এ পেড়া দিদি, অকারে তাম দিসম দ ?' অর্থাৎ–'ও কুটুম দাদা' কিংবা 'ও কুটুম দিদি' সম্বোধন করে প্রশ্ন আর উত্তর দিয়ে থাকে। বয়সে ছোট হলে বড় জোর 'পেড়া মাঁই' বলা হয়। মোট কথা, তারা সব সময়েই মনে করে যে, তারা একই আদি পিতা-মাতা পিলচু হাড়াম্‌ ও পিলচু বুড়হির বংশধর। এজন্যই তারা কথাবার্তায় সেই আত্মীয়তার একটা রেশ বা জের টেনে আনে আর অসম্ভব রকম মিলমিশ তাদের মধ্যে দেখা যায়।

তবে এটাও সত্য যে, বর্তমান শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের তাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ আর ততখানি দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ মনে হয় ছোটবেলা থেকে অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ। অথচ, ভারতীয় সংবিধানের ৩৫০(ক) ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদে মাতৃভাষায় শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ লিপিবদ্ধ আছে যে–"It shall be the endeavour of every state to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the

primary stage of education to children belonging to Linguistic minority groups and the President may issue such directions to any state as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities."

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও তা কাজে পরিণত হয়নি। এর জন্যে সরকারকেও সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। সাঁওতাল সমাজও এজন্য কম দায়ী নয় ! হরফের সমস্যা তুলে ধরে সাঁওতালী ভাষাকে প্রথমে এগুতে দেওয়া হয়নি, ভাষার বিকাশও তাই প্রত্যাশামত ঘটেনি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ষাট দশক পর্যন্ত সাঁওতালী ভাষার বিকাশ যেভাবে হচ্ছিল, নতুন নতুন সাহিত্যিক কবিদের আবির্ভাব ঘটছিল, সত্তর দশকে হরফের বিবাদে সবকিছু থমকে যায়। হরফের বিবাদে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, বেশ কিছু উঠতি লেখক ও কবি শেষ পর্যন্ত লেখাই ছেড়ে দেন।

এখানে একটা কথা বলেত বাধা নেই যে, সাঁওতালদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ নয় বিহার, ওড়িশা ও আসাম রাজ্যসরকারেরও এ কাজে সমান দায়-দায়িত্ব আছে। কারণ, সাঁওতালরা প্রধানত এই চারটি রাজ্যেই বাস করে। তবুও ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রণ্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালী ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য একটি কমিটি কঠন করেন, কিন্তু ঐ হরফের প্রশ্ন তুলে ধরে সমস্ত কিছু বানচাল করে দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'অলচিকি' লিপিকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেন। পাঠ্যপুস্তকও তৈরী করা হয়। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা না থাকায় কোন ফলই লাভ হয়নি। দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে সবকিছু বাংলায় পড়ানো হয় বলে শিক্ষিত মা-বাবারা ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে 'অলচিকি' ছেলেমেয়েদের পড়াতে আগ্রহী হলেন না। তাঁদের যুক্তিটুকু অস্বীকার করা যায় না। সাঁওতাল ছেলেমেয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 'অলচিকি' লিপিতে পড়াশুনা করে কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে এগারো-বারো বছর বয়সে নতুন করে বাংলা বর্ণমালায় পড়াশুনা করবে ? নতুন করে একটি ভিন্ন বর্ণমালা শেখা, নতুন বর্ণমালায় শব্দ, বাক্যগঠন প্রভৃতি শিখে মাত্র কয়েক বছরের শিক্ষায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় কি ভাল ফল করা সম্ভব ? প্রাথমিক শিক্ষা শুধুমাত্র 'অলচিকি' লিপিতে এবং পরে মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলা লিপিতে কি উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ?

এরকম শিক্ষাব্যবস্থাকে আদৌ কি সমর্থন করা চলে ? আর যদি এ রাজ্যে তাই হয়, কিন্তু বিহার, ওড়িশা ও অসম রাজ্য তো এ পর্যন্ত এ লিপিকে স্বীকৃতিই দেয়নি। তাহলে লাভ কি হল ?

আর একটি কথা হল, বিহারে সবচেয়ে বেশী সাঁওতাল বাস করে। বিহারে রাজ্যসরকার যেভাবে হিন্দি প্রসারে ও সে সঙ্গে দেবনাগরী লিপির সপক্ষে ওকালতি করে চলেছেন, তাতে ঐ সরকার 'অলচিকি' লিপিকে কোনদিন স্বীকৃতি দেবেন এমন কোন সম্ভাবনা নেই। ওড়িশা সরকারও 'অলচিকি' লিপির স্বপক্ষে কোন আলোচনা করছেন না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম একটা গোলমেলে অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকবে কেন ? এ অবস্থায় গত তিন দশকে সাঁওতালী ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলে-মেয়ের আগ্রহ কতখানি বেড়েছে কি কমেছে, তা একটু দেখা যাক।

তিরিশ বছর নেহাত কম সময় নয়। এ সময়ের মধ্যে বেশ কিছু সাঁওতাল ছেলে ও মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, ব্যাঙ্কে কিংবা শিক্ষাকতার কাজে নিযুক্ত আছেন। শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় এক ভিন্ন পরিবেশে তাদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। একটা ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার দরুণ এবং সব সময়ই বাংলা কিংবা হিন্দিতে কথা বলতে হয় বলে সে ছেলেমেয়েদের অনেকেরই সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা কম। তা ছাড়া, তাদের মনের খোরাক মেটাবার মত পত্র-পত্রিকা তারা সাঁওতালী ভাষায় পায় না। স্বভাবতই তারা অন্য ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাই বেশী পড়ে। সাঁওতালী ভাষায় পত্র-পত্রিকা পড়ে না, কিংবা পত্রিকাও কিনতে চায় না। এটাই আজেকর বাস্তব চিত্র। একথা যাচাই করার প্রয়োজন পড়ে না, সাঁওতালী পত্র-পত্রিকাগুলির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করি। কিছুদিন পূর্বে পুরুলিয়ার সাঁওতালী পুস্তক বিক্রেতা শ্রীসুধীর টুডু (সুটু) আমার কাছে এসেছিলেন সাঁওতালী বই কেনার জন্য। সে সময়ে বিহারের এখ শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলে (ইঞ্জিনিয়ার) আমার কাছে বসেছিলেন ; তিনি কিন্তু সাঁওতালী কথা বলতেই পারতেন না, তবে সামান্য সামান্য বুঝতে পারতেন। আমি দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সুধীর টুডু অল্প শিক্ষিত, সাঁওতালী ও বাংলাই জানতেন। অন্যদিকে সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি হিন্দি ও ইংরেজী জানেন। এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই ছিল তাদের ভাব

বিনিময়ের একমাত্র পথ। কিন্তু শিক্ষিত ছেলেটি সাঁওতালী বলতে পারে না বলে সে পথ রুদ্ধ। তাদের মধ্যে আর বাক্যালাপ হল না। অনেকক্ষণ পরে সুধীর টুডু শুধু এ কথাই বললেন–"বড় দুঃখ লাগছে যে আমরা দু'জনে সাঁওতাল হয়েও সাঁওতালীতে কথা বলতে পারলাম না।"

এরকম বহু সাঁওতাল ছেলেই আজ দেখতে পাওয়া যায় যারা তাদের মাতৃভাষা জানেই না। সাঁওতালী সমাজ আজ কোথায় চলেছে তা একটু ভালভাবে অনুধাবন করা উচিত। শুধু আবেগপ্রবণ হয়ে কাজ করলেই হয় না ; আমি পূর্বেই বলেছি, কত জাতি কত ভাষা 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' হারিয়ে গেছে। বিশাল মুণ্ডা সমাজের ভাষা আজ লুপ্তপ্রায়, ওরাওঁ সমাজের কূরুখ ভাষার জায়গায় আজ 'সাদরি' ভাষা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সাঁওতাল সমাজের কিছু অংশ আজ হরফকে প্রথম স্থানে ও ভাষাকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে আন্দোলন করে চলেছে। এটা নিশ্চয় সঠিক-ভাবনা-চিন্তা নয়। এটাতে ভাষার অস্তিত্ব থাকবে কিভাবে ?

ভাষা হারিয়ে গেলে জাতির শিল্প-সংস্কৃতিও হারিয়ে যায়। সুতরাং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা উচিত। আজ সাঁওতালী ভাষার ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। একটি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী ভাষার অগ্রগতি থমকে আছে। যাদের অদূরদর্শিতার জন্য এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আগামী দিনের প্রজন্ম তাদের কখনও ক্ষমা করবে না। এ অবস্থা যেন আর দীর্ঘদিন স্থায়ী না হয় সেজন্য সবাইকেই সচেতন সচেষ্ট হতে হবে।

